দ্বিতীয় স্মৃতি
পরিমল গোস্বামী

পরিমল গোস্বামী

৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

অস্থিরযৌবনকে স্থিরযৌবনে রূপান্তর করার অক্লান্ত সাধনায় রত,

বসুবিজ্ঞান মন্দিরের পূজারী, সুহৃৎ

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

করকমলেষু

সুফল-আকাঙ্ক্ষী

পরিমল

ভূমিকা

সাহিত্যসতীর্থ সুহৃৎ শ্রীমনোজ বসুর আগ্রহে দ্বিতীয় স্মৃতি মাসিক বসুমতীতে ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বই আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল। ছাপবার সময় পূর্বে প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক দু একটি রচনা প্রয়োজনীয় স্থানে জুড়ে দেওয়া সঙ্গত বোধ করেছি। সেজন্য "শিশিরকুমার ভাদুড়ি" ও "চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য" এ দুটি অধ্যায়ের কলেবর বৃদ্ধি ঘটেছে।

কিন্তু দ্বিতীয় স্মৃতির আকার আরও অনেক বড় হবে এমন পরিকল্পনা ছিল। চীনারা বাধা দিল। তাদের সঙ্গে পূর্ণ সাক্ষাৎ এখনও বাকি আছে। সে সাক্ষাতের পরেও যদি কোনো স্মৃতি উদ্বৃত্ত থাকে তবে ভবিষ্যতে তৃতীয় স্মৃতির ধাপে নামা যাবে।

মাসিক বসুমতীতে মাসে মাসে ছাপা হওয়ার প্রায় আরম্ভ থেকেই লেখাগুলি বই আকারে ছাপার কাজও আরম্ভ হয়েছে। সেজন্য কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সম্ভব। কিন্তু সেজন্য দুঃখ বা লজ্জা প্রকাশ ক'রে লাভ কি? এখন তা শুনছেই বা কে?

মাসিক বসুমতীর অনেক পরিচিত বা অপরিচিত পাঠকদের চিঠি আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছে।

প্রুফ দেখায় বন্ধু দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য সাহায্য করেছেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর সীতা কবিতাটি (৯৭ পৃ দ্রঃ) মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন।

এঁদের সবাইকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

কলিকাতা

লেখক

মাসিক বসুমতীতে 'স্মৃতিচিত্রণ' লিখেছিলাম আঠারো মাস (১৯৫৬ ডিসেম্বর— ১৯৫৮ মে)। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ছিল স্মৃতির বিস্তার সীমা। সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটকের ইচ্ছা ছিল না অত অল্পে শেষ করি। কিন্তু একটা যুগ শেষ ক'রে তখন আর আমার এগিয়ে যাবার প্রবৃত্তি ছিল না। এত দিনের বিরামে আবার পরবর্তী দিনগুলোর কথা মনের মধ্যে ভেসে উঠছে। ইতিমধ্যে 'স্মৃতিচিত্রণ' যে পাঠকদের প্রিয় হয়েছে, গত দুটি সংস্করণে তার প্রমাণ পেয়ে আমি কিছু উৎসাহিত হয়েছি। অতএব আরও একটু এগিয়ে যাওয়া যাব। আমি ১৯৪৫-এর পরবর্তী পনেরো বছরের একটি কালকে আমার দ্বিতীয় স্মৃতিতে ধরবার চেষ্টা করব।

১৯৪৫-এর স্বরূপ

১৯৪৫ সালের যে সীমায় এসে আমি থেমেছিলাম, বিশ্ব-ইতিহাসের সেটি একটি বিরাট ক্রান্তি মুহূর্ত। ইতিহাসের প্রথমতম এবং কঠিনতম সর্বগ্রাসী যুদ্ধের অবসান বছর সেটি। পুরনো সমস্ত বিশ্বাস বিরাট ঘা খেয়েছে, জানা গেছে মানুষের জীবনের কোনো দাম নেই। কোটি কোটি লোক ঘরছাড়া, ইউরোপ এশিয়া বিধ্বস্ত। অবশ্য মানুষের অগ্রগতির জন্য এই জাতীয় হত্যা এবং ধ্বংস দরকার।

সর্বগ্রাসী যুদ্ধ বা টোট্যাল ওয়র—এ নাম এর আগে আমাদের জানা ছিল না। এই যুদ্ধের— অর্থাৎ যুদ্ধটা যে সর্বগ্রাসী হওয়া চাই—শত্রুপক্ষের যে যেখানে আছে. স্ত্রীলোক, শিশু, হাসপাতালের রোগী—মায় তাদের বাড়ি-ঘর সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দেবার, হুকুম জারি করা হয় ১৯৪০-এর ৫ই জুন। জারি করেন হিটলার। যুদ্ধ তখন প্রায় এক বছরের পুরনো। আগে ছিল সৈন্য-বিভাগের যুদ্ধ, সাধারণ গৃহস্থ লোক গৃহস্থ পরিবেশে নিশ্চিন্ত থাকত। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দলগত হিংস্রতাও বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক. এবং এটি যে প্রকৃতিরই অভিপ্রেত ব্যবস্থা, এই কথাটা আগে

কেউ ভেবে দেখেননি। ভাবেননি যে এই হিংস্রতার ক্রম-বিস্তারের সঙ্গে সভ্যতার ক্রমবিস্তারের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ। এই অতি স্পষ্ট জিনিসটা আজও আমরা প্রকাশ্যে বলতে ভয় পাই কেন বোঝা যায় না। যাই হোক, হিটলার ব্যর্থ হলেন এ-যুদ্ধে।

১৯৪৫ সালের ৭ই মে তারিখে জারমানি থেকে ঘোষণা করা হ'ল তারা বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু তখনও জাপানের যুদ্ধ থামল না। তারপর সে যুদ্ধ থামাবার ব্যবস্থা হল ৫ই অগস্ট তারিখে হিরোশিমার উপর, এবং ৯ই অগস্ট নাগাসাকির উপর পরমাণু বোমা নিক্ষেপ ক'রে। প্রথম বোমায় লোক মারা যায় ৭৮১৫০ জন, দ্বিতীয় বোমায় ৭৫০০০। এত দিনে এর চেয়েও বেশি কার্যকর বোমা বেরিয়েছে, এবং পরমাণু বোমার সাহায্যে এই ধ্বংস সার্থক হওয়াতেই এ-যুগের নাম হ'ল পারমাণবিক যুগ। সভ্যতার অগ্রগতি ধ্বংসের শক্তির মধ্যে চমৎকার স্বীকৃতি পেল। সভ্যতার উন্মেষের একটি বড় রকম পদচিহ্ন আঁকা হ'ল হিরোশিমা-নাগাসাকির বুকে।

যুগ-সন্ধিক্ষণের পরিচয়ে আরও একটুখানি নেপথ্য তথ্য বলা দরকার। কারণ শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানীরাই নবযুগ এনেছেন—এই পারমাণবিক যুগ। এঁদের মধ্যে অবশ্য মতভেদ ছিল। আজ ভিতরের খবর সব জানতে পারা গেছে। একটি খবর এই যে, ১৯৪৫-এর ১২ই জুলাই তারিখে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মেটালার্জিক্যাল ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানী ডক্টর ফারিংটন ড্যানিয়েলস, সে সময়ে পরমাণু বোমা বিষয়ে গবেষণা-রত ১৫০জন বিজ্ঞানীর মতামত সংগ্রহ করেন। কি ভাবে এই বোমা ব্যবহার করা হবে এ বিষয়ে তাঁদের অভিমত চাওয়া হয়। ফলে জানা যায়—

(১) ২৩জনের ভোট—এমন ভাবে ব্যবহার করা হোক যাতে সামরিক দিক থেকে অ্যামেরিকার ন্যূনতম প্রাণের বিনিময়ে জাপানীরা দ্রুত আত্মসমর্পণ করতে পারে।

(২) ৬৯জনের ভোট—এর শক্তি পুরোপুরি ব্যবহারের আগে জাপানেই অন্যভাবে এর শক্তি দেখানো হোক, যাতে তারা আত্মসমর্পণের নতুন একটা সুযোগ পায়।

(৩) ৩৯জনের ভোট—জাপানী প্রতিনিধির সামনে অ্যামেরিকতেই এ অস্ত্রের পরীক্ষা হোক।

(৪) ১৬জনের ভোট—এ অস্ত্রের সামরিক ব্যবহার বন্ধ রাখা হোক এবং সাধারণের সামনে এর শক্তি দেখানো হোক।

(৫) ৩জনের ভোট—সব দিক দিয়ে এর কথা গোপন রাখা হোক এবং এ যুদ্ধে এর ব্যবহার বন্ধ রাখা হোক।

দেড়শ বিজ্ঞানীর মধ্যে মাত্র তেইশজন সভ্যতার অগ্রদূতদের সুরে সুরে মিলিয়েছেন ব'লেই তাঁদের কথা গ্রাহ্য হয়েছে, তাই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দেড় লাখের উপরে নরহত্যা ক'রে সভ্যতার পথ আরও প্রশস্ত করা হ'ল। নরহত্যা সহজ করার এই পদ্ধতি বিজ্ঞলোক মাত্রেই সমর্থন করবেন, কেননা সর্বাত্মক যুদ্ধ যদি সমর্থিত হয়, তবে মানুষ মারার শ্রেষ্ঠ উপায় আন্তর্জাতিক ভাবে সমর্থনযোগ্য।

অতএব এই ১৯৪৫ সালেই সভ্যতার আসল রূপ চেনা গেল। এত দিন আমরা সভ্যতা বুদ্ধ যীশু টলস্টয় রবীন্দ্রনাথ বারনার্ড শ' গান্ধী রাসেল প্রভৃতির জীবনদর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে একটা কিছু ভাবতাম। সে ভুল আমাদের ভাঙল এই সময়। এবং এই সন্ধিক্ষণেই তাঁদের মধ্যে যাঁরা জীবিত ছিলেন তাঁদের তিনজনের মৃত্যু ঘটল। রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১ সালে এবং গান্ধীজি (নিহত) ১৯৪৮ সালে। তারপর ১৯৫০ সালে বারনার্ড শ'। সভ্যতার ভুল ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে আজও বেঁচে রইলেন বারট্রাণ্ড রাসেল।

স্মৃতিচিত্রণের কালের পরবর্তী কাল

আগেই বলেছি, এমনি যুগসন্ধিক্ষণে স্মৃতিচিত্রণ শেষ করেছিলাম। একটি অকল্পিতপূর্ব ভবিষ্যতের হাতে আমাদের নিক্ষেপ ক'রে ১৯৪৫ বিদায় নিল। প্রবেশ করলাম সভ্যতানাগিনীর ভণ্ডামি-নির্মোক-মুক্ত বাস্তব সত্যের যুগে। এ যুগে ইউরোপের ব্যাপক নরহত্যার ভিতর দিয়ে সভ্যতা তার যে কলঙ্কমুক্ত রূপ নিয়ে দেখা দিল তাকে হঠাৎ চিনতে একটু দেরি হয়েছিল। অবশ্য ১৯৪৩ সালে ব্যাপক মৃত্যু দেখেছি চোখের সামনে, কলকাতার পথে পথে। তারপর ১৯৪৬ সালে ব্যাপক নরহত্যার রক্তের মধ্যে বাস করলাম। নতুন যুগের স্বরূপ ধীরে ধীরে খুলে গেল। তারপর এলো স্বাধীনতা।

স্বাধীন ভারতে এই সভ্যতার গতিপথে পরবর্তী প্রধান বাধা ছিলেন গান্ধী, তাই তাঁকে আমরা হত্যা করেছি। না ক'রে উপায় ছিল না।

শান্তির পক্ষে লড়াই করবার মানুষ আর কেউ বিশেষ অবশিষ্ট নেই, এখন শান্তির চিহ্নস্বরূপ পায়রা-জাতীয় পাখী মাত্র সম্বল, কিন্তু হাতের কাছে পেলে আমরা তার ঝোল রেঁধে খাই।

এ রকম যে ভাবছি তা ক্ষোভে নয়, এবং এ নিয়ে কারো বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশও নেই। বিবর্তন একটি সত্য জিনিস, তার বিরুদ্ধে আস্ফালন ক'রে লাভ কি। আমরা বানর জাতীয় পূর্বপুরুষের সন্তান এ কথা ভেবে কি আমরা মন খারাপ করি? প্রকৃতির বিধান অলঙ্ঘ্য। মানুষের মনের বা প্রবৃত্তির বিবর্তন স্বীকার করলে এ কথা মানতেই হবে যে, হিংস্রতা এবং অসাধুতা মানুষের সহজাত ধর্ম এবং বিবর্তনে এরই ধারাবাহিক বিকাশ। ব্যতিক্রম দেখা যায় যে সব মানুষের মধ্যে, তাদের আমরা অগ্রাহ্য ক'রে চলতে সক্ষম।

প্রগতি উন্নতি কি না জোর ক'রে বলা যায় না। বলা যায় এ একটি পরিবর্তন। বিজ্ঞানের জ্ঞান অন্যান্য সম্পত্তির মতো মানুষের সংগ্রহ মাত্র, সকল জ্ঞানই বাইরের জিনিস। কেউ বিজ্ঞানের তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে অতএব সে খুন করবে না, অথবা যীশু খ্রীষ্টের ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে অতএব সে দশটি কম্যাণ্ডমেণ্ট মেনে চলবে, এমন আশা করাই ভুল। বিজ্ঞানের জ্ঞানের ফলে যে মানুষটি আকাশে উড়ছে সে কখনো চোর হ'তে পারে না, এমন আশা করা অন্যায়। কোনো মানুষ আধুনিক বিজ্ঞানের দান টেলিভিশনের লাইসেন্স নিয়েছে অতএব সে সাধু, এ কথাও আমরা ভাবতে পারি না। পরমাণু বিদীর্ণ করবার কৌশল থেকে পরমাণু বোমা আবিষ্কার শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানীরাই করেছেন।

কিন্তু মানুষ নিতান্ত আশাবাদী, কারণ তাকে বাঁচতেও হবে, তাই একটা সম্প্রদায় সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী অগ্রগতিকে টেনে ধ'রে রাখতে চায়, এবং এই দুই দিকের টানাটানির ফলে গতি খানিকটা বেঁকে গিয়ে তৃতীয় একটা পথ ধ'রে চলে। এটা খিচুড়ি পথ, অর্থাৎ এর কোনো নির্দিষ্ট পরিচয় নেই। হয়তো এর নামই সভ্যতা। প্রবল ধ্বংস-শক্তিকে অনুসরণ ক'রে চলে তার বিপরীত শক্তি। ঠিক যেমন আমাদের হাওয়ার পরিমণ্ডল।

বাতাস শুধু অক্সিজেনে গড়া হ'লে মুহূর্তে সব পুড়িয়ে ছারখার করত, তাই নাইট্রোজেন নামক বিপরীত শক্তিকে তার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। পোড়াবে এবং নেবাবে একই সঙ্গে। ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছে এতে।

বহু পুলিস থাকা সত্ত্বেও চোর হওয়ার আশা আমাদের সবারই (পুলিসেরও) আছে ব'লেই আমরা বেঁচে থেকে স্ফূর্তি অনুভব করি। হঠাৎ যদি এখন অন্য গ্রহ থেকে কোনো এক দল শাসক এসে আদেশ জারি করে যে প্রত্যেকটি লোককে স্কুলপাঠ্য নীতিশিক্ষার প্রত্যেকটি কথা আজীবন মেনে চলতে হবে, তা হ'লে প্রতি লক্ষ মানুষের এক জন মাত্র সে আদেশ পালন করতেও পারে, বাকি সবাই আদেশ জারির পাঁচ মিনিটের মধ্যে আত্মহত্যা করবে। রাজপথে আমরা যে এঁকেবেঁকে চলি, সরল রেখায় চলি না, এ বিষয়ে আমরা সচেতন নই। রাজপথ জনশূন্য হ'লেও আমরা ইউক্লিডের সংজ্ঞা অনুযায়ী দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী হ্রস্বতম দূরত্বের সরল রেখায় চলি না। এমন অবস্থায় হঠাৎ যদি আদেশ আসে জ্যামিতিক সরল রেখায় হাঁটতে হবে, তা হ'লে একটু দূর গিয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়ব। অতএব সরল পথই যে স্বাভাবিক পথ নয়, এ কথাটা মনে রাখা দরকার। মনে রাখলে আর সভ্যতার চেহারা দেখে মনে আঘাত লাগবে না।

এই হ'ল নব যুগের তত্ত্বকথা। মনে কোনো ভ্রান্তি না থাকে সে জন্যই এতগুলো কথা ব'লে নেওয়া গেল।

এখন লিখছি ১৯৪৫-এর পরের স্মৃতি। আগের যুগের চেয়ে আকাশ-পাতাল তফাত। এ যুগের মানুষ বদলে গেছে। তাই আমার কল্পনায় এখনও আগের কালের মানুষ বেশি অন্তরঙ্গ বোধ হয়। এ যুগের নতুন মানুষকে এখনও ঠিক আবিষ্কার করতে পারিনি।

যে সব মানুষকে ভালবেসেছি, শ্রদ্ধা করেছি, তাঁদেরই ঘিরে কল্পনা এখনো জ্যোতির্বলয়ের মতো উজ্জ্বল।

প্রমথ চৌধুরী

১৯৪৫-এর ১লা মার্চ যুগান্তরে সাময়িকী-সম্পাদকের পদে যোগ দেবার পর প্রথমেই যাঁর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছিলাম তিনি হচ্ছেন প্রমথ

চৌধুরী। স্মৃতিচিত্রণে এঁর কথা আমি বলেছি। এঁর সহযোগীরূপে 'অলকা' মাসিকের সম্পাদনা করেছিলাম কিছুদিন। সেই পরিচয় নতুন ক'রে ঝালাই করার সুযোগ পেলাম এখানে আসার পর।

প্রমথ চৌধুরী মার্চ মাসে (১৯৪৫) শান্তিনিকেতনে ছিলেন কিছুদিন, সেই ঠিকানায় চিঠি দিয়েছিলাম (১২ই মার্চ)—লেখা চেয়ে। অর্থাৎ যুগান্তরে প্রবেশের ১১দিন পরেই। তার উত্তর পেলাম ১৮ দিন পরে, কলকাতার ঠিকানা থেকে লেখা। চিঠিখানা উদধৃত করি—

ওঁ লাল বাঙ্গলা, ১নং পাম প্লেস

বালিগঞ্জ, ৩০।৩।৪৫

কল্যাণবরেষু,

শান্তিনিকেতনে তোমার গত ১২ইর চিঠি পাবার পর ১৫ই আমরা এখানে চলে আসি।

তোমার অনুরোধ রক্ষার জন্য সেই অবধি পুরনো অপ্রকাশিত লেখা ঘাঁটতে সুরু করেছি: এবং এ সময়ে ছাপানো যেতে পারে এমন ২।৪টি আলাদা করে রেখেছি।

তুমি যদি অবসর মত এখানে কোনদিন সকালে (উপরের ঠিকানায়) বেলা ৯—১১টার মধ্যে এস, তা হলে নিজেই ঐ লেখাগুলির মধ্যে একটি নিয়ে যেতে পার বেছে।

আর যদি সুবিধে না হয় ত জানিও, আমরাই ওরই মধ্যে দেখে-শুনে একটা পাঠিয়ে দেব। আমার স্ত্রীও খোঁজ করে দেখবেন। ইতি

(for) শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

'ফর'-এর অর্থ, চিঠিখানা আগাগোড়াই ইন্দিরা দেবীর হাতের লেখা, তাই ঐ ভাবে স্বাক্ষর দেওয়া হয়েছে।

বলা বাহুল্য, আমি পত্রপাঠ পাম প্লেসে গিয়ে লেখা সংগ্রহ ক'রে এনেছিলাম। প্রমথ চৌধুরীর হাতের লেখা শেষ বয়সে বড়ই অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, হাত কেঁপে যেত, কথা বলতে ঠোঁটও কাঁপত। তাঁর হাতের লেখার সঙ্গে পূর্ব থেকেই পরিচয় থাকাতে আমি সহজেই তা পড়তে পারতাম। তাই আমি তাঁর লেখা আগাগোড়া নিজ হাতে নকল ক'রে তবে প্রেসে পাঠাতাম।

তাঁর লেখা কপি প্রেসে পাঠালে সে লেখা কম্পোজ করা আর কারো তখন সাধ্য ছিল না। ফলে তাঁর মূল হাতের লেখার ত্ব-একটি প্রবন্ধ আমার কাছে এখনও আছে, আমি যত্ন ক'রে রেখেছি।

লেখকের সংখ্যাবৃদ্ধি এ যুগে যেমন একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, ১৯৪৫ সালে বা তার আগে এ রকম ছিল না। আগে লেখকের সংখ্যা তারও আগের যুগের তুলনায় অবশ্যই অনেক বেশি হয়েছিল কিন্তু তা এমন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। ১৯৪৫ সালে, মাসে এক শ দেড় শর বেশি রচনা আসত না। এখন মাসে পাঁচ শ-এর উপরে আসে। ভাষা, বানান ও রচনার আঙ্গিক দেখেই অধিকাংশ রচনা অগ্রাহ্য করা হয়। মাসে যত লেখা আসে নির্ভুল বানানে লেখা তার মধ্যে একটি কি ত্বটি থাকলেই যথেষ্ট আরাম বোধ করি। রচনা প্রেরণের নিয়মাবলীতে কিছুদিন এই কথাগুলি লিখে দিয়েছিলাম—"যাঁরা সম্পাদককে Eaditor, Aditor বা Auditor সম্বোধন করেন তাঁরা লেখা পাঠাবেন না। এবং লেখিকাদের মধ্যে যাঁরা নামের আগে 'শ্রীমতি' (এই বানানে) লেখেন তাঁরাও লেখা পাঠাবেন না।" এ বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ছিল—অত্যন্ত সাধারণ বানান যাঁরা জানেন না তাঁদের সতর্ক করা। কিন্তু তাতে খুব ফল হয়নি। লেখা আসতে লাগল সাময়িক বিভাগের প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারি বা ম্যানেজারের নামে। Eaditor, Aditor বা Auditor তো রইলই। অনেকে মনে করলেন ওর মানে হচ্ছে সম্পাদকের নামে লেখা পাঠানো নিষেধ—তাই প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারির উদ্ভাবন। লেখিকাদের মনেও কোনো রেখাপাত করল না। একজন লিখলেন "এখন ফ্যাশান হয়েছে নামের আগে শ্রী বা শ্রীমতি না লেখা। কিন্তু যারা লেখে তাদের উপর আপনারা বিরূপ কেন?"

এ যুগের এটি একটি বৈশিষ্ট্য। বি-এ অথবা এম-এ পাস লেখিকার হাতেও 'শ্রীমতি' বানান প্রায় দেখা যায়। আগে যখন স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হয়নি এ দেশে, যখন অধিকাংশ মেয়েরা কোনো রকমে বাঁকাচোরা অক্ষরে একখানা চিঠি লেখা শিখত, তখনও তারা নামের আগে শ্রীমতি লিখত না, শ্রীমতীই লিখত এবং ত্বর্গা লিখতে হ্রস্ব উ ব্যবহার করত।

তবে কি এখনকার শিক্ষার ত্রুটি? অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষায় তো বটেই।

শিক্ষার্থীর দোষ নেই। বাংলা বা ইংরেজী বানান এখন শিক্ষকেরাই ভুল করেন। শিক্ষক শিক্ষিকারা যে সব রচনা পাঠান তা ভুল বানানে কণ্টকিত। কলেজের ব্যাপারেও খুব ব্যতিক্রম নেই। ইণ্টারমীডিয়েটের বাংলার এক প্রধান পরীক্ষক একবার পরীক্ষকদের কাছে যে চিঠি পাঠান তাতে তাঁর বাড়ির ঠিকানায় লেখা ছিল Suit no...আমি ভেবেছিলাম হঠাৎ-ভুল। কিন্তু যখন মিটিংএ তিনি অবলীলাক্রমে উচ্চারণ কবলেন স্যুট নম্বর·· তখন আর সন্দেহ রইল না। ইচ্ছা হয়েছিল সংশোধন করে দিই। বলি যে ওর বানান suit নয়, suite, এবং উচ্চারণ স্যুট নয়, স্যুইট। কিন্তু যথাসময়ে চুপ ক'রে থাকাই বিজ্ঞতা, এ শিক্ষা এত দিনে হয়েছে।

কাউকে দোষ দিচ্ছি না। নতুন যুগের পরিচয় আগেই দিয়েছি।

সাময়িকী দপ্তরে পাগল

এ যুগে আর এক সম্পাদকীয় অভিজ্ঞতা, পাগলের সংখ্যা বৃদ্ধি। লেখক-পাগল অথবা পাগল-লেখকের সংখ্যার কথা বলছি। অনেকে অবশ্য বলেন লেখকমাত্রেই পাগল, অন্য কথায়, পাগল না হ'লে কেউ লেখক হয না।

বহু উন্মাদ ব্যক্তি, লেখা বা চিঠি পাঠান, অনেক সময় নিজেও এসে হাজির হন আমাদের সম্পাদকীয় দপ্তরে। কয়েকটি মজার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। একবার একখানা চিঠি পাই, এবং সে চিঠি পড়েই বোঝা গেল পাগলের লেখা। ঐ একই লেখকের লেখা একই বিষয়ের চিঠি পর পর ক' দিন ধ'রে এলো। তার একটা বিশেষ আদেশ ছিল যা সাময়িকী সম্পাদককে অবশ্য পালন করতে হবে। আদেশ—সাময়িকী বিভাগ থেকে যেন পামেলাব হৃদয় অন্য কোথাও সরানো না হয়, যেখানে আছে সেইখানেই যেন থাকে।

ভিয়েনা থেকে শ্রীমান্ অশোক বাগচী একটি লেখা পাঠায়, লেখাটির নাম 'পামেলার হৃদয়'। পামেলা একটি মেয়ে। তার হৃৎপিণ্ডে কি ভাবে একটি বিশেষ ধরনের অস্ত্রপ্রয়োগ করা হয় তার বিবরণ। এই লেখা ছাপা হওয়ার পব পাগলের ঐ চিঠি আসে। কয়েকখানা আদেশপত্র লেখার পর কোনো জবাব না পেয়ে সে নিজেই এসে হাজির হ'ল একদিন। নাম শুনে পত্রলেখককে চিনলাম। বয়স পঁচিশের বেশি নয়। সে এসেই দাবী জানাল তার চিঠির

উত্তর দেওয়া হয়নি কেন। কি একটা কৈফিয়ত দেওয়া হয়েছিল ঠিক মনে নেই। তার চালচলন ভাল লাগছিল না। কিছুক্ষণ পর সে জিজ্ঞাসা করল ইতশ্চেতঃ কে লেখেন? আমি খুব গম্ভীরভাবে বললাম, ও তো কোনো একজন লেখেন না। আপাতত পালা ক'রে দুজন লিখছেন। একজন অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট পুলিস কমিশনার পঞ্চানন ঘোষাল, আর একজন ব্যায়ামবীর বিষ্ণুচরণ ঘোষ।

যুবক গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে চ'লে গেল, তার পর আর আসেনি বা চিঠি দেয়নি।

কয়েক বছর আগে এক প্রায়-বৃদ্ধ সদাশয় পাগল ছড়ি হাতে. মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটিয়ে, সাময়িকী বিভাগে এসে প্রবেশ করলেন এবং একখানা চেয়ারে বসেই বললেন, আমি যুগান্তরের মালিক, আমাকে চা খাওয়ান। বললেন, এবং আনন্দে হাঁটু নাচাতে লাগলেন।

চা তখনই এসেছিল, খুব তৃপ্তির সঙ্গে তা খেয়ে ডান হাতখানা বাড়িয়ে বললেন, দিন দিন সিগারেট দিন। তাও তাঁকে দেওয়া হল। আমি বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি যুগান্তরের ষোল আনা মালিক? আগন্তুক বললেন. আজ্ঞে হাঁ, আমি ষোল আনা মালিক। বললাম, তা হ'লে তো আপনার সঙ্গে এতদিন আমাদের পরিচয় না হওয়ায় বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে। তিনি বললেন, হাঁ হয়েছে।

বললাম, অপরাধ স্বীকার করছি। আপনি উপরে যান, সেখানে খোদ সম্পাদক আছেন, তাঁর সঙ্গে পরিচয় ক'রে আসুন। আগন্তুক খুব খুশি হয়ে দোতলায় উঠে গেলেন, তারপর কি হয়েছে আর জানি না।

আর একদিন এক মহিলা এলেন এক লেখা নিয়ে। লেখাটি চিঠির কাগজের এক পাতা। অর্থহীন গোটাকত কথা। দেখামাত্র বোঝা গেল সব। বললাম, লেখাটি রেখে যান, পরে জানাব।

আবার একদিন এসে হাজির। হাতে আর একটি লেখা। ফুলস্ক্যাপ শীট। পেন্সিলে ইংরেজীতে লেখা রেলওয়েতে কোনো ছোকরার দরখাস্ত। বললাম. এ রকম লেখা ছাপা হয় না। মহিলা তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু হঠাৎ দেখি কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এসে দরজার বাইরে সেই কাগজখানায় দেশলাই জ্বালিয়ে পোড়াচ্ছেন।

তাঁর পরবর্তী চিঠি, ডাকে প্রেরিত। তাতে লেখা আপনারা ক জন

আমার পথ রোধ ক'রে আছেন, এই পত্র পাওয়া মাত্র আপনারা ওখান থেকে স'রে যান।

এর কিছুকাল পরে আমাদের সাময়িকী বিভাগের প্রবেশপথ সত্যিই বন্ধ হল। দরজায় তালা লাগানো। সে তালা অফিসের নয়, কেউ জানে না কে লাগিয়েছে। অবশেষে তালা ভেঙে ঘরে ঢুকতে হ'ল। এবং তার দিন-তিনেক পরে জানা গেল কার কীর্তি। ঐ মহিলা এসে বেশ ক্রুদ্ধ স্বরে কৈফিয়ত তলব করলেন, আমি তালা লাগিয়েছি, সে তালা কার হুকুমে খোলা হয়েছে, ইত্যাদি।

মনে হয় পাগলের সংখ্যা ১৯৪৫-এর পর থেকে ক্রমে বাড়ছে। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলতে পারব না, আমি শুধু আমার ধারণার কথা বললাম। এক পাগলের কাছেই শুনেছি—পাগল এন্তার পাওয়া যায় এখন।

সাময়িকী দপ্তরে হনুমান

এটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা। সাধারণ ভাবে, অন্ততঃ বাংলা দেশে কোনো সম্পাদকের ঘরে বানর কিংবা হনুমান দেখা যায় না। তবে তৎকালীন হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের (বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকার) সহকারী সম্পাদক সরোজ আচার্যের কাছে শুনেছি বর্মণ স্ট্রীটের বাড়িতে যখন হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সম্পাদক ছিলেন হেমচন্দ্র নাগ, সে সময় তাঁর সাময়িক দিবানিদ্রার সুযোগে তাঁর ঘরে এক বানর ঢুকে টেবিলের কাগজপত্র সামান্য ওলটপালট ক'রে, কনসাইস অক্সফোর্ড ডিকশনারির কয়েকখানা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। ১৯৪৫ সালে আমাদের সাময়িকী দপ্তরে যে ঢুকেছিল, সে আকারে বড়। অবশ্য প্রাইমেটের পদমর্যাদা এদের দুজনেরই আছে।

আমার যুগান্তরে যোগ দেওয়ার তিন-চার মাস পরের ঘটনা। সম্ভবত জুন মাস। আনন্দ চাটুজ্জের গলিতে পুরনো বাড়িতে ছিল তখন যুগান্তরের যাবতীয় বিভাগ। পাততাড়ি বিভাগ আমাদের ঘরের একটি পার্টিশনের আড়ালে।

আমাদের সাময়িকী বিভাগটি ছিল আড়াই তলায় অবস্থিত। সেখান থেকে দৈনিক বিভাগের সম্পাদকের ঘর সামান্য দূরে। আমার টেবিলের সামনে তিনখানা চেয়ার এবং আমার ডান ধারে একটি আলমারি। তখনও যুদ্ধ শেষ

হয়নি, হিরোশিমা নাগাসাকির উপর বোমা পড়েনি, অফিসের আয়োজন অল্প, কাগজ খরচ কৃপণের মতো, রচনাদি সব দু' পৃষ্ঠায় লেখা গ্রাহ্য। তার সংখ্যা কম, লেখক বা লেখিকার ব্যক্তিগত উপস্থিতি আরো কম, লেখিকাদের উপস্থিতি নেই বললেই চলে।

সেদিন আকাশে এমন কালো মেঘের আবির্ভাব ঘটল যে বিনা আলোয় বেলা তিনটের সময়ও কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। মেঘের ঘটায মনের আকাশেও বর্ষা ঋতুব আবির্ভাব ঘটল। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রলয় শুরু হ'ল। সে কি ভীষণ বর্ষণ আব কি ভীষণ অন্ধকার। আলো জ্বালবার আর প্রবৃত্তি হ'ল না। আলো জ্বলতে লাগল আকাশে। মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনি আর বিদ্যুৎ। বর্ষার কাব্য পড়া লোকদের পক্ষে কি মারাত্মক অবস্থা।

ঘরে একা ব'সে ছিলাম, আর কেউ ছিল না। বাইরে এমন প্রলয়, ভিতরে আমি একা। এমন পরিবেশে এমন অবস্থায মনে নানা কল্পনার উদয় হয়। পৃথিবীটাকে তখন আর একটা নতুন পৃথিবী ব'লে বোধ হয়, নিজেকে পরিচিত জগৎ থেকে বড়ই বিচ্ছিন্ন বোধ হয়। একা থাকা, আর একা-থাকার বোধ—দুটি পৃথক জিনিস। শেষেরটি স্বভাবতই জন্মে, তদুপরি একা থাকলে তো কথাই নেই।

সে দিনের সেই দুর্যোগ—এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। নিচে ঘনবর্ষণের ঝিমঝিম রিমঝিম, উপবে মেঘের আর্তনাদ, দুইয়ে মিলে সে দিন মনোজগতে যে বিপর্যয় ঘটিযেছিল তার তুলনা নেই।

এমনি বিরামহীন বর্ষণে যখন বাইরের জগতের চিহ্ন প্রায মুছে যায়, তখন সে পরিবেশে স্থানকালেব কোনো চিহ্ন থাকে না। তখনও তাই মনে হচ্ছিল। যে-কোনো কালের স্মৃতি জেগে উঠতে পারে মনে। অদৃশ্য নাইটিংগেলের গান শুনে কীটসেব মনে যেমন অতীতের বহুযুগব্যাপী ঐ একই গানে মুগ্ধ-হওয়া মানুষদের কথা জেগে উঠেছিল, তেমনি। এক আষাঢ়ের বর্ষণ দেখে বহু যুগের ওপার থেকে অন্য আষাঢ় এসেছিল রবীন্দ্রনাথের মনে। দুইই এক। এই বর্ষাই একদা রেবানদীর তীরে মালবিকাকে মুগ্ধ করেছিল। আমার মনও অতীতেব মধ্যে হারিয়ে গেল। আমি দেখতে লাগলাম এই একই বর্ষায় ডাইনোসর, ব্রোণ্টোসরাস্, টেরোড্যাকটিল, ম্যাস্টোডন মুগ্ধ হচ্ছে। হনুমান মুগ্ধ হচ্ছে। মনে হচ্ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগে ব'সে আছি।

এমন সময় শ্রবণযন্ত্র বিদীর্ণ ক'রে মাথার উপরে এক প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি। পৃথিবী কেঁপে উঠল সেই আওয়াজে। আর ঠিক সেই একই মুহূর্তে আর একটি বজ্রপাত ঘটল আমার টেবিলে। সেটি পড়ল উপর থেকে নিচে, আর আমি অর্থহীন একটা আদিম চিৎকার ক'রে প্রচণ্ড বেগে নিচে থেকে উপরের দিকে লাফিয়ে উঠলাম। আতঙ্কবিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে দেখি আমার টেবিলে যেটি পড়েছে সেটি বজ্র নয়, তার চেয়ে সাঙ্ঘাতিক—এক হনুমান! বিশালকায় এক প্রাইমেট। গলায় একটুখানি শিকল ঝুলছে।

বিরহে শীর্ণ যক্ষের কি টেবিল ছিল? সেখানে ব'সে কি সে তার প্রিয়ার বদলে এই রকম একটি তিন মোন ওজনের হনুমান প্রার্থনা করেছিল?

কিন্তু হনুমান এলো কোথা থেকে? ভেবে পাওয়া গেল না কিছু। টেবিলে পড়েই সে তিন চারটি উল্লম্ফন ক্রিয়ার সাহায্যে দরজা দিয়ে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। যাবার আগে আমার মনে শুধু এঁকে গেল তার ক্ষণভেংচির একটি ছাপ।

পরে মাথা ঠিক হ'লে বোঝা গেল হনুমান পড়েছে আলমারির মাথা থেকে। কখন সেখানে এলো সে জানি না। পবে শুনেছিলাম দারোয়ানদের পোষা হনুমান ওটি, কেমন ক'রে মুক্ত হয়ে গোপনে এসে সাময়িকী বিভাগে আত্মগোপন ক'রে লুকিয়ে ছিল। পরে ধরা প'ড়ে গেল।

হায় হনুমান। সে দিন সে আর আমি দুজনেই দুটি জিনিস হারিয়েছি। সে হারাল তার নবলব্ধ স্বাধীনতা, আমি হারালাম আমার বর্ষার স্বপ্ন।

এ কাহিনীটি আমি কয়েক বছর আগে রেডিওতে বিস্তারিত ক'রে বলেছিলাম। কিন্তু এই ঘটনা যখন যুগান্তরে ঘটছিল তখন জারমানিতে রিবেনট্রপও ধরা পড়লেন।

যুদ্ধের অন্তিম কাল

হিটলার ১৯৩৯ সালে যুদ্ধের ফরাস পেতে পৃথিবীসুদ্ধ লোককে সেখানে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছিলেন, তা এখন ক্রমে গুটিয়ে তুলছেন সবাই মিলে। সভাপতি হিটলার ১লা মে (১৯৪৫) তারিখে আত্মহত্যা করলেন। অন্ততঃ তাঁর মৃত্যু ঘোষিত হ'ল ঐ তারিখে। মিউনিক দখল হয়ে গেল, রাশিয়ানরা

বেরলিন দখল করল। উত্তর জারমানির নাৎসি শক্তি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল। এক দিকে হামবুর্গ—অন্য দিকে ত্রিয়েস্ত দখল হয়ে গেল। ৭ই মে তারিখে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ। তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত, এবং পরমাণু বোমা ইত্যাদির কথা আগেই বলেছি।

পাঁচ বছরের বিভীষিকা শেষ হ'ল অবশেষে। হঠাৎ খুব আরাম বোধ হ'ল। সভ্যতার পথে চলতে মাঝে মাঝে এ রকম বিশ্রাম দরকার হয়। তখন মনে হয় এর আর দরকার নেই। এত জীবন এবং এত সম্পত্তি নাশ ক'রে কি পেলাম? এর জন্য এত? কিন্তু বিশ্রাম শেষ হ'লে সভ্যতাকে এগিয়ে নেবার জন্য আবার ডাক পড়ে, আবার বড় বড় মাথা ধ্বংসাস্ত্র বানাতে বসে।

যাই হোক, আমাদের সাময়িক আনন্দ হ'ল এই যে, আর বিকট আওয়াজের সাইরেন বাজবে না, আর যখন-তখন গর্তে ঢুকতে হবে না, পথের, ঘরের, অন্ধকার দূর হবে, ঢাকা আলো ব্যবহার করতে হবে না, নিশ্চোর পথে আবার চোরেরা স্বাধীন ভাবে বিচরণ করতে পারবে। মনে কেমন একটা হাল্কা ভাব এলো। বুকের উপর থেকে ভারী ওজনের পাথরটা হঠাৎ স'রে যাওয়ার পর মনটা বোতল খোলার পর সোডাওয়াটারের বুদ্‌বুদ ধর্মে দীক্ষিত হয়। এত বড সর্বাত্মক যুদ্ধ আর কখনো হয়নি। কলকাতার উপর এতগুলো বোমা পড়বে এবং তার জন্য আতঙ্ক নিয়ে দিনরাত কাটাতে হবে এমন কথাও জীবনে কখনো কল্পনা করিনি। তাই এই যুদ্ধবিরতিও এক নতুন অভিজ্ঞতা। কিন্তু তখনও কলকাতা নোয়াখালি ও বিহারের যুদ্ধ বাকি। প্রায় চোখের সামনে দেখলাম নরহত্যা। কিন্তু সে তো ১৯৪৬-এর ১৬ই অগস্ট থেকে। তার আগে দিনকত এ সব চিন্তা কারো মাথায় আসেনি। আপাতত যুদ্ধের দমবন্ধকারী আবহাওয়া থেকে মুক্তি, সেটাই বড় কথা।

যুদ্ধের গোড়ায় যখন যুদ্ধ ছিল না, তখন ১৯৩৯ সালে অক্টোবরে দার্জিলিঙ গিয়েছিলাম। তারপর এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কলকাতা থেকে বাইরে যাবার সুযোগ ঘটেনি। অতএব যুদ্ধান্তে 'মন আর কিছুতে ঘরে ব'সে থাকতে রাজি নয়—' কিন্তু তবু প্রথম সুযোগ পাওয়া গেল মাত্র ১৯৪৬ সালের ঈস্টারে। এই একই সালে দুটি ভ্রমণ, দুবারেই সভ্য মানুষ থেকে দূরে প্রকৃতির নিজস্ব নিকেতনে। সেই কাহিনী আসবে এর পর।

একটি প্রক্ষিপ্ত অধ্যায়

এ কাহিনীটি এখানে অকস্মাৎ এসে হাজির হ'ল, তাই এর নাম দিলাম একটি প্রক্ষিপ্ত অধ্যায়। এর আসল নাম হওয়া উচিত ছিল "সম্পাদকের শয়নগৃহে হনুমান"। পূর্বে একটি অধ্যায়ের নাম ছিল "সম্পাদকীয় দপ্তরে হনুমান"। সেই অধ্যায়ের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই তবে এর কিছু সার্থকতা, নইলে স্মৃতিকথার মধ্যে বারবার হনুমানের আবির্ভাব কারো পক্ষেই বাঞ্ছনীয় নয়। এবং আগেই ব'লে রাখছি হনুমান-বিষয়ে আমার পৃথক কোনো দুর্বলতা নেই।

৬ই জুলাইয়ের ঘটনা।

যে ঘরে ঘটনাটা ঘটেছিল তার আকার ১৫ ফুট × ১২ ফুট। উত্তর দিকে একটি জানালা ৩ ফুট চওড়া। পূব দিকে দুটি জানালা—প্রত্যেকটি ৩ ফুট চওড়া। দক্ষিণ দিকে একটি জানালা ৫ ফুটের বেশি চওড়া, একটি দরজা ৬ ফুট। উত্তর দিকের জানালার বাইরে বারান্দা ও দূরে গেট। পূব দিকে জানালার বাইরে 'লন'। দক্ষিণ দিকে বারান্দা। একমাত্র দক্ষিণের দরজা দিয়ে বাইরে যাওয়া যায়—পশ্চিমের দরজা দিয়ে হলঘর পার হয়ে তবে বাইরে যাবার আর এক দরজা। দক্ষিণ দিকের প্রশস্ত জানালা ও দরজার মধ্যবর্তী স্থানে আমার টেবিল—টেবিলের উপর একটি বিলিতি ব্রিক-অ্যা-ব্র্যাক শ্রেণীর শেল্ফ। শেল্ফের একটি বিভাগে একটি প্রলম্বিত অংশ আছে, তার সঙ্গে একটি মোটা কাঁচের আয়না ঝোলানো থাকত। তারই নিচে ছোট্ট একটি মিনে করা চীনে বুদ্ধমূর্তি।

আমি সকাল ৮টার সময় দু মিনিটের জন্য ভিতরের দরজা দিয়ে অন্য ঘরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে কিছুক্ষণের মধ্যে আবিষ্কার করি বুদ্ধমূর্তিটি শেল্ফ থেকে ছ-সাত ফুট দূরে জানালার ধারে মেঝেতে প'ড়ে আছে। হঠাৎ এই অস্বাভাবিক ঘটনায় চম্‌কে চেয়ে দেখি শেল্ফের সেই প্রলম্বিত অংশটি ভাঙা, আয়নাখানা কে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে।

আমি, শতদল ও হিমানীশ—এই তিনমাথা একত্র হয়ে এর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না। বাইরে থেকে কোনো লোক ঘরে এসে আয়না নেবে

কেন? বাইরে থেকে কোনো চোর লম্বা কাঠিতে হুক বাধিয়ে টেনে নিলেও শুধু আয়না নেবে কেন? এবং শুধু আয়না নেবার জন্য দিনের বেলা পাড়ার লোকের দৃষ্টির সামনে কোনো লোক এতটা ঝুঁকি নেবে কেন। কোনো দিকে কোনো উদ্দেশ্য বা মীমাংসা খুঁজে পাওয়া গেল না। তিনমাথা একত্র হলে অনেক সমস্যা সমাধান হওয়ার কথা। এবং এ তিনমাথা, দুটো হাঁটুর যোগে নয়। পৃথক তিনটি মাথা, কিন্তু তবু তাতে আমাদের বেলায় কাজ হল না। ডিটেকটিভের ভঙ্গিতে ভিতরে বাইরে অনেক মাপজোক এবং থিওরি খাড়া করছি, এমন সময় রাস্তার অপর পারের ছয়ের নয় নম্বর কালীচরণ ঘোষ রোডের বাড়ি থেকে সবিতা ঘোষ (নামটা পরে জেনেছি) নামক একটি মেয়ে আমাদের দুর্দশায় স্থির থাকতে না পেরে, অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও চেঁচিয়ে বলল, "একটা হনুমান আপনাদের ঘরের একটা আয়না নিয়ে জানালার বাইরে মুখ দেখছিল, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটিকে নিয়ে পালিয়ে গেল। তাড়া করেছিলাম, আয়নাটা নিয়েই পালাল।"

হনুমানের কথায় আরামবোধ করলাম। তা হ'লে মানুষ নয়। মানুষ হ'লে রাত্রে নিশ্চয় ভয় হ'ত। চকিতে সবটা ছবি মনের মধ্যে জেগে উঠল, তৎক্ষণাৎ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "চিরুনি নিয়েছে কিনা দেখেছ?" বলল—"না, শুধু আয়না নিয়েছে।"

আগেই বলেছি, এ ঘটনাটা হনুমানের আগের কাহিনীগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে নিলে তবে সার্থক বোধ হবে, একক ভাবে প্রক্ষিপ্ত একটি হনুমান আমার কোনো স্মৃতির সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত নয়। তবু একটি কথা ব'লে রাখা ভাল যে, হনুমানের ঘোরাপথে আমার ঘরে দ্রুত প্রবেশ, এবং বহু দরকারী জিনিস, এমন কি খাদ্যদ্রব্য ফেলেও আয়না চুরির মোটিভ কি, তা আজও ভেবে পাইনি। মুখপোড়া আয়না নিয়ে কি করবে?

কলকাতার বাইরে এলাম

এইবার পূর্বপ্রসঙ্গ।

যুদ্ধের দম বন্ধকরা বিভীষিকার কয়েকটি বছর পরে ছুটি পাবামাত্র প্রথমেই কলকাতার বাইরে যাবার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠল।

১৯৪৩ সালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সম্বলপুরের অরণ্যদেশে যাবার পথে রেলগাড়ির মধ্যে আমরা নিতান্তই বালকোচিত উল্লাসে ক্ষেপে উঠেছিলাম। তেমনি একটি দিনকে এবারে আরও একবার ফিরিয়ে আনতে হবে এই রকম একটা সাধু ইচ্ছা মনে জেগেছিল। সেবারে ছিলাম চারজন (বসুমতীর চারজনের মতো)—বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমদ দাসগুপ্ত, কিরণ রায় ও আমি। ১৯৩৩এর সেই চার জন, যেন চারটি পরমাণু—সে সময় যৌগিক মিলনে একটি অণুতে পরিণত হয়েছিলাম। তারপর কতদিন কেটে গেছে অণু ভেঙে গেছে, সবই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিভূতিভূষণ নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে গেছেন—প্রমদবাবুর সঙ্গে ১৯৩৩এর পর আর দেখা হয়নি। তৃতীয় সঙ্গী ও আমি মিলে একটা অস্থায়ী অণু গঠন করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছিলাম, এমন সময় পদার্থবিজ্ঞানী সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী ও সংখ্যাবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এসে জোটাতে পদার্থ এবং সংখ্যা দুদিক থেকেই স্থায়ী অণু গঠনের সুবিধা হ'ল। অতএব আবার আমরা সংখ্যায় চারজন এবং আবার সেই ১৯৩৩এর শৈশব ফিরিয়ে আনার আশাপ্রদ সম্ভাবনা।

কিন্তু কে জানত যুদ্ধের পরেও রেলভ্রমণ এমন কঠিন হবে। গাড়ির মধ্যে শৈশব আর ফিরল না। কারণ তার জন্য অনেকখানি ফাঁকা জায়গা দরকার। মনের চাপ সরানো দরকার। তবে তো মন উচ্ছ্বসিত হবে, বুদ্‌বুদ্‌ কাটবে। এবং তার সঙ্গে দৈহিক চাপও থাকা চলবে না।

কিন্তু গাড়ির মধ্যে কোনোটাই সম্ভব হল না, যুদ্ধোত্তর ভারতীয়দের দৈহিক চাপে আমাদের দেহ-খাঁচাগুলো ভেঙে গুঁড়ো হয়ে না যায় তারই দিকে লক্ষ রাখতে একটা রাত নীরবে কেটে গেল, ভোর বেলা গিয়ে পৌঁছলাম হাজারিবাগ রোড স্টেশনে।

হঠাৎ মুক্তি। আলো এবং আকাশে মুক্তি। এরই জন্য মনটা ক্ষুধাতুর হয়ে উঠেছিল সে কথাটা এমন স্পষ্ট ক'রে আগে বুঝতে পারিনি।

ক্ষুধাতুর কি পরিমাণ হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ, আমরা ওখানে গিয়ে দু'বেলার খাবার এক বেলায় শেষ ক'রে বসলাম। কথাটায় ধাঁধা লাগতে পারে, কিন্তু আসলে এর মধ্যে ধাঁধা নেই কিছু। আরও একটু বলি। যে বাড়িতে উঠেছিলাম সে বাড়ির রক্ষকের একটি ছোট ছেলে আমাদের সঙ্গে খেতে পাবে ব'লে খুব খেটেখুটে রান্নার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিল, কিন্তু যখন

সে আমাদের খাবার সময় নিজ-চোখে দেখল ভাতের হাঁড়ির মধ্যে আমাদের চারজনের চারখানা হাত ঢুকে গেছে এবং তা থেকে নিচে অবস্থিত থালা-বাটিকে অগ্রাহ্য ক'রে সমস্ত ভাত স্ট্রেট হাঁড়ি থেকে পেটে ঢুকে যাচ্ছে, তখন সে বিষণ্ণ মনে ঘরে ফিরে গেল।

মনের খিদের কথার মধ্যে এ-সব প্রসঙ্গ তোলা অন্যায় মনে হ'তে পারে, কিন্তু ভেবে দেখলে তা মনে হবে না। প্রকৃতি দু'-ভাবে আমাদের মনকে মুক্তি দেয়। সে যেমন চোখ কান নাকের ভিতর দিয়ে দেহে প্রবেশ করে, গলার ভিতর দিয়েও তেমনি করে। পেট না ভরলে মন ভরে না, ভারসাম্য নষ্ট হয়, ওতে top-heavy হবার আশঙ্কা। অনেকে গর্ব ক'রে বলেন man cannot live by bread alone, কিন্তু কথাটা শুধু গায়ের জোরে টিকে আছে। সত্যিই এমন একটি অত্যন্ত বাজে কথা এমন জোর দিয়ে ব'লে এটাকে প্রায় প্রবাদ বাক্যে পরিণত করা হয়েছে। মানুষের কাপড়ও চাই, একখানা ঘরও চাই, এ কথা কে না জানে? যদি বলি মানুষ শুধু কাপড়ে বাঁচতে পারে না, তাহলে কথাটা একটা নতুন আবিষ্কারের মর্যাদা পাবে কেন বুঝি না। যদি বলি man cannot live by spirituality alone,—শুধু আত্মিকতা নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না, তার খাদ্যও চাই, তা হলেই বা সে কথায় নতুন কি পাওয়া গেল?

কিন্তু আমরা হাজারিবাগে যে জমিটুকুতে আশ্রয় পেলাম তার আয়তন যৎসামান্য, কিন্তু যে আকাশের নিচে নিজেদের নিয়ে হাজির করলাম, তা কোটি কোটি সূর্য সমান্বিত সংখ্যাহীন বিশ্বকে বুকে ধারণ ক'রে আছে। সেই বিপুল বিশ্বগর্ভ মহাকাশের নিচে মনের মুক্তি দেহের মুক্তি। ও দুটোকে এক নিশ্বাসে উচ্চারণ না করলে আমি আরাম বোধ করি না। একটাকে চেপে রেখে আর একটার মুক্তি আমার ধারণায় আসে না। তাই যত আকাশের কথা ভেবেছি, তত চালডালের কথা ভেবেছি। Man cannot live by space alone.

এখন যখন এ কাহিনী লিখছি, তখন নানা দেশ ভ্রমণ এবেলা ওবেলার ব্যাপার। আকাশপথে একমাসের জলপথ এখন তিন দিনে পার হওয়া যায়। হচ্ছেনও অনেকেই। তাই আজকের দিনের পাঠক হয় তো রেলপথে হাজারিবাগ ভ্রমণকে আমল দিতে চাইবেন না। কিন্তু

ভ্রমণের সার্থকতা শুধু ভৌগোলিক বিস্তারের উপর নির্ভরশীল নয়—যদিও বিস্তারেরও একটা বড় সার্থকতা আছে। কিন্তু শুধু বিস্তারে আছে কি? Man cannot live by geography alone.

আসল কথা হচ্ছে এই যে, আমি যা ক'রে থাকি তার একটা সমর্থনমূলক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার রুচিই সংসারের একমাত্র সত্য বস্তু নয়। অন্যেরা যা করেন, নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী তাঁরা সে সবের ব্যাখ্যা দেবেন, এবং তাও সত্য ব'লে মেনে নেব।

বিদেশী যুদ্ধের পর স্বদেশী যুদ্ধ

১৯৪৬ সালটি শুধু যুধ্যমান কয়েকটি জাতির পক্ষে নয়, যুদ্ধ যারা করতে চায়নি তারাও কোনো দিক দিয়ে নিষ্কৃতি পায়নি। অবশ্য আমাদের দেশ যুধ্যমান দেশই ছিল, কারণ এ দেশ তখন আমাদের ছিল না। তাকে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। এবং সম্ভবত সেই জন্যই বিশ্বযুদ্ধের পরে আমরা একটা খাঁটি স্বদেশী যুদ্ধ আরম্ভ করেছিলাম। স্বদেশী ভাষার মতোই স্বদেশী যুদ্ধ ভিন্ন আশা মেটে না।

এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল ১৯৪৬ সালের ১৬ই অগস্ট তারিখে। শুধু স্বদেশী যুদ্ধ নয়, মোটের উপর স্বদেশী অস্ত্রের যুদ্ধও এটি। বাইরের বিচারে বিদেশী ও স্বদেশী যুদ্ধে অনেক তফাৎ আছে। যুদ্ধের রীতিনীতি, অস্ত্রশস্ত্র এবং ব্যাপকতার দিক থেকে বিদেশী যুদ্ধকে অনেক মহৎ মনে হবে এবং স্বদেশী যুদ্ধকে অনেক হীন মনে হবে। কিন্তু আনন্দের দিক থেকে বিচার করলে কেউ কাউকে ছাড়িয়ে যাবে না। দুইয়েরই মূল লক্ষ্য মানুষ মারা, এবং এ ব্যাপারে দুটি রীতিই সফল। দুটি যুদ্ধেরই মূল লক্ষ্য আত্মধ্বংস, এবং তাতেও দুটি রীতিই সফল। স্ফূর্তির তীক্ষ্ণতা এবং উগ্রতাতেও দুটি সমান সমান। শুধু রণহুঙ্কারে স্বদেশী বিদেশীতে তফাৎ আছে। বিদেশী যুদ্ধে হুঙ্কার নেই, স্বদেশী যুদ্ধে হুঙ্কার একটি প্রধান স্থান দখল ক'রে আছে।

১৬ই অগস্টের আমাদের স্বদেশী যুদ্ধের খবর পরদিন কাগজে এইভাবে বেরোল—

১৭ই অগস্ট শনিবার ১৯৪৬

মুসলিম লীগ ঘোষিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে কলিকাতায় শোচনীয় দাঙ্গা ও লুঠতরাজ—৫৬জন নিহত, ৮০০জনের অধিক আহত।

১৮ই অগস্ট রবিবার

গত কালের খবর; ২৫০ জনের অধিক নিহত, ১৬০০ জনের অধিক আহত।

২০শে অগস্ট মঙ্গলবার

৩০০০ জনের বেশি নিহত, ৩৩০০ জনের উপর আহত।

২৪শে অগস্ট শনিবার

এ পর্যন্ত ২০২০টি শব উদ্ধার।

২৭শে অগস্ট মঙ্গলবার

রাজপথ থেকে ৩৫০০ মৃতদেহ অপসারিত—১৫০০০০ (দেড়লক্ষ) লোকের কলিকাতা ত্যাগ। ইত্যাদি।

এই হত্যা উৎসবের সমস্ত খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হ'তে পারেনি। একটি বড যুদ্ধের চেয়ে খুব যে হীন তা মনে হয় না। কিন্তু আরম্ভের দিকে এক ব্যাপকতা এবং মহত্ত্ব এবং মাহাত্ম্য ঠিক বুঝতে পারিনি। প্রথমে অত্যন্ত মামুলি ব্যাপার ব'লে বোধ হয়েছিল।

১৬ই অগস্ট সকালবেলা নিশ্চিন্ত মনে ঘুম থেকে উঠেছি। তারিখটি যে বাংলার ইতিহাসকে রক্ত রঙে এমন অপূর্ব সুন্দরভাবে রঞ্জিত করবে তা তখন স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ছিলাম কৈলাস বসু স্ট্রীটে, মহাকালী পাঠশালার গলির মধ্যে। অত্যন্ত সেকেলে পাড়া। আধুনিক কোনো খবরই সেখানে দ্রুত পৌঁছায় না। গলির মধ্যে দু এক জন বলাবলি করছিল দাঙ্গা বেধেছে। কিন্তু তাদের কণ্ঠে খুব জোর ছিল না, কারণ দাঙ্গার স্বরূপ কিছুই জানা যায়নি। ঠিক মনে নেই, বেলা তখন নটা দশটা হবে। দাঙ্গা যে বেধেছে তার একটি করুণ দৃশ্য দেখলাম আমাদের গলির মধ্যেই। দু চার জন বাসিন্দা বাইরে থেকে পুরনো এবং অত্যন্ত বাজে সব আসবাবপত্র টেনে টেনে এনে বাড়িতে তুলছে। ছোট ছোট ছেলেরা বলাবলি করছে, এ সব বিড়ির দোকানের জিনিস।

তখনও কেমন যেন একটা স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে সব। কোথায় কত দূরে দাঙ্গা হচ্ছে তার স্বরূপ কিছুই জানি না, কিন্তু তার জন্য আমাদের পাড়ায় এমন সব সৎকার্য আরম্ভ হ'ল কেন।

দাঙ্গা যে দাঙ্গা নয় যুদ্ধ, এ কথাটা কেমন ক'রেই বা জানব। দু'একটা দাঙ্গা নিজ চোখেই দেখেছি এর আগে। একটি ১৯২৬ সালে, আর একটি ১৯৩০ (?) সালে। প্রথমটি কলকাতায়, ইণ্টারন্যাশন্যাল বোর্ডিং (হ্যারিসন রোড মির্জাপুর স্ট্রীট)-এ ব'সে, আর একটি ঢাকায়। বছরটি ঠিক মনে পড়ছে না, তবে ১৯৩০-এর কাছাকাছি অবশ্যই। ঢাকায় এক বিয়েতে গিয়ে এই দাঙ্গার ভয়াবহ বীভৎসতার মধ্যে বাস ক'রে এসেছি দু'দিন। কিন্তু তবু তার বীভৎসতা সীমাবদ্ধ ছিল সব দিক দিয়ে। তাই কলকাতার এই স্বদেশী যুদ্ধের স্বরূপ জানবার পর সে সব দাঙ্গা স্মৃতিতে ম্লান হয়ে এসেছে।

এই ডাইরেক্ট অ্যাকশন-জাত যুদ্ধ যে প্রকৃতই যুদ্ধ, দাঙ্গা নয়, তার একটি মস্ত বড় প্রমাণ আমি পরে পেয়েছিলাম। শ্যামবাজার ডাকঘরের পিছনে এক বৃদ্ধ মুসলমান শালকর ছিল। আমার বন্ধু সুধাংশুপ্রকাশ ১৬ই অগস্টের আগে তাকে একটি শাল ধূতে দিয়েছিল। তারপর বহুকাল পরে যখন আত্মধ্বংসের লীলা শেষ হয়ে সবাই অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছে, জীবন যাত্রা স্বাভাবিক চলছে, তখন ঐ পথে একদিন যাবার সময় সুধাংশুর খেয়াল হ'ল দেখা যাক শালকর এখনও আছে কি না। আমিও সঙ্গে ছিলাম। গিয়ে দেখা গেল সে কিছুদিন হ'ল আবার এসে তার হারানো ব্যবসা পুনরুদ্ধারের কাজে লেগেছে। সুধাংশু জানত শাল সে পাবে না, এবং না পেলে তার বলবার কিছুই ছিল না, তবু জিজ্ঞাসা করল শাল কি পাওয়া যাবে। বৃদ্ধ শালকর বলল, "বাবু, শাল কি ওয়ারের আগে দিয়েছিলেন?"

বৃদ্ধ শালকর সাম্প্রদায়িক বিপর্যয়কে ওয়ার বলাতে হঠাৎ চমকে গিয়েছিলাম, এবং সে যে দাঙ্গাকে যুদ্ধ হিসাবেই নিয়েছে এ জন্য তার প্রতি শ্রদ্ধা জাগল।

সেই শাল সে সুধাংশুকে কয়েকদিন পরেই দিতে পেরেছিল, এবং এও মানুষের স্বভাবের এক আশ্চর্য দিক।
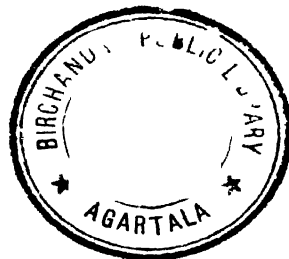
প্রাচীর টপকানো

ডাইরেক্ট অ্যাকশনের কয়েক দিনের মধ্যেই মিলিটারি বেরিয়ে শহরবাসীর মনে কিছু নিরাপত্তাবোধ জাগিয়েছিল। মাঝে মাঝে যে-কোনো এলাকায় 'সান্ধ্য আইন' জারী হ'ত। সান্ধ্য আইন বাংলা নাম হলেও প্রকাশ্য দিনের আলোতে এ আইন বলবৎ হ'তে দেখা গেছে। অতএব এর ইংরেজী নামটি ব্যবহার করা নিরাপদ—অর্থাৎ কারফিউ।

একদিন হ্যারিসন রোড থেকে কৈলাস বসু স্ট্রীট পর্যন্ত কারফিউ জারি হয়েছিল দিনের বেলা। আমাকে বাগবাজার যেতে হবে, অথচ মহাকালী পাঠশালার গলি থেকে বেরোলেই কৈলাস বসু স্ট্রীট, সেখানে পা দিলেই আইন ভঙ্গ। কৈলাস বসু স্ট্রীট এড়িয়ে বিবেকানন্দ রোডের দিকে যাবার একমাত্র উপায় মহাকালী পাঠশালার প্রাচীর ডিঙিয়ে যাওয়া। অবশেষে তাই ঠিক করা গেল। চার দিকে মারামারি কাটাকাটির খবর, ছোরা বোমা, তার মাঝখানে বাড়ি ব'সে থাকা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। তা ভিন্ন এই রকম কাজে একটা রোমাঞ্চ আছে। অতএব একটা জেদ চাপল মনে। যেতেই হবে অফিস যেমন ক'রে হোক। এটি নেহাৎ একটি বালকোচিত খেয়াল। কারণ তখন কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে গাড়িও বন্ধ। যেতে হবে হেঁটে, এবং তার আগে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন রূপ একটি কঠিন কাজ। কঠিন এ জন্য যে সেটি বর্ষাকাল, অতএব পদস্খলন অতি সহজে ঘটতে পারে।

একমাত্র ভরসা, মহাকালী পাঠশালার রক্ষক, শুকুল। সে এখন আর সেখানে নেই। কিন্তু আমি তার সাহায্য কিভাবে পেলাম তা বলতে হ'লে তার চরিত্র বর্ণনা দরকার। লোকটি নিরীহ প্রকৃতির ছিল। যুদ্ধের সময় সাইরেন বাজলে মহাকালী পাঠশালা ছিল আমাদের এ-আর-পি নির্দিষ্ট আশ্রয়। দু'বার রাত্রে ওখানে গিয়েছি—হাতীবাগানে বোমা পড়ার রাত্রে, এবং ডালহৌসি স্কয়ারে বোমা পড়ার রাত্রে। শুকুল আমরা গেলে খুব খুশি হ'ত। আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে দিয়ে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে উঠোনে ঘুরে বেড়াত। আমরা ভয়ে মরি, কিন্তু শুকুল বোমার শব্দকেও আমল না দিয়ে অবিচলিত কি ক'রে থাকত, ভেবে অবাক হতাম। একদিন

তাকে ভিতরে আসতে বলায় সে খুব বিজ্ঞের মতো বলল "বাবু, ও সব এরাই করছে, জাপানীরা আসেনি।"

কল্পনাশক্তির সীমা একটু কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা থাকলে কি পরিমাণ সুখে থাকা যায় তার দৃষ্টান্ত ঐ শুকুল। সে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ক'রে রেখেছে বোমা পড়ার ব্যাপারটা সাজানো ব্যাপার, অতএব বোমা স্কুলে পড়বে না।

শুকুল সবার সঙ্গে খাতির রাখতে চেষ্টা করত। লোকটা সে দিক দিয়ে ভালই ছিল। পাঠশালার উঠোনে একটা কাঁঠাল গাছ ছিল, তাতে কাঁঠাল ধরলে সম্ভবত সে পাড়ার ছেলেদের দিয়ে দিত। তাই একদিন স্কুলের নতুন কর্তৃপক্ষ স্কুল পুনর্গঠনের প্রয়োজনে বা অন্য কি কারণে জানি না, শুকুলকে বরখাস্ত করলেন, শুকুল স্কুলের মধ্যেই যে গোরু পালন করত, সেই গোরু এবং অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি সহ বিদায় হয়ে গেল, তখন পাড়ার ছেলেরা জুটে স্কুলের গেটের কাছে এসে চেঁচিয়ে কর্তৃপক্ষকে বলতে লাগল—"শুকুলকে নিতে হবে, কাঁঠালের ভাগ দিতে হবে।"

ধ্বনিটি আজও আমার কানে বাজছে এর অদ্ভুতত্বে। দুটি দাবী একত্র একই নিশ্বাসে পেশ করা চলে কি না তা বুদ্ধিমানেরা ভাববেন, কিন্তু ছেলেরা সরল প্রকৃতির, কোনো ঘোর প্যাঁচের মধ্যে নেই, প্রাণ যা চায় তা প্রকাশ করতে দ্বিধা করে না।

এই শুকুলকে গিয়ে বললাম, "শুকুল তোমাদের স্কুলের দেয়াল টপকানোর ব্যবস্থা কর—মৈ আন।" তাকে সব বুঝিয়ে বলাতে সে মৈ এনে দেয়ালে নির্দেশিত জায়গায় লাগিয়ে দিল। দেয়ালের অপরদিকে যেখানে একটি গাছ ছিল, আমি সেই গাছ বেয়ে নিচে নেমে গেলাম এবং মদন মিত্র লেন হয়ে বিবেকানন্দ রোডের পথে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে গিয়ে পড়লাম। এবং বাগবাজার গিয়ে যথারীতি কাজ ক'রে ঠিক ঐ একই পথে ফিরলাম। কিন্তু ফিরে আসার আগে থেকে মাঝে মাঝে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, তাই ভিজে গাছে ওঠার ঝুঁকির কথা ভেবে ভূষণচন্দ্র দাসকে অফিস থেকে সঙ্গে নিয়ে এলাম, তিনি আমার গাছে ওঠায় সাহায্য করলেন আমাকে ঠেলে রেখে। মৈ ঐ একই জায়গায় রেখে দিতে বলেছিলাম, সেইখানেই ছিল। কোনোবারেই গাছ থেকে নামা বা ওঠায় জুতো খুলিনি পা থেকে। হাতের ছাতাটিও হাতে ধরাই ছিল।

জয়ন্তীর জঙ্গলে

১৬ই অগস্টের স্বদেশী যুদ্ধের পর্ব পার হ'য়ে এসেও আগের অবস্থা আর ফিরল না। ফিরতে পারেও না। সে জন্য পূর্ব ধারণা ঘা খেলেও নতুনকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম। মনের গোঁড়ামির জন্য মাঝে মাঝে ভাল জিনিসও আমরা অগ্রাহ্য করতে চাই।

পরস্পরের বুকে ছোরা মারার মতো স্পোর্ট সংসারে কমই আছে। নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী, যথা বাঘ, সিংহ, গণ্ডার ইত্যাদি শিকারের চেয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষ শিকারে রোমাঞ্চ বেশি অবশ্যই, নইলে নরহত্যার সময় এমন অপরিমিত উল্লাস কেন? হত্যার সময় দেশের নামে বা ঈশ্বরের নামে জিগির দেওয়াও তো অকারণ নয়। নরহত্যা ধর্মের অঙ্গ, পুণ্যের কাজ, দেশপ্রেমের নামান্তর। এতদিনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি যে মানুষের বৃথা যায়নি তার প্রমাণ নিজ চোখে দেখলে যেমন পুণ্য, চিন্তা করলেও তেমনি পুণ্য। এ চিন্তা আনন্দে মনকে উদ্বেল করে তোলে।

আমারও হয়েছিল তাই। আর ঠিক এই কারণেই স্বদেশী যুদ্ধের আত্মহত্যা নিজ চোখে দেখে আনন্দে দিশাহারা হয়ে আবার বাইরে ছুটে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। মনটা তখন এত ফেঁপে উঠেছে যে শহরের ছোট পাত্রটিতে তাকে আর ধ'রে রাখা যাচ্ছে না।

এই বছরেই বাইরে যাবার দ্বিতীয় সুযোগটি পাওয়া গেল ২৩শে নবেম্বর। একই বছরে দুবার বাইরে যাওয়া মনের সত্য অস্থিরতা প্রমাণ করে। মানুষের ভিড় আর ভাল লাগছিল না, মনে হচ্ছিল হাতের কাছে যারা আছে তাদের হত্যা করি। কিন্তু একখানা ভাল ছোরার অভাবে কাজটা স্থগিত ছিল। আমি নিজে নিহত হ'তে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু কেউ সে চেষ্টা করল না, এটিও একটি ক্ষোভের কারণ।

হাজরিবাগের উদার আকাশের নিচে বৃষ্টিতে ভিজে পুণ্যস্নানের কাজ হয়েছিল, কিন্তু পাপের বোঝা বেশি হয়ে গেলে একই তীর্থে কুলোয় না। একই সঙ্গে বহু তীর্থে ঘুরে পাপীরা সকল পাপ ধুয়ে ঝরঝরে হ'য়ে ফিরে এলে

পুরনো পাপগুলোকেই আবার তাদের কাছে খুব চিত্তাকর্ষক বোধ হয়, পাপ করতে নতুন উৎসাহ জাগে। আমার অবস্থাও তেমনি হয়েছিল।

এবারে সঙ্গী মাত্র একজন। পুরনো দলেরই সে। সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী। হাজারিবাগ ভ্রমণে, তারও আগে দার্জিলিং ভ্রমণে, সে আমাদের সঙ্গী ছিল। উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, এমন কি রাজদ্বারেও (ফটকের বাইরে অবশ্য) তার বন্ধুত্বের প্রমাণ হয়ে গেছে, এখন শেষ পরীক্ষা হবে শ্মশানে, যদি অন্যের ঘাড়ে উঠে আমরা একত্র সেখানে যেতে পারি।

তারই সঙ্গ পেলাম এবারে।

বাল্যকালে দর্জিলিং যেতে শুকনা স্টেশনের পর থেকে যে অরণ্য আরম্ভ হয়েছে, ক্রমোচ্চতার পথে রেলগাড়িতে যেতে মনে তা এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগিয়েছিল। 'থ্রিলিং' ভিন্ন অন্য কোনো একটি শব্দে তাকে প্রকাশ করা যায় না। সেই বালক বয়সেই একদা খেলাচ্ছলে, বৈদ্যুতিক চিকিৎসায় তখনকার দিনের ব্যবহৃত ব্যাটারির দুটি তারসংলগ্ন হাতল ধ'রে সমস্ত দেহে যে শিহরণ অনুভব করেছিলাম, হিমালয়ের প্রথম স্পর্শ থেকে ক্রমে উপরে উঠতে সর্বক্ষণ সেই শিহরণ অনুভব করেছি—সেই ১৯১৩ সালে। সেই স্মৃতি মনের মধ্যে জমা হয়ে ছিল। এবারে জয়ন্তীতে সেই হিমালয়ের পাদমূলে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করতে করতে কতবার সেই স্মৃতি জেগে উঠেছে মনের মধ্যে, কতবার চমকে উঠেছি।

কিন্তু এবারে সেই মূঢ়তা নেই। এবারে দৃষ্টিতে সচেতনতা। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? আধুনিক কালের সকল চিহ্নহীন সেই আদিম অরণ্যের গভীরদেশে—যেখানে গলা ফাটিয়ে চেঁচালে তা কোনো মানুষের কানে পৌঁছবে না, যেখানে "শুনে তোমার মুখের বাণী আসবে ছুটে বনের প্রাণী"—যেখানে সূর্যের আলো বনস্পতিদের শিরস্পর্শ করে মাত্র, ভিতরে প্রবেশ করে না, যেখানে সব ভৌতিক, সব অবাস্তব বোধ হয়, যেখানে পাহাড়ী নদীগুলি অজস্র নুড়ির শূন্য বিছানা ফেলে শীতের প্রথম স্পর্শে কোথায় পালিয়ে গিয়ে একটা ভয়াবহ শ্মশানশূন্যতার ছবি ফুটিয়ে রেখেছে, সেখানে ব'সে মনের সচেতনতা কতক্ষণ বজায় রাখা যায়? এই পরিবেশের নিজস্ব এমন একটি প্রবল মোহ-সৃষ্টিকারী শক্তি আছে, যার আকর্ষণে সমস্ত চেতনচিন্তা ভেঙে যায়।

কিন্তু এখানে এলাম কি ক'রে তা বলা দরকার। এর বিস্তারিত বর্ণনা সেই সময়েই প্রবাসীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল (পরে 'পথে পথে' বইয়ের অন্তর্ভুক্ত)। আজ ১৪ বছর পরে সমস্ত ঘটনাটি আবার নতুন চোখে দেখছি। সবই চোখ থেকে মর্মে প্রবেশ করেছে—কবির ভাষায়—"Felt in the blood, and felt along the heart."

শিকারশিল্পী এবং শিকারবিজ্ঞানী অশোক মৈত্রের সঙ্গে নবেম্বরের গোড়ায় মাত্র কয়েক মিনিট আলোচনা হয় ৬৫ হ্যারিসন রোডে ব'সে। আলোচনাটা হাতীখেদা দেখার সুযোগ নিয়ে।

অশোক জলপাইগুড়ি চ'লে গেল এবং গিয়ে হঠাৎ একদিন জানাল অবিলম্বে রওনা হও, খেদা দেখার সুযোগ মিলবে।

আমরা তৈরিই ছিলাম। দুজনে ২৪শে নবেম্বর সকালে জলপাইগুড়ি গিয়ে পৌঁছলাম এবং সেখানে কয়েকদিন কাটিয়ে রওনা হ'য়ে গেলাম জয়ন্তীর উদ্দেশে। জয়ন্তী জায়গাটি জলপাইগুড়ি শহরের উত্তর-পূবে, হিমালয়ের নিচে। একটি অতি খরবেগা ও প্রখরশব্দা নদীর উপরে ডাক বাংলো। নদীর নামও জয়ন্তী। হিমালয়ের কোনো বড় উৎসের উপর নির্ভরশীল। তাই নবেম্বর ডিসেম্বরেও এর যথেষ্ট জল, যা অন্য সব ছোট ছোট প্রবাহিণীতে নেই। সেগুলো এখন একেবারে শুকনো।

অপরূপ সৌন্দর্য এ জায়গাটির। সামনে হিমালয়ের বিশাল বিস্তার। তার সমস্ত দেহে অজস্র বড় বড় গাছ এবং ঝোপঝাড়। বাঘ হরিণদের চলাফেরা এবং বাসের স্থান। নিচে গলিত রৌপ্যপ্রবাহ, তার কলশব্দ অন্য সকল শব্দকে ছাপিয়ে যায়। বহু দূর থেকে শোনা যায়। পাহাড়গুলির চূড়ায় চূড়ায় মেঘেরা খেলা করতে করতে পাহাড়ে মেঘে মিলে সব একাকার হয়ে যায়। আকাশ ছেয়ে ফেলে, তখন মনে হয় পাহাড়ের চূড়াগুলিই যেন উপরে উঠতে গিয়ে হেলে প'ড়ে নদীর উপর দিয়ে একটি বিরাট তোরণ তৈরি করেছে, সে তোরণ এপারের বনস্পতিদের মাথায় ঠেকে এক অদ্ভুত সৌন্দর্যময় দৃশ্য রচিত হয়েছে। তার নিচে আমরা ব'সে আছি।

আমাদের বাংলোর সামনেই এই ঘটনা ঘটছে যখন-তখন। এখানে আমরা দিন দশেক ছিলাম, তার মধ্যে হাতীখেদায় গিয়ে হাতী ধরা দেখেছি, ভূটান সীমানায় গিয়ে তার মাটি স্পর্শ করেছি, বক্সার বন্দিশালা

দেখেছি (দূর থেকে), কিন্তু এ সবই তুচ্ছ হয়ে গেছে একবেলার অরণ্য-ভ্রমণের কাছে।

হিংস্র জন্তুর ভয়সঙ্কুল জনমানবহীন প্রাচীন অরণ্যে একটি খণ্ড-পাহাড়ের অতিকায় কচ্ছপপিঠের উপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে মনে যে বিচিত্র অনুভূতি জেগেছিল তা এমনই জটিল যে তা এক কথায় বুঝিয়ে বলবার সাধ্য নেই আমার, তবু যেটুকু চেষ্টা করব তাইতে বুঝে নিতে হবে। কলকাতার ছোরার সঙ্গে তার বৈপরীত্য এতই বেশি যে, এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি বেশি ভাল তা আমি বুঝতে পারি নি, তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে শহরের একঘেয়েমি থেকে মন কয়েক দিনের জন্য মুক্তি পেয়েছিল।

সে দিনটি ৫ই ডিসেম্বর ১৯৪৬।

পথে কাঁটা ছিল, আমারও সর্বাঙ্গ কণ্টকিত। ক্রমে আমরা ঘন অন্ধকারের ঘন জঙ্গলে চলেছি এবং ক্রমে উঁচুতে উঠছি।

বহু কোটি বছরের অতীতে ফিরে গিয়েছিলাম।

ঘন বর্ষায় মনে যে বিচ্ছিন্ন একটা কালের অনুভূতি জাগায়—এ তা থেকে আলাদা। এও বিচ্ছিন্ন কাল, কিন্তু তা শুধু বর্তমান থেকে বিচ্ছিন্ন। এবং তা একটি বিশেষ অতীত কাল, যা অনন্ত সম্ভাবনা নিয়ে বিবর্তনের পথে একটি নির্দিষ্ট ধাপ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। সে কালটা মানুষের আবির্ভাবের আগের কাল।

তার মধ্যে আমি একা ব'সে। কাছের দুজন (সুধাংশু, ও শীতলাকান্ত শীল, এঞ্জিনিয়ার এবং গাইড) আমার কাছে তখন অস্তিত্বহীন। এই রকম একটি ভ্রান্তি সম্ভবত দু-তিন মিনিটের জন্য আমার মনে ভর করেছিল, কিন্তু সেই অল্প ক্ষণকে মনে হয়েছিল যেন কত কাল। ব্যাপক কালের একটা মিনিয়েচার সংস্করণ। মনে হয়েছিল আমি যেন সেই আদিযুগের পরিবেশে নতুন আসা একটিমাত্র মানুষ। সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক সৃষ্টির মধ্যে প্রক্ষিপ্ত একটি মানুষ। ঘণ্টাখানেক হেঁটে এই ভয়ঙ্কর নির্জন অরণ্যগহ্বরে প্রবেশ করেছি এবং সে পথ কিছুদূর এমনই দুর্গম যে এত দুর্গম পথ জীবনে আর কোনোদিন অতিক্রম করিনি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দেহ ক্লান্ত এবং অবসন্ন। এমনি অবস্থায় পাহাড়ের সেই কূর্মপৃষ্ঠে দেহটাকে এলিয়ে দিতেই মনে ঐ জাতীয় সব কাব্যসুলভ কল্পনা ভর ক'রে থাকবে।

সে সময় সমস্ত প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির ছবিটাই আমার মনে চকিতে জেগে

উঠেছিল। সৃষ্টিরহস্য নিয়ে কিছুদিন অনুশীলন করলে মহাজাগতিক বিরাট কালকে সর্বদা ছোট পরিসরে দেখা যায়। প্ল্যানেটারিয়ামে যেমন আমাদের বোধের অগোচর গ্রহনক্ষত্রের গতি অল্প পরিসরে প্রত্যক্ষ করা যায়, এও অনেকটা তেমনি। আমাদের মনের মধ্যে একটি ক'রে প্ল্যানেটারিয়াম প্রতিষ্ঠিত আছে, তাকে অবশ্য অনেক সাধনায় আবিষ্কার ক'রে নিতে হয়।

বিবর্তনবাদের বোধ মনের মধ্যে সত্য হ'য়ে উঠলে পৃথিবীর সমস্ত গাছপালা লতাগুল্ম কীটপতঙ্গ উদ্ভিদ আর অন্যান্য যে-কোনো প্রাণীকে নিজের জ্ঞাতিগুষ্টি ব'লে চিনে নিতে দেরি হয় না। প্রত্যেকটি বস্তু বা প্রাণীর আবির্ভাব যখন চোখের সামনে প্রত্যক্ষবৎ বোধ হয়, তখন আমি কল্পনায়-ডোবা আর এক মানুষ। এ উপলব্ধিকাল অবশ্যই ক্ষণস্থায়ী, কারণ কল্পনার মধ্যে সব সময় ডুবে থাকা যায় না। কল্পনায় বিবর্তনপথের বাঘ আমার সহযাত্রী, আমার আত্মীয়। কিন্তু বাস্তব বাঘ, বাস্তব আমির মুখোমুখি?—সে এক বীভৎস ব্যাপার।

তবু এই হিংস্র জন্তুর কল্পনা থেকেই আমি একটি জিনিস এই অরণ্য সম্পর্কে আবিষ্কার করেছি। তা এই যে, এ অরণ্যের এমন উন্মাদকরা আকর্ষণের একমাত্র কারণ, এর সঙ্গে হিংস্র জন্তুর ভয় ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। ছোরা আছে ব'লে যেমন জীবন এমন সুন্দর, এমন সার্থক, এমন অর্থপূর্ণ, তেমনি যখন-তখন বাঘ সাপ বা পাগলা হাতীর আবির্ভাবের সম্ভাবনা আছে ব'লে অরণ্যদেশ আমাদের কাছে এমন হৃদয়গ্রাহী।

সেদিনও এই ভয়ই এ অরণ্যকে আমার চোখে এমন সুন্দর ক'রে তুলেছিল সন্দেহ নেই। আমার এখন মনে হয় সেই আদিম বনভূমির প্রত্যেকটি গাছের আড়ালে, প্রত্যেকটি ঝোপের অন্ধকারে, প্রত্যেকটি পাহাড়-পিঠের অন্তরালে, একটি ক'রে বাঘ লুকিয়ে আছে তা যেন স্পষ্ট দেখেছিলাম। বাঘ, সাপ এবং পাগলা হাতী—এ তিনই সেখানে বিপজ্জনক, এবং এই তিনের জন্য অরণ্য-আকর্ষণও তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক দিকে বিবর্তনবিশ্বাসী মনের চোখে সৃষ্টির ধারা প্রত্যক্ষ করা, অন্য দিকে সেই বিবর্তনপথে আসা হিংস্র জন্তুর ভয়, বোধের মধ্যে এ দুয়ের মিশ্রণ যে কি অপূর্ব এক উপলব্ধি তা সেদিন সেইখানে ব'সে ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিল না, সে প্রবৃত্তিও হয়নি। অনেক দিন পরে ব্যাখ্যা মনে জেগেছে।

একটি কথা এইখানে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার এই যে, এই দিনের অরণ্যযাত্রায় অশোক মৈত্রের রাইফলের নিরাপত্তা আমাদের ছিল না, কারণ সে আমাদের সঙ্গে আসেনি। আমাদের পথপ্রদর্শক শীতলাকান্ত শীলের হাতে একখানা টাঙ্গী অবশ্য ছিল আর আমাদের প্রধান রক্ষীর কাজ করছিল তাঁর পোষা একটি পাঁচ-ছয় ইঞ্চি উঁচু পোস্টকার্ড সাইজের কুকুর।

যাই হোক ১৯৪৬ সালের প্রকৃতিগঙ্গায় এই দ্বিতীয় পুণ্যস্নান আমার পক্ষে জরুরি প্রয়োজন ছিল। অন্তত এক পক্ষকালের জন্য পরিচিত পরিবেশ আর লোকালয় থেকে দূরে বন্য প্রকৃতির এই মাথা-খারাপ-করা আচরণ আমাকে স্বদেশী যুদ্ধের কথাও ভুলিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু সবই ক্ষণস্থায়ী। চাণক্যের 'চলচ্চিত্তং চলদ্‌বিত্তং' শ্লোক লেখার আগে থেকেই বিশ্ববস্তুর অনিত্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে। অনিত্য বলেই তো নিত্য আনন্দ।

আনন্দের প্রমাণও পেলাম ফিরে আসতে আসতে। ৮ই ডিসেম্বর ফিরছি। তার আগে থেকেই কলকাতায় ছোরার খেলা একটু একটু ক'রে চলছিলই। মাত্র একবার একটি সৌজন্য সপ্তাহ পালন করা হয়েছিল, কিন্তু সে এক বছর পরে—স্বাধীনতা ঘোষণার সপ্তাহে। সে কথা পরে আসবে। সেই একটিমাত্র সৌজন্য সপ্তাহে পরস্পর আলিঙ্গন চলেছিল, তার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোথাও না কোথাও এই পরম রোমাঞ্চকর খেলাটি চলেইছে।

আমি যখন জয়ন্তীতে, তখনও চলছিল। মাঝে মাঝে তীব্রতা বাড়ছিল খবর পাচ্ছিলাম সেখানে বসেই। কিন্তু এত দূর থেকে ঠিক অবস্থাটা ঠিক মতো বোঝা যায় না। স্টেশনে (দার্জিলিং মেলে শিয়ালদ) নেমে বাড়ির পথে যেতে হয় তো হাসপাতালে বা শ্মশানে যেতে হবে, এই কল্পনায় অহেতুক একটা আনন্দ শিহরণ থেকে থেকে মনকে নাচাচ্ছিল।

আমরা রাত্রে পার্বতীপুর জংশনে এসে দার্জিলিং মেলের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, এমন সময় হঠাৎ আমার পূর্ব পরিচিত বন্ধু পল্লীসঙ্গীত গায়ক আব্বাস উদ্দীনকে প্ল্যাটফর্মে দেখে পূর্ব অভ্যাস মতো বেশ একটু উল্লাস জাগল মনে। তাঁরও জাগল আমাকে দেখে। কিন্তু আলাপ করতে করতে মাঝে মাঝে সম্ভবতঃ দু'জনেই দু'জনের ডান হাতের দিকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলাম।

দু' জনের স্বাদহীন একটা প্রথাগত পরিচয়ের মধ্যে এই যে রোমাঞ্চ প্রবেশ করল, এর জন্যও এতদিন মন কম ক্ষুধার্ত ছিল না। দিন পনেরো এই কথাটাই ভুলে ছিলাম।

১৯৪৬ থেকে পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি

যুদ্ধের ভিতর হঠাৎ বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে বই পড়ার ইচ্ছাটা খুব বেড়ে যায়। আজ ১৯৫১ সালের সংবাদ—বাংলাদেশে নভেল পাঠক সবচেয়ে বেশি, এবং যদিও এ হিসাব নতুন কোনো আবিষ্কার নয়, কেন না আমার মতে গল্প-উপন্যাসের পাঠক সব দেশেই (ভারতের সব রাজ্যের কথা বলছি না) বেশি, তবু এ কথা স্বীকার করতে হবে গত যুদ্ধের সময় আমাদের দেশের পাঠকদের মধ্যে নানা বিষয়ে জানবার আগ্রহ হঠাৎ খুব বেড়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের পরিণাম, মানুষের ভবিষ্যৎ, আধুনিক যুদ্ধের প্রকৃতি, যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, সমরশক্তি প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত সাধারণ লোকের মধ্যেও জিজ্ঞাসা জেগেছিল। যে-কোনো লোক যে-কোনো বই কিনছে, আরও পড়বে আরও জানবে, এ রকম একটা উন্মাদনা জেগেছিল বাংলাদেশে। তথ্য সম্বলিত অনেক প্রবন্ধের বইয়ের একাধিক মুদ্রণ হয়েছে এ সময়। ঠিক এর আগে এ জিনিস বাংলাদেশে প্রায় অসম্ভব ছিল।

মনের মধ্যে যেন একটা বায়ুশূন্যতার অবস্থা। মানুষ হঠাৎ হাল্কা জিনিস ফেলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগী হ'য়ে উঠেছিল। গল্প-উপন্যাসও তখন খুব বিক্রি হয়েছে, কারণ বাস্তবের রূঢ়তা থেকে কিছু সময়ের জন্য পালিয়ে থাকার দলেও লোক কম ছিল না।

যুদ্ধের গুরুত্ব যে এতখানি তা আগে বোঝা যায়নি এবং এ যুদ্ধ যখন মাথার উপরে এসে পড়ল, তখন দেখা গেল এর চরিত্র বিষয়ে আমাদের আর উদাসীন থাকা চলে না। তাই যুদ্ধ সম্পর্কিত বইয়ের চাহিদাও খুব বেড়ে গেল।

রাত্রে শহর অন্ধকারে থাকলেও মন অন্ধকারে থাকতে আর রাজি নয়। তার জ্ঞানের আলো চাই। রাত্রে যে বোমাটা মাথার উপর পড়বে, তা কি কি উপাদানে তৈরি তা দিনের আলো থাকতে থাকতে জানা দরকার, যুদ্ধের কারণটা জানা দরকার। এই ভাবে একটার পর একটা প্রশ্ন জাগছে মনে আর উত্তর খোঁজা হচ্ছে বইয়ের মধ্যে।

এইভাবে মনে পাঠের আগ্রহ জাগিয়ে দিয়ে যুদ্ধ বিদায় নিল, কিন্তু পাঠের আগ্রহটা সঙ্গে নিয়ে গেল না। তাই নতুন নতুন বই প্রকাশের জন্য একটা প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল অপ্রকাশকদের মধ্যেও, অর্থাৎ যারা এ পথে নবাগত। অবশ্য এদের মধ্যে 'ওষধি' জাতীয়ই বেশি, 'বনস্পতি' বিরল।

একদল আনাড়ি প্রকাশকের অভিজ্ঞতা লাভ হ'ল আমার। একদিন সকালে কয়েকটি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে এলো দেখা করতে। বলল, "আমরা একটি সংকলন বার করছি, আপনার একটা গল্প চাই।"

এ বছরে এ রকম এত এসেছে যে আমি কাউকে খুশি করতে পারিনি। তাই 'দিতে পারব না' না ব'লে এক নতুন উপায় অবলম্বন করলাম। যাতে তারা আর লেখা না চায় সেই উদ্দেশ্যে লেখার জন্য একটা মোটা টাকার অঙ্ক বললাম। আরও বললাম, "টাকা আগে দিয়ে যেতে হবে, এবং যেদিন পাব, তার তিনদিন পরে গল্প দেব।"

ওরা এ কথা শুনে একটু দূরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে কি পরামর্শ করল, এবং ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করল, "গল্পটি কত বড় হবে?"

আমি বললাম, "তা বলা যায় না। লিখতে গিয়ে যা হয়। এক পাতাও হ'তে পারে, দশ পাতাও হ'তে পারে।"

আবার ওরা নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ পরামর্শ করল এবং এগিয়ে এসে বলল, "আচ্ছা, টাকা দিয়ে যাব।"

তারপর আর দেখা নেই ওদের। ভাবলাম প্রক্রিয়ায় কাজ হয়েছে। কিন্তু আমারই ভুল। দিন দশেক পরে (৩রা নবেম্বর ১৯৪৭) হঠাৎ এসে বলল, "লেখা হয়েছে?"

আমি আমার শর্ত স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম, "কথা ছিল আগে টাকা দিয়ে যাবে।"

"আসতে পারিনি, এই নিন টাকা।"

আমি স্তম্ভিত।

টাকা ওরা সত্যিই দিয়ে গেল, এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমিও গল্প দিলাম তিনদিন পরে।

গল্প নিয়ে গেল, কিন্তু তার ভাগ্যে কি হয়েছিল তা জানি না, কারণ তারপরে ওরা আর আসেনি, বইও পাইনি। শুধু নিরুৎসাহ করার জন্য যে টাকা

চেয়েছিলাম তা যে ওরা সত্যিই দেবে তা কি ক'রে জানব। কিন্তু এই ঘটনা থেকে বোঝা গেল তখন বই পড়ার আগ্রহ যেমন লোকের বেড়ে গেছে, তেমনি অনেকের হাতে প্রচুর টাকাও এসেছে। তা ভিন্ন বই ছেপে যে লাভ করা যায় একথা তখন বালকদের মধ্যেও প্রচারিত হয়েছে।

তখন থেকে অনেক প্রসিদ্ধ লেখকও গ্রন্থ-প্রকাশক হয়েছেন। এবং যাঁরা হননি, সুযোগ পেলে তাঁরাও যে হতেন না এমন কথা জোর ক'রে বলা যায় না। তবু প্রকাশক না হলেও আজকের দিনের ক'জন লেখক রবীন্দ্রনাথের মতো সমস্ত কণ্ঠশক্তি প্রয়োগ ক'রে গর্বের সঙ্গে বলতে পারেন, "আমি শুধু লিখি" ?

কাহিনীটা শুনেছিলাম শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তের মুখে। মূলে কোনো সত্য আছে কিনা জানি না, কিন্তু গল্পটা এমন সত্য যে ওর আর বদল হবার যো নেই।

যে ভাবে শুনেছিলাম তা মোটামুটি এই—

রেলগাড়িতে রবীন্দ্রনাথ চলছিলেন বোলপুর বা অন্য কোথাও। গাড়িতে একজন অবাঙালী সহযাত্রী ছিলেন। সে ভদ্রলোকের বোধ হয় অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার অভ্যাস নেই, তাই আলাপ জুড়ে দেবার চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করলেন, "মহাশয়ের কত দূর যাওয়া হবে ?"

রবীন্দ্রনাথ বই পড়ছিলেন, তা থেকে মুখ তুলে সংক্ষেপে এবং সামান্য বিরক্তির সঙ্গে নিজ গন্তব্যস্থানের নাম করলেন।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

"মহাশয়ের কি করা হয় ?"

আবার সংক্ষিপ্ত এবং সবিরক্তি জবাব, "লিখি।"

এবারে কবি অন্য দিকে ঘুরে বসলেন। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

সহযাত্রী উসখুস করছেন এবং শেষ পর্যন্ত ধৈর্যহারা হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"আমি বলছিলাম, মহাশয়ের চাকরি-বাকরি বা অন্য কাজকর্ম কিছু করা হয় কি ?

কবি এবারে উত্তেজিত। তিনি কণ্ঠ সপ্তমে চড়িয়ে বললেন, "না।—শু-ধু-লি-খি।" এবং ব'লেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

"শুধু লিখি"—এমন কথা অতীতেও কম লেখকই বলতে পারতেন,

এখনও ক'জন পারেন জানি না। তবে "লিখি এবং বই ছাপি" অথবা "লিখি এবং চাকরি করি" বা ঐ রকম কিছুই অধিকাংশ লেখক বলবেন। মোটকথা লিখির সঙ্গে অন্য কিছু জুড়তে হবে।

স্বাধীনতা ও ছোরা

৩রা জুন ১৯৪৭—বিকেলে আমার একটি রেডিও বক্তৃতা ছিল। ব্রিটিশ-রাজ ভারতে কি ভাবে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন তারও ঘোষণা প্রচার করা হবে সেইদিনই। ঐখানে বসেই ঘোষণা শুনলাম। স্বাধীনতা দেওয়া হবে ১৫ই অগস্ট।

১৫ই অগস্ট এলো অবশেষে। রাত বারোটার পরই স্বাধীনতা পেয়েছি। ইতিমধ্যে ছোরার বন্ধুত্ব (আমাদের পরাধীন জীবনে ঐ একটি মাত্র বিষয়ে একটুখানি যা স্বাধীনতা) তা এতদিনে সৌভাগ্যবশতঃ দীর্ঘ-মেয়াদি হয়ে পড়েছে এবং তা সবারই জীবনে একটি নতুন আলো বয়ে এনেছে। অত্যন্ত ভাল লাগছে সবার। বহুদিনের অভ্যাস করা নেশার মতো সুন্দর লাগছে, যদিও খবরের কাগজে লেখা হচ্ছে উল্টো ক'রে।

স্বাধীনতা কি জিনিষ তা না জানায় সবাই প্রায় বিভ্রান্ত, সবাই আনন্দে লুটোপুটি খাচ্ছে. কি করবে বুঝতে না পেরে দিশাহারা হয়ে পড়েছে। ভোরবেলা থেকে খবরের কাগজের জন্য অপেক্ষা করছে।

১৫ই অগস্ট স্টেটসম্যানের প্রধান শিরোনামা:

TWO DOMINIONS ARE BORN

Political Freedom For One-Fifth of Human Race.

এবং তার ঠিক নিচেই:

NO DISTURBANCE IN CALCUTTA

No incidents of a communal nature occurred in Calcutta and Howrah yesterday.

অমৃতবাজার পত্রিকার শিরোনামা লাল হরফে:

INDIA INDEPENDENT TODAY

এবং পাশের প্রধান খবর:

FRATRICIDAL BLOODBATH SUDDENLY ENDS

ইস্তেহাদের সম্মুখ পৃষ্ঠা আরও সংক্ষিপ্ত এবং অনাড়ম্বর। বাঁয়ের দিকে ভারতীয় এবং ডান দিকে পাকিস্তানের পতাকা—দুইই রঙীন। এবং বাকী অর্ধ পৃষ্ঠায় প্রথমে গান্ধী ও পাশে জিনার ছবি, উপরে শিরোনামা: "চল্লিশ কোটি মানুষের নেতা ও পতাকা"—এবং অন্য পৃষ্ঠায় "স্বাধীনতার পদধ্বনিতে কলিকাতায় শান্তির আবহাওয়া···শান্তিস্থাপনে মিঃ সোহরাওয়ার্দীর অনশন করিবার সিদ্ধান্ত।"

ইস্তেহাদের আর একটি সংবাদ:

কুষ্টিয়ায় জনসভা: কলিকাতার সংখ্যাগুরুদের নিকট আবেদন। ১৩ই অগস্ট ১৯৪৭। কলিকাতায় সংখ্যালঘুদের উপর সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের যে হীন বর্বর আক্রমণ চলিতেছে, এর জন্য কমিটি দুঃখ প্রকাশ করে ও এই অমানুষিক অত্যাচার সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করিবার জন্য কংগ্রেসী মন্ত্রীদের উপর চাপ দিবার জন্য স্থানীয় হিন্দু নেতাদিগকে অনুরোধ জানায়।"···

ইস্তেহাদের সঙ্গে আমার সে সময়েই মতভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল আমার মনে। কারণ আমার মতে আক্রমণ মাত্রেই মধুর, যেমন আমার মধুর মনে হয়েছিল ডাইরেক্ট অ্যাকশনের আক্রমণ। কলকাতার সংখ্যাগুরুর আক্রমণও ঐ একই রকম মধুর এবং সম্পূর্ণ সভ্যতা-অনুমোদিত। দুটি আক্রমণের একটি বর্বর অন্যটি সভ্য একথা মানি না, আমার মতে দুটিই সমান সভ্য।

১৫ই অগস্ট আজাদের সম্মুখ পৃষ্ঠার শিরোনামা—

"ভারতের (ভারতের কথাটি এখানে ভুল প্রয়োগ করা হয়েছে, শুধু স্বাধীনতার হবে) স্বাধীনতার প্রতীক: দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা।

এই শিরোনামার নিচে ভারতীয় পতাকা ও তার নিচে পাকিস্তানের পতাকা। ভারতীয় পতাকার পাশে চারি দিকে বর্ডার দেওয়া উদ্ধৃতি:

"ভারতের প্রত্যেক মুসলমান ভারতীয় জাতীয় পতাকাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিবেন এবং এই পতাকাকে জাতীয় পতাকা বলিয়া গ্রহণ করিতে গর্ব বোধ করিবেন। প্রত্যেক অনুগত নাগরিকের কর্তব্য হইবে এই পতাকার সম্মানরক্ষা ও বৃদ্ধি করা।"

—চৌধুরী খালেকুজ্জমান।

তারপর পাকিস্তানের পতাকার পাশে বর্ডার-বেষ্টিত উদ্ধৃতি—

"আমরা পাকিস্থানের নাগরিক হইতে স্বীকৃত হইতেছি এবং তৎসহ উহার যাবতীয় তাৎপর্য মানিয়া লইতেছি।

"আমরা মিলিতভাবে নূতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া যেমন উহার সুখ ও সমৃদ্ধির অংশ ভোগ করিবার আশা করি, তেমনি উহার প্রতিষ্ঠাকল্পে যাবতীয় বিপদেরও সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত থাকিব।

"পাকিস্তানের পতাকাকে আমরা আমাদের জাতীয় পতাকা রূপে গ্রহণ করিতেছি।"

--কিরণশঙ্কর রায়।

এবং অন্য পৃষ্ঠায়—"অকস্মাৎ দাঙ্গা পরিস্থিতির পরিবর্তন, হিন্দু-মুসলমান জনতার অপূর্ব মিলন।"……

আর একটি বিশেষ খবর—

"গতকল্য বৃহস্পতিবার রাত্রি একটার সময় মিঃ সোহরওয়ার্দী নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন—

"আমি এইমাত্র শহর প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলাম। আমি যাহা দেখিযাছি তাহা অভূতপূর্ব বিস্ময়কর। হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতৃবিরোধ ভুলিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে। আল্লার নিকট প্রার্থনা করি এই মিলন যেন চিরস্থায়ী থাকে।"

অন্যত্র: "বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেকটরের দপ্তর হইতে প্রকাশিত এক প্রেসনোটে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রাত্রি সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত কলিকাতা ও হাওড়ায় গতকল্য বৃহস্পতিবার কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক গোলমাল ঘটে নাই।

"স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ সোহরওয়ার্দী ও কলিকাতা জিলা লীগের সেক্রেটারি মিঃ ওসমান অদ্য গান্ধীজির সহিত ২৪ ঘণ্টা কাল অনশন করিবেন"…

কিন্তু একমাত্র দৈনিক বসুমতীর স্বাধীনতা-দিবস সংখ্যায় দাঙ্গা সম্পর্কে কোনো খবর নেই। দৈনিক বসুমতীর প্রধান শিরোনামা "ভারতে সুদীর্ঘ দুইশত বৎসরব্যাপী কুখ্যাত ব্রিটিশ শাসনের অবসান।"

কিন্তু দৈনিক বসুমতীর দ্বিতীয় সম্পাদকীয় প্রথমেই জমিয়ে দিয়েছে—একেবারে শিরোনামাতেই। শিরোনামা হচ্ছে—"ইহা কি সত্য?"

"ইহা কি সত্য যে, চিৎপুর থানার ভারপ্রাপ্ত জনপ্রিয় হিন্দু ইনসপেক্টরকে পুলিস কমিশনার মিঃ হার্ডউইক সাসপেণ্ড করিয়াছেন?

"ইহা কি সত্য যে···ইত্যাদি"

এ প্রশ্নের একই উত্তর এবং আপাততঃ আমি সে উত্তর দিচ্ছি: "ইহা অবশ্যই সত্য, এবং একমাত্র সত্য।" কারণ স্বাধীনতার কয়েকটা দিন প্রকৃতই কি সত্য তা না বুঝতে পেরে খুব নাচ গান আলিঙ্গন ইত্যাদিতে কাটল। ছোরা খাপে ঢুকল। কিন্তু সত্যমেব জয়তে। দুটি রাজনৈতিক সম্প্রদায় (ধর্মীয় সম্প্রদায় মিথ্যা কথা) যদি পরস্পরের বুকে ছুরিই না বেঁধাবে তবে বেঁচে লাভ কি? মানুষের জীবন থেকে নুনঝাল বাদ দিয়ে জীবনটাকে জলো ক'রে কি লাভ? লাভ নেই, তার প্রমাণ আজও পাওয়া যাচ্ছে দুটি দেশের প্রায় সব জায়গাতেই। সুরাওয়ার্দি সাহেব গান্ধীজির সঙ্গে অনশন কালে বলেছিলেন সাম্প্রদায়িক মিলনের জন্য তিনি প্রাণ দেবেন।

এ সবই স্বাধীনতা-মাদকতা। তারপর নেশা কেটে গেলে দুটি স্বাধীন দেশে পরাধীন কলকাতা নোয়াখালি বিহারের চেয়েও বেশি লোকের বুকে ছুরি বিঁধেছে, এবং ওর জন্য কোনো নেতার প্রাণ দেবার দরকার হয়নি, একমাত্র গান্ধীজি ছাড়া। কিন্তু তাতে প্রগতির কোনো বদল হয়নি, জগৎ যেমন চলছিল তেমনি চলছে। কারণ মানুষ পথের সন্ধান পেয়ে গেছে, এখন তাকে ফেরাবে কে?

সংসারে হাজার রকম ভেদ আছে। জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, নীতিতে নীতিতে; প্রত্যেক ' পের দুটি ভেদ পরস্পর দ্বন্দ্ব চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে আমাদের দেশে সে সবকে ছাপিয়ে এখন প্রধান লড়াই চলছে দুচারজন সাধুর সঙ্গে কোটি কোটি চোরের। চোরেরা বেশি প্রগতিশীল, তারা আধুনিক, তারা দুঃসাহসী, তারা যৌবনধর্মী। পক্ষান্তরে সাধুরা সেকেলে, তারা প্রগতিবিরোধী এবং সংরক্ষণশীল। তাই চোরেরাই জিতছে। বাজারের থলে বহন ক'রে কি রোজ টের পাওয়া যাচ্ছে না কে জিতছে?

আমি নিজে প্রগতিপন্থী।

আরণ্যক

আরও একবার অরণ্য পর্বের কথা স্মরণ করি।

গত মাসে আমি এই প্রসঙ্গে শিকারশিল্পী ও শিকারবিজ্ঞানী—এই দুটি বিশেষণসহ আমাদের নব-অরণ্যধর্মে দীক্ষাদানকারী অশোক মৈত্রের নাম করেছিলাম।

অশোক শিকারপ্রিয়, কিন্তু এই বিদ্যা যে তাকে এমন ভাবে আরণ্যক ক'রে তুলেছে তা আগে ঠিক এতটা বুঝতে পারিনি। আরণ্যক অর্থাৎ অরণ্য বিশেষজ্ঞ। জীবজন্তু বিষয়ে এমন নিখুঁৎ এবং ব্যাপক প্রাণিবিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান যে কোনো বাঙালী শিকারীর থাকতে পারে তাও আগে জানা ছিল না। ব্যাপক এই অর্থে যে, শিকারের লক্ষ্যের বাইরের জন্তুদের সম্পর্কেও তার জ্ঞান গভীর। সে জন্য কোনো শিকারীর লেখায় কোনো অতিশয়োক্তি বা ভুল তথ্য থাকলে অশোক বড়ই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। শিকার বিষয়ে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি এ যুগে আর কোন্ শিকারীর আছে জানি না, তবে এ প্রসঙ্গে এখন শুধু হাজারিবাগের বিখ্যাত শিকারী, শ্রীবিজয়কান্ত সেনের কথা মনে পড়ে।

অশোককে অনুরোধ ক'রে শিকার বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়েছিলাম। কিন্তু নিজের নামে সে গুলো প্রকাশ করায় তার কুণ্ঠা ছিল, তাই "আরণ্যক" এই ছদ্মনামের আশ্রয়। উচ্ছ্বাসহীন অথচ সরস এবং চিত্তাকর্ষক ভাষায় লেখা এমন চমৎকার শিকারের গল্পগুলো প্রকাশকদের দৃষ্টিতে পড়েনি। এর যথার্থ মূল্য দেবার মতো লোক থাকলে অশোককে দিয়ে বড় বই লেখানো যেত, কিন্তু হয় তো তার সত্যনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং উচ্ছ্বাসের অভাবই তার অন্তরায়।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্রের পক্ষে শিকার কাহিনীতে কাব্যের ভেজাল দেওয়া খুব কঠিন হ'ত না, তার আরও প্রমাণ অশোক নিজে কবি—ইংরেজী ও বাংলা কবিতা তার ছাপা হয়েছে প্রথম শ্রেণীর কাগজেই। কিন্তু লেখা বিষয়ে মাত্রা জ্ঞান থাকলে কাব্যের অপব্যবহার সম্ভব নয়। এবং তার বাংলা গদ্য রচনাও যে কত রসসমৃদ্ধ তার নমুনাস্বরূপ আমি তার দুখানা

চিঠি এইখানে উদ্ধৃত করছি। চিঠি দুখানার যে উত্তর দিয়েছিলাম তা মিলিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে, কেন তার একটি কথায়—সে যে আমাদের ডোরা-কাটা বাঘ ও পাগলা হাতীর অরণ্যে নিয়ে ছেড়ে দেবে তা জেনেও—তার কাছে যেতে রাজি হয়েছিলাম। সে জন্য আমার দুখানা চিঠিও এই সঙ্গে জুড়ে দিলাম।

কিন্তু তার আগে যে চিঠির ডাকে রওনা হয়েছিলাম, সেই (ইংরেজী) চিঠিখানা আগে উদ্ধৃত করি।

Jalpaiguri
20. 11. 46.

My dear Parimal babu,

Please start on the 22nd, and meet me here. We shall start for the duars on the 23rd. I am waiting for you. Rather cold here, so warm clothes are indicated.

Expecting to see you on Friday.

Yours Sincerely
Asok.

যে চিঠি দুখানা এর পর উদ্ধৃত করছি, তা কয়েক বছর পরের।

সেবক রোড
শিলিগুড়ি
৬।১।৫১

"প্রীতিভাজনেষু,

আপনাদের ছাড়িয়া আসিয়া জাঁতাকলে পড়িয়াছি। কর্মচক্রের চক্রান্ত যে বিধাতা এইভাবে রচিবেন তাহা ভাবি নাই। প্রচণ্ড শীত। আমার মত বড সাহেবকেও এখানে লেপ করাইতে হইয়াছে। শিলিগুড়ির ফাঁকা মাঠে যে আমার অন্ধকারময় ভবিষ্যতের মত গাঢ় আঁধার নামে সন্ধ্যার পর, তাহাও ভাবি নাই। কোথায় অরণ্যের পরিচিত গলিঘুঁজি, কোথায় নিশীথে মাচার উপর প্রেয়সী শয্যাসঙ্গিনী বনোরমা ক্ষীণকটি রাইফলের বিশ্রস্ত স্পর্শসুখ! সন্ধ্যার পর নিজেকে নিশাচর বোধ হয়। এখন তিব্বতী পশম বহন

করিতেছি। সিকিম অবধি খচ্চরের পিঠে আসিয়া এখানে গাধার পিঠে উঠিয়া অধঃপতন হইল পশমগুলির।

১১।২।৫১

"উক্ত চিঠিখানা ফলাও ক'রে আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু কার্যগতিকে তার উদ্দাম ধারা কাজের মরুভূমিতে ক্ষীণতর, তম, হয়ে আত্মগোপন করেছিল। কাল শচীনের সঙ্গে এক আড্ডায় গিয়েছিলাম, শিকারের কথা আমার বিনা উৎসাহে শচীন তুলল। তারপর শুনুন—এক ভদ্রলোক কোন অজ্ঞাত মহারাজার সম্বন্ধে বললেন, বর্তমান মহারাজার প্যালেসে এক বিরাট বাঘ (স্টাফ-করা) দেখে তাঁর বৃত্তান্ত জানতে ইচ্ছা হোল, মহারাজা বাহাদুর বললেন তাঁর ঠাকুরদাদা এক সাহেবের সঙ্গে শিকারে গিয়েছিলেন। সাহেবের হাতে রাইফল, তাঁর হাতে তরওয়াল। বাঘটা হঠাৎ চার্জ করবার উদ্যোগ করতে সাহেব তো মূর্ছা যান আর কি। তখন বীর রাজা এক লাফে এগিয়ে এসে বললেন (হুংকার দিয়ে) "উল্লুকা বাচ্ছা, বিল্লিকো সাথ খেল করনে আয়া?" বলেই এক কোপে তরওযাল দিয়ে দু'খানা করে ফেললেন।

"আর একজন তখন সুরু করলেন—Bradley Birt সায়েবকে সুন্দরবনে শিকারে নিয়ে গেছলেন। বাঘ দেখে সায়েব কিছুতেই গুলি করতে চান না। শেষে তাঁরা নিজেরাই বাঘ খুঁজে একেবারে ডবল ভাইট্যাল শট করলেন। বলা বাহুল্য একবারেই মরল। মেপে দেখা গেল? মেপে দেখা গেল—দশ হাত। কোথাকার বাঘ কোথায় গড়ায় বলুন দেখি? হ্যাঁ মশায়, আমি কি মোবাইল চিড়িয়াখানা? আমাকে দেখলেই কারও হাতীর কথা কারও বাঘের গল্প মনে পড়ে? আপনার দোয়াতে আমার এই অবস্থা। যাক উড়ে এসে জুড়ে বসেছি। এখানে কেউ বিশেষ নেই। চুরুট খাচ্ছি ও ভাবছি থিওসফিক্যাল সোসাইটির মেম্বার হয়ে মৃত ব্যাঘ্রাত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে জিজ্ঞেস করব, মহাশয়েরা দয়া করে জ্যান্ত অবস্থায় আপনারা কত হাত ছিলেন এবং কি করে মরেছেন? রামপ্রসাদের ভাবে উদ্দীপিত হয়ে বলতে ইচ্ছে করছে "এবার বাঘা তোমায় খাব।" যাক আড্ডাধারীদের আমার কথা বলবেন ও দয়া করে সংবাদ+পত্র দেবেন।

অশোক দেবশর্মণ: (আরণ্যক নয়, নয়, নয়।)"

এ চিঠির যে উত্তর দিয়েছিলাম—

কলিকাতা-৬

১৫-২-৫২

প্রীতিভাজনেষু,

প্লেন থেকে লাফিয়ে পড়েই চিঠি লিখছেন, সেজন্য বেশ একটা হাল্কা হাল্কা ভাব। চিঠি আজ প'ড়ে শোনালাম সবাইকে, বাঘের গল্পটি উপাদেয়। ঐ রকম আর একটা পেলেই আপনার একটি পাতা ভরতি হতে পারে।

থিওসফিক্যাল সোসাইটির মেম্বার হবার দরকার কি? আপনি এলে আমরা প্ল্যানশেটে ডাকব ওদের, কিন্তু মীডিয়াম হবে কে? "—"বাবু মীডিয়াম হ'লে কামড়ে দিতে পারে। আপনার হাতে বন্দুক আছে নিশ্চিন্ত, কিন্তু আমার খবর বেরোবে Parimal mauled maltreated man-handled, mutilated, molested and finally mashed by medium.

যাই হোক গল্পটি দামী, প্রতি চিঠিতে একটি ক'রে পাঠান, আপনার নামেই জমা হবে। অথবা সব মিলিয়ে একটি অখণ্ড ব্যাঘ্র চরিত। মীডিয়ামে একের পর এক ব্যাঘ্রাত্মা ভর করছে এবং পেন্সিলের সাহায্যে জীবন কাহিনী লিখে দিয়ে যাচ্ছে, এই রকম একটা প্লট সাজানো যায়, অথবা বাঘের "নিজস্ব ডায়ারি" থেকে টুকে লেখা যায়।

আপনি অরণ্যে ব'সে আরণ্যক নয় কেন?

আপনি নিশাচর বলাতেই বা আপত্তি কেন? আপনার প্রতি আমার আকর্ষণের একটি প্রধান হেতু—আপনি মানুষের সমাজ ছেড়ে অরণ্যভূমির সঙ্গে নিবিড় হয়েছেন।

অরণ্য আমার সকল সত্তাকে টানে। বাল্যকাল থেকে একা একা পদ্মানদীর ধারে ছোট ছোট ঝাউগাছের দীর্ঘ সারির ভিতরে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ বসে কাটিয়েছি। নদী বয়ে চলেছে সমুখ দিয়ে। উপরে আকাশ, দূরে দিগন্ত রেখা, এপারে আমি। আকাশে চিল, নিচে নৌকা। স্রোতের গুরুগম্ভীর শব্দ। এমনি পরিবেশে আমার মন কোন্ এক স্বপ্নে আচ্ছন্ন। সেই স্মৃতি আমার সমস্ত মনে জড়িয়ে আছে। তাই সহরবাসী মন আজ মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে। দেশে যাবার উপায় নেই, সেখানে সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণের যোগ, সেই কথাটা কোনো অবস্থাতেই ভুলতে পারি না।

তাই আপনার কথা মনে হ'লে আপনার চারদিকের সমস্ত নদী অরণ্য পর্বত আকাশ মিলিয়ে আপনাকে মনে পড়ে। আপনি যখন শহরে আসেন তখন মনে হয় যেন সমস্ত জলপাইগুড়ি দার্জিলিঙ আপনার সঙ্গে এসেছে, আশেপাশে দু-চারটে হরিণ ও বাঘও যেন দেখা যায়। ইতি—

পরিমল

দ্বিতীয় চিঠিখানা আমার চিঠির জবাবে লেখা—

শিলিগুড়ি

২৪।২।৫১

"প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুসী হোলাম। আপনি যদিও শহরবাসী, তবু সহুরে নন। পদ্মার উদাসকরা জলকল্লোল আপনার চিঠির ছত্রে ছত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে; বিচ্ছেদের ব্যথা আপনার হৃদয়ে পদ্মার মতই সুগভীর।

"আমার বাড়ী গোরই নদীর উপর, আমিও আপনার বেদনার কিছু অংশ পেলাম। তবে প্রায় ১১ বছর বাড়ী ছেড়েছি নানা কারণে, মনের ভিতর অনেকখানি চর পড়ে গেছে, স্রোত ব্যাহত।

"প্লেন থেকে নেমে এসে ক্রমে ভারী হয়ে উঠেছি, আর হাল্কা রস জোগাচ্ছে না। এসে অবধি কাজের অজাগরী আলিঙ্গনে মনের অবস্থা নিষ্পেষিত মৃগশিশুর মত হয়ে উঠেছে। বেশ হাত-পা ছড়িয়ে নবীন বসন্তের চাঞ্চল্যকর আগমন লক্ষ্য করবার অবসর পাচ্ছি না। কাজের চেয়ে সমস্যাচিন্তাই বেশী। মাইল দুয়েক দূরে গভীর জঙ্গলের শালের জমাট শ্যামলিমা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি আর ভাবি কবে ওর ভিতরে স্বেচ্ছাচারী মন ছুটি পাবে।

"বহুদিন আগের গিরিডির কথা মনে পড়ে। পূজোর ছুটিতে যেতাম, ছোটবেলায় মুক্তির আনন্দে ভরপুর। কিন্তু বিধি বাম। বাবা কোনো খবরই নিতেন না, ছুটির সময়ে পুত্রের সম্বন্ধে খুব কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠতেন। বাড়ীর সামনে ঘনশ্যাম শালের সারির উপর অস্তমান সূর্য নামছে, আর বাবার পড়ার ঘরে তিনি বিরক্ত হয়ে ইংরেজী ব্যাকরণের অতি সাধারণ সূত্রগুলি আমার মাথায় ঢোকাবার চেষ্টা করছেন। দূরে রাস্তায় দেখছি খেলার সাথীরা হাতে ফুটবল নাচাতে নাচাতে চলে গেল। ছুটি পাবার কামনা ও ভীতি মিশে নেস্‌ফিল্ডকে অতি দুর্বোধ্য করে তুলেছে, হয়ত পুত্রের মূঢ়তায়

হতাশ হয়ে পিতৃদেব ব্যাকরণখানা সজোরে বাগানের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, কম্পিতপদে কুড়িয়ে এনে আবার পাঠ নিতে লাগলাম।

"ইতিমধ্যে শালবনের পাতার ভিতর সূর্যের লাল আভার টুকরো দেখা যাচ্ছে, ফুটবল খেলার হাফ টাইম পার হয়ে গেছে। তখন শালের সারি যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কিন্তু ছুটি হোল যখন গোধূলি গতপ্রায়। অভিমানভরে আর বাড়ী থেকে বেরোলাম না। চুপচাপ বারান্দায় বসে পশ্চিম আকাশের বিলীয়মান আলোর মৃত্যুদৃশ্য দেখলাম। জীবনের একটা মূল্যবান অপরাহ্ণ পার হয়ে গেল। এই রকম কত সকাল, কত দুপুর, কত রাতই আমাদের এড়িয়ে যে চলে যায়, সেই বঞ্চনার খেসারত কে দেয়? হয়ত প্রাপ্তির মূল্য স্মৃতির ভাণ্ডার দেয়।

"যাক, চিঠিখানা যেন একটু নাটকীয় হয়ে উঠছে। করি কি মশায়, সীজন্ শেষ হতে চলল, একটা টোটা ছুঁড়তে পারিনি এখনও। দুর্গা জঙ্গলে ক্যাম্প করেছে...আর আমি শালা ভাগাড়ের শকুন মড়া আগলে বসে আছি। জঙ্গল থেকে প্রায় রোজই চাঞ্চল্যকর খবর পাচ্ছি; আরও মর্মদাহ।

"জলপাইগুড়ি রাজবাড়ীর আবর্জনা থেকে একটা অতি পুরাতন বই যোগাড় করেছি "আপনার মুখ আপনি দেখ"। অতি মনোরম পুস্তক। ভাল করে এখনও পড়তে পারিনি। আজ পড়ব ভাবছি।

"খবর কিছুই বিশেষ নেই। আপনাদের বিস্তারিত খবর দেবেন। কলকাতার আড্ডার খবর stimulating. ইতি—

আরণ্যক (নকল)"

আমার উত্তর—

কলিকাতা-৬

৫।৩।৫১

সুহৃদ্বরেষু,

আমার ঠিকানায় দেখছি আপনি ৩৫-ডি এর বদলে ২৫-ডি লিখেছেন। দশ কমিয়ে ফেলা ভারী হওয়ায় লক্ষণ নয়।

যাই হোক চিঠিখানা ঠিক সময়েই এসেছে, কিন্তু আমি হঠাৎ অ্যামিবা নামক আদিম এককোষ প্রাণীর আক্রমণে ধরাশায়ী হয়েছিলাম। কাল থেকে ভাল আছি।

আপনার চিঠিখানা কিন্তু ভারী, নানা দিক দিয়েই। ওখানা আড্ডার সবাইকে দেখানো হয়েছে, অতএব আরও চাই। শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী সপ্তাহে অন্তত পাঁচ দিন আমাদের বাড়িতে নিয়মিত এসে আড্ডা জমাচ্ছেন। আসেন সকালের দিকে। তাঁকেও চিঠি দেখিয়েছি।

কলকাতার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠছে, লোকের পরনে কাপড় নেই। মন্ত্রী মহাশয় হাফ প্যান্ট পরার উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু তাও দুর্লভ হবে অল্প দিনের মধ্যে। আর কলকাতায় হওয়া মানেই বাংলার সর্বত্র হওয়া। অতএব কয়েক ডজন করিয়ে রাখুন অবিলম্বে। কিংবা হয় তো দরকার হবে না আপনার, আপনি আরণ্যক। ঐ নামটি এ সময়ে ছাড়বেন না। হাফপ্যান্ট প'রে অন্তত হাফ আরণ্যক হয়ে থাকুন। আপনার প্রতিবেশী বাঘেরা কিন্তু এ বিষয়ে সুখে আছে। তারা জন্মাবধি একটাই শীতের জামা (ডোরাকাটা) গায়ে শীত গ্রীষ্ম কাটিয়ে দেয়। ওরা ফুল-আরণ্যক। মানুষের বেলায় পুরোপুরি কিছুই হবার উপায় নেই···কিন্তু এসব আধ্যাত্মিক আলোচনা থাক, কারণ বাস্তব জগৎই আমাদের আসল জগৎ। সেই বাস্তবজগতে প্রতিদিন সূর্য উঠছে বিশ্ব-সংসারকে আলোর প্লাবনে ডুবিয়ে দিয়ে। প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে পশ্চিম আকাশে বহ্নি-উৎসব সমাপ্ত ক'রে। দেখার সুযোগ পাই না। হাফ প্যান্টের চেয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিস্ময় কি আমাদের জীবনে কম সত্য? এই বিস্ময়, এই strangeness, এই যে ক্ষুদ্র আমির সঙ্গে সীমাহীন বিশ্বের ঐকসূরত্ব—এই উপলব্ধিকে রোম্যান্টিক বিলাস বলুন যা বলুন এ কি কম সত্য?

অতএব বেরিয়ে পড়ুন, গুলি চালিয়ে যান, বাঘ মারুন। এছাড়া পাগল হওয়ার হাত থেকে বাঁচবার আর পথ নেই। ইতি—

পরিমল

অশোকের চিঠিগুলির ভিতর দিয়ে তার চরিত্রের যে দিকটি অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এই দিকটি সে কারো কাছে সাধারণতঃ প্রকাশ করে না, ভিজে কম্বল চাপা দিয়ে রেখে দেয়।

মানুষের চরিত্রের বহু দিক। যথার্থ ভাল দিক অধিকাংশ সময়েই অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। যত্ন করে আবিষ্কার ক'রে নিতে পারলে অনেক ভুল বোঝার হাত থেকে বাঁচা সম্ভব।

তার চিঠির এক জায়গায় তার পিতার (হেরম্বচন্দ্র মৈত্র) সম্পর্কে যে ছবিটি ফুটেছে তা খুবই সুন্দর। এবং ইংরেজী ব্যাকরণ বিষয়ে পুত্রের সম্বন্ধে তাঁর যে উদ্বেগ তা বৃথা যায়নি, পুত্রের ইংরেজী ভাষার উপর দখল প্রশংসনীয়।

শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত

স্মৃতিচিত্রণে শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের সামান্য পরিচয় দিয়েছিলাম। আমার অনেক বেদনাময় মুহূর্তের সঙ্গে তাঁর গভীর স্নেহের স্মৃতিটি জড়িয়ে আছে। অবশ্য তা নিতান্তই ব্যক্তিগত। আমি এই আশ্চর্য মানুষটির কথা কখনও ভুলতে পারি না। আজ তাঁর বয়স আশী পার হয়েছে, কিন্তু মনে হয়, যেন গত কুড়ি বছর ধ'রে তাঁকে একই বয়সের দেখছি। তাঁকে শেষ দেখেছি গত ৬ই অগস্ট। সে দিনটি তিনি সকাল থেকে রাত প্রায় আটটা পর্যন্ত সিঁথিতে আমাদের নতুন পরিবর্তিত ঠিকানার বাড়িতে কাটিয়ে গেলেন। ঠিক আগের মতোই আছেন। বলেন, এখনও আট-ন মাইল হাঁটতে পারি।

বাংলাদেশে প্রাচীন কালে যে সব দরিদ্র অথচ আত্মভোলা, নিজের আনন্দে নিজে ডুবে থাকা, সদা প্রফুল্ল, সদা প্রসন্ন, মানুষদের কথা শোনা যায় এঁর মধ্যে তাঁদের কিছু উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে, অথচ তাঁদের থেকে কত স্বতন্ত্র। কারণ দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও এঁর দারিদ্র্য স্বেচ্ছায় বরণ করা। এক কালে দরিদ্র অবস্থায় জন্মেছিলেন, কোনো অবস্থাতেই তাঁর সেই পরিচয় তিনি ছাড়েননি। এবং যে দুষ্টুমি বুদ্ধির জন্য তিনি বহু তিরস্কার সহ্য করেছেন, সে দুষ্টুমি বুদ্ধি তাঁর মজ্জাগত। ছেলেবেলায় যে সব কৌতুক অত্যন্ত প্রিয় ছিল, অন্যকে একটুখানি বেকায়দায় ফেলে মজা দেখা তা তাঁর চরিত্রে স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে সংসার থেকে ছুটি নেওয়ার আগে পর্যন্ত। এই দুষ্টুমি বুদ্ধির সাহায্যে তিনি অনেক অন্যায়কারীকে জব্দ করেছেন। এবং তা কখনও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়।

তাঁর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা। এইটিই তাঁর চরিত্রের প্রধান ভিত্তি। এমন দৃঢ়তা আর জেদ বাঙালী চরিত্রে দুর্লভ। এ বিষয়ে

একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে। ছেলেবেলায় তিনি কাকার হাতে মানুষ হয়েছিলেন। তাঁর চরিত্রের দুটি প্রবল বৈশিষ্ট্য শরৎচন্দ্রের চরিত্রে কিছু প্রতিফলিত হয়েছে। কঠোরতা এবং কোমলতা— দুদিকেই তিনি ছিলেন চরম পন্থী। শরৎচন্দ্রের চরিত্রেও এই দুটি বিশিষ্টতা স্পষ্ট।

শরৎচন্দ্র গ্রীষ্মকালে নদীর চরের উপর দিয়ে খালি পায়ে স্কুলে যেতে বড়ই কষ্ট পেতেন। গরম বালিতে পায়ে ফোস্কা প'ড়ে যেত। একদিন তিনি সসঙ্কোচে নিজের অসুবিধার কথা জানিয়ে কাকার কাছে এক জোড়া জুতো প্রার্থনা করেছিলেন। কাকা রসিকলাল পণ্ডিত তা শুনে বললেন গ্রামের সেকরাকে বিকেলে ডেকে আন। ব্যাপারটা বোধগম্য না হলেও শরৎচন্দ্র আশা করেছিলেন জুতো বোধ হয় পাওয়া যাবে।

সেকরার একখানা পা কাঠের। সে এলে রসিকলাল তার পায়ের দিকে দেখিয়ে শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন দেখ্ শরৎ, ওর একখানা পা নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও ও সব কাজই চালিয়ে যাচ্ছে। আর তোর এক জোড়া জুতো না হ'লে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হবে?

আজ শরৎচন্দ্রের বয়স একাশী, আজও তাঁর পায়ে জুতো ওঠেনি। দুষ্টের দমনের জন্য তিনি মাঝে মাঝে যে জুতো ব্যবহার করেছেন তা পায়ের নয়, কাব্যের।

এমন দৃঢ়তা, এমন প্রতিজ্ঞা রক্ষার দৃষ্টান্ত রামায়ণ মহাভারতের যুগ ভিন্ন অন্য কোন্ যুগে আর মিলবে?

শরৎচন্দ্র কখনও কারো অনুগ্রহ ভিক্ষা করেননি। হাজার হাজার টাকার পুরস্কার বা সস্নেহ দানকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। দারিদ্র্যকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন বাল্যকালে। দারিদ্র্য অদ্যাবধি এক মুহূর্তের জন্য তাঁকে পরাভূত করতে পারেনি। এ এক আশ্চর্য মানসিক পৌরুষ। এই পৌরুষের অর্থ আমরা আজ ভুলেছি। এই মানসিক পৌরুষই তাঁকে রাজা মহারাজা দূরের কথা, কোনো দেবতার কাছেও ভিক্ষার হাত পাততে দেয়নি। এ বিষয়ে অনেক গল্প জমা আছে তাঁর জীবনে।

পুত্রের কঠিন অসুখ। স্ত্রী গিয়েছিলেন ভগবতীকে পূজো দিতে তার কল্যাণ কামনায়। তখন দুর্গাপূজা চলছিল। শরৎচন্দ্র তা শুনে স্ত্রীকে

বলেছিলেন—যে দেবী নিজের ছেলের শুড ভাল করতে পারেন না, তিনি তোমার ছেলের অসুখ ভাল করবেন, একথা কি ক'রে ভাবলে ?

আর একটি চরম দৃষ্টান্ত, যার তুলনা আমি আর কোথাও খুঁজে পাই না।

মৃত পুত্র চিতায়। শরৎচন্দ্র প্রশান্ত মূর্তিতে কর্তব্য করে চলেছেন বেদনার বহিঃপ্রকাশ নেই। এক বন্ধু তাঁর মনটাকে অন্য বিষয়ে ফিরিয়ে দিয়ে বেদনার কিছু উপশম হবে আশায় তাঁকে বললেন, এখন যদি মুখে মুখে রচনা ক'রে গান করতে পারেন তবে বুঝব আপনার মনের জোর।

শরৎচন্দ্র তাঁর মুখের দিকে মুহূর্তকাল চেয়ে সেই অভাবিত অনুরোধ পালন করতে লাগলেন :

দুখ দিয়ে বুক ভাঙবে তুমি
তাই ভেবেছ ভগবান।
আমি মাব খাব তাও কাঁদব না কো
পরাণ খুলে গাইব গান।
দত্তাপহারী হলে
নিলে জিনিস করে দান।
ভাগ্যে আমাব হবে যা হোক,
হলাম তোমার দুখের গ্রাহক,
তোমার ভাণ্ডারের দুখ খালি করে
করব দুখের অবসান।

এই গানটি আমি শরৎচন্দ্রের মুখে অনেকবার শুনেছি। এক মাস আগেও অনুরোধ করেছিলাম গাইতে। এই গানটি যতবার শুনি, ততবার এই আশ্চর্য মানুষটির অন্তর প্রদেশ আমার কাছে নতুন ক'রে খুলে যায়, আমি বিস্ময়ে অভিভূত হই। গানেব গলা ঠিক তেমনি আছে, যেমন শুনেছি দু'-তিন বছর আগে। এবারেও গাইলেন—এবং শুধু এটি নয়—অনেক গান শোনালেন সমস্ত দিন ধ'রে।

অদ্ভুত মনোবল, অদ্ভুত দুনিয়াকে অগ্রাহ্য ক'রে চলা। এই মনোবলই সম্ভবত তাঁর মেরুদণ্ডকে আজও এই একাশী বছর বয়সেও খাড়া রেখেছে, বেঁকতে দেয়নি। মনের মেরুদণ্ডটি দৃশ্য হ'লে সন্দেহ রইত না যে সেটি ইস্পাতের তৈরি।

সাধারণ মানুষ বঞ্চিত মানুষ তাঁর সহানুভূতি থেকে কখনও বঞ্চিত হয় না। সব সময় তাদের দুঃখে কাতর হয়ে তাদের পক্ষ নিয়ে কবিতা গান রচনা করেছেন, তারা তাদের এই দা-ঠাকুরের মধ্যে পেয়েছে তাদের আপন জন। মাঝে মাঝে এই "দা-ঠাকুর" রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্যের ঠাকুরদাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

কিন্তু শুধু গানে আর কবিতায় সব শেষ নয়। শুধু কল্পনা বিলাস নয়। শরৎচন্দ্রের জীবনে কোনো বিলাসেরই জায়গা নেই।

সিউড়িতে লাট-সম্বর্ধনায় শরৎচন্দ্র নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। গুরুসদয় দত্ত তখন বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট। লাটসাহেব তখন লর্ড রোনালডশে। শরৎচন্দ্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক অভিনয়ে সভার সবাইকে আনন্দ দান করবেন, এই হেতু তাঁকে ডাকা। কিন্তু সভায় তাঁকে ঢুকতে দেওয়ায় বাধা। লাটের চীফ সেক্রেটারি গুরলে সাহেব নগ্নগাত্র নগ্নপদ একজন সাধারণ মানুষকে প্রবেশ-পথে বাধা দিলেন।

তখন দত্ত সাহেব লাটসাহেবের অনুমতি নিয়ে এলেন। শরৎচন্দ্র গুরলেকে বলেছিলেন তোমরা কি হোমরা-চোমরা কয়েক জনকে সভায় বসিয়ে বাংলা দেশের পরিচয় দিতে চাও? দেখাতে চাও যে এখানে সবাই মহা সুখে আছে?

তাঁকে গায়ের পোষাক ও পায়ের জুতো আনিয়ে দেবার প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। অর্থাৎ "আমি যেমন ঠিক তেমনি আমাকে যেতে দিতে হবে।"

কত দুঃস্থকে যে তিনি সাহায্য করেছেন তার হিসাব নেই। পাঁচ শ টাকার দায়গ্রস্তকে নিজে হ্যাণ্ডনোট দিয়ে টাকা ধার ক'রে দায় উদ্ধার করিয়েছেন।

আজ থেকে প্রায় ৪৬ বছর আগের একটি ঘটনা। পাঁচসিকে থেকে উন্নীত হয়ে তখন তিনি রঘুনাথগঞ্জে আড়াই টাকা ভাড়ার ঘরে প্রেস চালান। পূজোর জন্য একটি আগমনী কবিতা লিখবেন ভাবছেন এমন সময় কতগুলো লাঠি হাতে হিন্দুস্থানী মোট বাহক সেখানে এসে মোট নামাল কিছু বিশ্রামের আশায়। বলল তামাক খাব। তামাক দেওয়া হল। তার পর খৈনি টিপতে লাগল। এরা সবাই রাজার বাড়ির চাকর।

শরৎচন্দ্র ওদের কাছে নানা প্রশ্ন ক'রে জানতে পারলেন তারা চুপড়ি ভরতি লাউ কুমড়ো ইত্যাদি নানা তবকারী সবই প্রজাদের বাড়ি থেকে আদায় ক'রে আনছে রাজবাড়িতে পূজোর জন্য। ঘি দই যারা তৈরি করে, তারাও বিনা পয়সায় যোগান দেবে। ওরা খুব খেতে পাবে কি না জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল, ওরা সমস্ত দিন মুড়ি খেয়ে কাটাবে। তারপর ভোজের শেষে সবার উচ্ছিষ্ট যা থাকে তাই খাবে।

শরৎচন্দ্রের চোখের সামনে সমস্ত ছবিটি ফুটে উঠল। এ সব জবরদস্তি চালিয়ে সংগ্রহ করা প্রজার বাড়িব জিনিষ দেবী কি ক'রে গ্রহণ করবেন। এ সবই তো দীন দবিদ্রের চোখের জল।

আগমনী গান লেখা হয়ে গেল।

রাজার বাড়ি পূজার ধুম
এলেন দশভুজা,
প্রবৃত্তি হল না কিন্তু
নিতে বাজাব পূজা।

এইভাবে আরম্ভ কবে যাবতীয় বর্ণনাব পব এইভাবে শেষ করলেন :

মা বললেন এ পূজাতে
নাইকো কোন ফল,
রাজবাড়ির সব জিনিসই
দীনেব আঁখিজল।

চবিত্রেব এটি একটি দুর্লভ দিক। একদিকে প্রখব আত্মসম্মানবোধ তাঁকে যেমন ভিক্ষা কবতে বাধা দিয়েছে তেমনি তা তাঁকে বার বার দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ ক'বেও তাঁকে কদাপি পবাস্ত করতে পারেনি। মঙ্গলকাব্যের যাবতীয় দেবতা এঁর সঙ্গে লড়াই কবতে এলে হেরে যেতেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চাঁদ সদাগর শরৎচন্দ্রকে প্রতিনিধি বানিয়ে পরীক্ষা ক'বে দেখলে পারতেন। অনেক মনসা দেবীই এঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন।

এক পুত্রের পিতা কি ভাবে হেরেছিলেন এখানে মাত্র সেইটি উল্লেখ করছি, পরে আরও অনেক কাহিনী আসবে।

এন্ট্রান্স পাস ক'রে কলেজে পড়বাব সময় শরৎচন্দ্রকে একটি টিউশন

যোগাড় করতে হয়। ছোট ছেলেকে পড়াতে হবে। কিন্তু পড়াতে গিয়ে দেখেন তার সঙ্গে আরও একটি ছোট ছেলেকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, অথচ তাকে তাঁর পড়াবার কথা নয়। শুধু একটি আদেশ—"এটিকেও একটু দেখো মাষ্টার।"

কয়েক দিন পরে ছেলের বাবা এসে বললেন, "বড় ছেলেটির মন্দ· হচ্ছে না, কিন্তু ছোটটি এক মাসেও শট্‌কে শিখল না।"

শরৎচন্দ্র পরদিন তাকে নিয়ে পড়লেন। ছেলেটি তাঁর শিক্ষার অভিনব কৌশলে একদিনে অপ্রত্যাশিত ভাবে অনেক কিছু শিখে ফেলল।

ছেলের বাবা এসে পরীক্ষা ক'রে অবাক।

শরৎচন্দ্র পরদিন থেকে আর তাদের পড়াতে যাননি।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত একবার এক চানাচুরওয়ালার পক্ষ নিয়ে একটা বিশেষ অন্যায়ের প্রতিকার (অথবা প্রতিশোধ) মানসে এমন একটি অধ্যবসায়পূর্ণ, শ্রমসঙ্কুল, শত্রুবৃদ্ধিকারী এবং দীর্ঘমেয়াদি জেদ দেখিয়েছিলেন যা কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তিনি সেই চানাচুর বিক্রেতাকে জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারের পদে বসিয়ে তবে ছেড়েছিলেন। তখন তার নাম হ'ল শ্রীকার্তিকচন্দ্র সাহা জং মিং কং। এই ভাবেই সে নাম সই করতে শিখেছিল শরৎচন্দ্রের কাছে।

আবার এই শরৎচন্দ্রই রাত দুটোয় পার্শ্বে শায়িত নলিনীকান্ত সরকারের ঘুম ভাঙিয়ে তাঁকে এই জরুরি খবরটি শুনিয়েছিলেন :

"ওরে নলে, নলিনী পণ্ডিতের সব সম্পত্তির মালিক আমরা।"

সদ্য ঘুমভাঙা নলিনীকান্ত প্রথমে কোনো বিপদ আশঙ্কা করেছিলেন। তারপর রসিকতা হৃদয়ঙ্গম ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন "কেমন ক'রে?"

সোজা হিসেব। তুই নলিনী, আমি পণ্ডিত।

তখন নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত জীবিত ছিলেন।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত 'বিদূষক' নামক এক কাগজ চালাতেন। (চালাতেন কি ভাবে, এখানে তার মনোগ্রাহী বৃত্তান্ত বলবার স্থানাভাব)।

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোনো আসরে শরৎচন্দ্র পণ্ডিতকে প্রবেশ করতে দেখেই ব'লে উঠলেন, "এই যে বিদূষক শরৎচন্দ্র!"

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ বললেন, "এই যে চরিত্রহীন শরৎচন্দ্র, ভাল তো ?"

'চরিত্রহীন' উপন্যাস তখন সদ্য প্রকাশিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত সম্পর্কে আমার বিস্ময় এমনই গভীর যে তাঁর সমস্ত জীবন-কথাই শোনাতে ইচ্ছা করে, কিন্তু এ রচনায় তা সম্ভব নয়,—যদিও তিনি তাঁর যাবতীয় রচনা যথেচ্ছ ব্যবহারের লিখিত অনুমতি আমাকে দিয়েছেন। নলিনীকান্ত সরকারের লেখা 'দাদাঠাকুর' বইতে শরৎচন্দ্রের চরিত্রের অনেকখানি পরিচয় মিলবে।

এই চরিত্রটি এমন কতগুলো দুর্লভ গুণের যোগে তৈরি যে, কোনো একটি বা দু-চারটি দিক মাত্র আলোচনা করলে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। সেকেলে পল্লী-বাংলার ভালমানুষ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সদাপ্রসন্ন আত্মতৃপ্ত শিশুসুলভ হাসির সঙ্গে বিদ্যাসাগরী দৃঢ়তা, ইউরোপীয় মানবতাবোধ, ভাবাবেগবর্জিত যুক্তিবাদিতা, অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করার মনোবল—এই সব হচ্ছে মূল মানুষটির পরিচয়। উপরন্তু তিনি বিদূষক।

সমস্ত জীবন তিনি "নিষ্ফলের হতাশের দলে" আছেন। তাদের জন্য তিনি নিজের সাধ্যের বাইরেও দান করেছেন, এবং নিজের অপূর্ব কবিত্বশক্তির সাহায্যে তাদের গান গেয়েছেন।

এমন স্মৃতিশক্তিধরও আমি আর দেখিনি।

শরৎচন্দ্র 'রাজনীতি' হাতে-কলমে কিছু করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ করেছেন শুধু কলমে।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত সম্পর্কে হাজার কাহিনী বলবার আছে, কিন্তু আমাকে তাঁর চরিত্রের সামান্য একটু পরিচয় দিয়েই শেষ করতে হচ্ছে তাঁর প্রসঙ্গ।

দুঃখদারিদ্র্যকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে চলার মতো অদম্য সাহস নিয়ে আত্ম-নির্দিষ্ট কঠিন পথে সুদীর্ঘ আশীটি বছর সাফল্যের সঙ্গে চ'লে এসেছেন। ত্রিশ বছর আগে যে শরৎচন্দ্রকে দেখেছি আজও তাঁকেই দেখছি, সেই একই বিদূষক শরৎচন্দ্র, সেই একই শিশু শরৎচন্দ্র, সেই একই খালি গায়ে খালি পায়ে হেঁটে চলা শরৎচন্দ্র। তবে এখন আর তিনি বিরোধী পক্ষের সঙ্গে (সমাজের দুষ্কৃতিকারী সবাই তাঁর বিরোধী)—হারজিতের খেলা খেলতে পারেন না।

ব্যঙ্গ রচনার উদ্দেশ্য সদ্য সদ্য সিদ্ধ হওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত আছে শরৎচন্দ্রের

জীবনে। আমি তাঁর প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে মাত্র একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করব। কারণ এটি আমার মতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের 'দাদাঠাকুর' গ্রন্থে এর বিস্তৃত বিবরণ আছে। শরৎচন্দ্রের মুখেও বহুবার শুনেছি।

একদিন ইংরেজ পুলিস সুপারিনটেনডেণ্ট, পুলিসদের এক সভায় উপস্থিত থাকতে, নির্ভীক শরৎচন্দ্র সেখানে সবাইকে আনন্দ পরিবেশনে নিমন্ত্রিত হয়ে যে গানটি গেয়েছিলেন তার অংশবিশেষ আমি উদ্ধৃত করছি—গানটি চৌকিদারদের দুরবস্থা বিষয়ে—

…বদন ভ'রে এদের যারা বলে শালা
তাদের ভাবে এরা বুঝি উপরআলা,
ধুয়ে দেয় তাদের এঁটো বাটি থালা
মোট বয়ে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে।
মাইনে পায় এরা তিনটি মাস অন্তর
অন্নাভাবে এরা দহে নিরন্তর।…
থানা দরবারে বহে সামিয়ানা
চেয়ার টেবিল বেঞ্চ সবই এদের আনা,
এদেরই দৌলতে রান্না হয় খানা
তার একটি দানা এদের পড়ে না উদরে।

এ গান শুনে ইংরেজ পুলিস সুপারিনটেনডেণ্ট বলেছিলেন, "এ তো সাংঘাতিক অভিযোগ। সবার আগে চৌকিদারদের খেতে দাও।"

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের সম্পূর্ণ জীবনী কোনো উপযুক্ত হাতে এখনও লেখার অপেক্ষায় আছে। লেখা হলে তা একখানি মূল্যবান গ্রন্থ হবে সন্দেহ নেই।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ও স্থিরযৌবন

বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পর্কে স্মৃতিচিত্রণে অনেকখানি বলেছি। বিশেষভাবে তাঁর বিজ্ঞানের পথে আসার প্রাথমিক রোমাঞ্চকর সংবাদগুলি তাতে দেওয়া হয়েছে। আলো-বিকিরণকারী ছত্রাক নিয়ে তিনি প্রথমে আসরে নামেন।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যকে আমরা গোপালদা বলি, বয়সে তিনি বড়। কিন্তু কত বড তা কেউ বলতে পারে না। তিনি নিজে নীরব থাকেন জিজ্ঞাসা করলে এবং মৃদু মৃদু হাসেন। কেউ বলে গোপালদা আচার্য জগদীশচন্দ্রের সমবয়সী, কারো মতে কিছু ছোট।

তাঁর বয়সের কথা তোলার কারণ আছে। সে কাহিনীটি চিত্তাকর্ষক।

গোপালদা দশ বছর আগে (১৯৫১) যুগান্তর পূজা সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ দিয়েছিলেন আমার অনুরোধে। প্রবন্ধটির নাম ছিল "স্থিরযৌবন বা পুনর্যৌবন সম্ভব কি না।"

জানতাম পূর্বগামী বৈজ্ঞানিকদের অনুসরণে এবং নতুন প্রেরণা ও পথে তিনি এ বিষয়ে গবেষণায় মেতে আছেন। এবং শুধু তাই নয়, আমার সন্দেহ হয়েছিল—এবং সে সন্দেহ এখনও আছে—তিনি নিজের উপরেও এই পরীক্ষা চালাচ্ছেন। এ বিশ্বাসের কারণ, তার যে বয়সে জরা বা বার্ধক্যের লক্ষণ দেখা দেওয়া উচিত, সে বয়স বহুদিন পার হয়ে গেছে অথচ তখনও একটি চুলও পাকেনি। এখনও পাকেনি। তবে কৌতূহলী জিজ্ঞাসুর হাত থেকে বাঁচার জন্য তিনি কৃত্রিম উপায়ে কয়েকটি চুল শাদা করে রেখেছেন। তাঁর মুখে চোখে দেহে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার দেখা মেলে তা যে কোনো কুড়ি বছরের যুবককে হার মানায়।

যাই হোক সেই দশ বছর আগে তিনি আভাস দিয়েছিলেন যে তিনি পেনিসিলিনের দ্রবণে ব্যাঙাচি পুষছেন।

এইটিই তাঁর যৌবনকে স্থির রাখবার পথের প্রথম পরীক্ষা। একই সঙ্গে জাত একদল ব্যাঙাচিকে দুভাগ ক'রে এক ভাগকে ঐ দ্রবণে রেখেছেন, আর এক ভাগকে সাধারণ জলে (কনট্রোল হিসাবে) রেখেছেন। রেখেছেন অনেক-দিন। ইতিমধ্যে সাধারণ জলে ছেড়ে দেওয়া ব্যাঙাচিরা সাধারণ ব্যাঙ-ধর্ম অনুযায়ী যথাসময়ে ল্যাজ ও লজ্জার মাথা খেয়ে, পুষ্ট হয়ে, মাটিতে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, পুত্রপৌত্রাদি নিয়ে সংসার করছে, কিন্তু পেনিসিলিনের জলে পোষা ব্যাঙাচিরা ল্যাজও ছাড়ছে না, ব্যাঙধর্মও পালন করছে না, তারা তাদের শৈশব অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে। সাধারণ জলে বর্ধিত ওদেরই জ্ঞাতিগুষ্টিরা, ঐসব শিশুদের জ্যাঠা কাকা কিছুই বলতে পারছে না। বুড়ো-ব্যাঙ শিশু-ব্যাঙকে শুধু সম্পর্কের খাতিরে গুরুজন ব'লে মানবে কি ক'রে ?

এসব শুনে চিন্তিত হয়েছিলাম। এবং এর বেশি তখন আর কিছুই শুনিনি। তিনি যখন এসব বলছিলেন, তখন আমার সঙ্গে বিজ্ঞানলেখক সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী উপস্থিত ছিল। বাইরের অন্য কারো কাছে সম্ভবত তিনি এসব কথা বিস্তারিত বলেন না। তাই গোপালদার সঙ্গে আমাদের যখনই দেখা হয়েছে তখনই তাঁকে বলেছি—"গোপালদা, আপনি নিজে কিভাবে পেনিসিলিনের জলে ডুবে থাকেন আমাদের দেখান।"

গোপালদা মৃদু মৃদু হাসেন। দুর্বোধ্য, রহস্যময় সে হাসি।

আবার অনুরোধ জানাই, "কত জলে কি পরিমাণ পেনিসিলিন মেশাতে হবে এবং কোন্ পেনিসিলিন মেশাতে হবে এবং দৈনিক কতক্ষণ ডুবতে হবে, অথবা মাথা বাইরে রাখলে ফল হবে কিনা, এইটুকু মাত্র বলে দিন। আপনার নির্দেশ অনুযায়ী সুধাংশু ও আমি, মাঝখানে পার্টিশন দেওয়া কাঁচের জলাধারে প্রতিদিন গা ডুবিয়ে রাখব। দুজন দুজনকে দেখব। মনে জোর পাব।" কিন্তু তিনি কিছুই বলেন না।

বোঝা গেল গবেষণা শেষ না হ'লে তিনি কিছুই বলবেন না। কিন্তু কিছুদিন পরে যা বলেছিলেন—অর্থাৎ এই পরীক্ষা তিনি কেন আরম্ভ করলেন, এর প্রেরণা কোথা থেকে পাওয়া, তা এবারে শোনাচ্ছি।

গোপালদাকেই বলেছেলাম তাঁর নতুন গবেষণার প্রেরণা কি, জানাতে। তিনি আমাকে যে চিঠিখানা দিয়েছেন তা এখানে উদ্ধৃত করি।

বসু বিজ্ঞান মন্দিব কলিকাতা-৯

প্রীতিভাজনেষু,

পরিমল বাবু, পিঁপড়ে নিয়ে অনেক দিন ধ'রে কাজ করছিলাম। একদিন বোস রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের অধ্যক্ষ ডক্টর ডি এম বোস আমাকে বললেন, অ্যামেরিকায় একটি নতুন জিনিস দেখা যাচ্ছে। পেনিসিলিন স্ট্রেপটোমাইসিন কারখানার পরিত্যক্ত ফেলে দেওয়া অংশ মুরগী ও শূকররা খেয়ে ওজনে খুব ভারী হয়ে উঠছে। এই পরীক্ষা পিঁপড়েদের উপর চালিয়ে দেখুন না, ও রকম কিছু হয় কি না। তদনুসারে অনেক দিনের চেষ্টায় পিঁপড়েদের

পেনিসিলিন খাইয়ে দেখা গেল তাদের ডিম থেকে যে সব কর্মী পিঁপড়ে জন্মাচ্ছে তারা আকৃতিতে সাধারণ কর্মীদের চেয়ে ছোট হয়ে পড়ছে। শতকরা প্রায় ৬০ ছোট। পিঁপড়ের বেলায় ফল হ'ল ঠিক বিপরীত। ঐ একই সময়ে পরিবেশ অনুযায়ী দৈহিক রঙের বদল হয় কি না দেখবার জন্য বিভিন্ন কাঁচের ট্যাঙ্কে অনেকগুলি ব্যাঙাচি (Rana tigrina) রেখেছিলাম। একটি জলাধারে পেনিসিলিন মিশিযে দেওয়া হয়েছিল। পিঁপড়ের উপর পরীক্ষায় মনোমত ফল না পাওয়াতেই ব্যাঙাচির উপর পরীক্ষার বাসনা হয়। দিন দশেক পরে দেখা গেল যে-ট্যাঙ্কে পেনিসিলিন দেওয়া ছিল তার ভিতরকার ব্যাঙাচিরা একই রকম আছে, হ্রাস-বৃদ্ধি কিছুই ঘটেনি। অথচ অন্যান্য ট্যাঙ্কের ব্যাঙাচিরা অধিকাংশই ব্যাঙাচিত্ব ঘুচিয়ে ব্যাঙ হয়ে গেছে এবং জলে সাঁতাব কেটে বেডাচ্ছে। তাদের অবশ্য বাইরে বেরিয়ে যাবার উপায় ছিল না।

স্বভাবতই কৌতূহল বেড়ে গেল। ব্যাপাবটা কি? অপেক্ষা ক'রে বসে র'লাম। আবও পনেরো দিন কেটে গেল—কিন্তু পেনিসিলিনের ব্যাঙাচির সেই একই অবস্থা, কোনো পবিবর্তন নেই। ব্যাপারটা ভাল ক'রে বোঝবাব জন্য আবাব কয়েক ব্যাচ ব্যাঙাচি নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলাম। এবারেও ঐ একই ফল অবশ্য পেনিসিলিনের ব্যাঙাচিও কয়েকটা ব্যাঙ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সংখ্যায় খুবই কম। কনট্রোলের (পেনিসিলিনহীন ট্যাঙ্কেব) ব্যাঙাচি কিন্তু দশ থেকে কুডি দিনের মধ্যে সবই ব্যাঙ হয়ে গেল। এর মধ্যে উভয় ক্ষেত্রেই কিছু কিছু ব্যাঙাচি মারাও পডেছিল। পেনিসিলিনের পরিমাণ ঠিক করতে অনেক পরীক্ষা কবতে হয়েছিল।

অনেক বিদেশী বিজ্ঞানীই এই পরীক্ষাটি দেখতে এসেছেন। একজন বলেছিলেন ভাইটামিন বি-১২ দিযে দেখুন তো কি ফল হয। তদনুযায়ী, আট মাস ধ'রে ব্যাঙাচি অবস্থাতেই আছে, এই রকম কতগুলি ব্যাঙাচির উপর ভাইটামিন বি-১২ প্রয়োগ করা হ'ল এবং তার ফলে (বারো-তেরো দিন পরে) দেখা গেল দু' তিনটি বাদে সবাই ব্যাঙ হয়ে গেছে।

তার পর পাঁচ মাস থেকে আট মাস ধ'রে ব্যাঙাচি জীবন যাপন করছে এমন কতগুলির উপর থাইরকসিন প্রয়োগ করা হ'ল। দেখা গেল, অধিকাংশ ব্যাঙাচিই চার পাঁচদিনের মধ্যে ব্যাঙ হয়ে লাফাচ্ছে।

এ সব পরীক্ষা চলবার সময় ডক্টর চেন (পেনিসিলিনম্যান) একবার এখানে এসেছিলেন। তিনি সব কিছু দেখে বললেন, এই ব্যাপারটা তাঁর কাছে দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে। কারণ পেনিসিলিন স্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ হয় সূক্ষ্ম বীজাণুর উপর। স্থূল প্রাণীর উপর এর ক্রিয়া কি ভাবে হয় বোঝা যাচ্ছে না। আচ্ছা, আপনারা এর ইনটেসটিন্যাল ফ্লোরা নিয়ে পরীক্ষা করুন, হয় তো কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।

কিছুদিন পরে এঁর নির্দেশ অনুযায়ী পরীক্ষা আরম্ভ হ'ল। সাদা জলের ব্যাঙাচি ও পেনিসিলিনের জলের ব্যাঙাচি উভয়েরই অন্ত্র কেটে বের করা হ'ল। ভিতরকার ফ্লোরা (অর্থাৎ মধ্যকার প্রাপ্ত বস্তু) কালচার ক'রে পাওয়া গেল, সাদা জলের ব্যাঙাচির অন্ত্রে অন্তত দু রকমের কক্কাস জাতীয় জীবাণু আছে। এরা ভাইটামিন বি-১২ উৎপাদন করে। পেনিসিলিনের জলের ব্যাঙাচির অন্ত্রের মধ্যে সে রকমের কোনো জীবাণু পাওয়া গেল না। স্বভাবতই এ থেকে মনে হয়—ভাইটামিন বি-১২ই থাইরক্সিন উৎপাদনের পরোক্ষ কারণ। এই নিয়ে এখনও আবার পরীক্ষা করা হচ্ছে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হবার জন্য।

প্রসঙ্গত বলা দরকার পেনিসিলিনের মতো স্ট্রেপটোমাইসিন দিয়ে পরীক্ষা করেও প্রায় একই রকম ফল পাওয়া গেছে। এর সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার দেখা গেছে এই যে, সম্পূর্ণ অনাহার বা অল্পাহারেও ব্যাঙাচিদের রূপান্তর গ্রহণের (অর্থাৎ ব্যাঙ হওয়ার) কাল যথেষ্ট বিলম্বিত হয়।

আরও কয়েকটি ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে। পেনিসিলিনের মাত্রার তারতম্যে নানা রকম দৈহিক বিকৃতি ঘটে। মাঝে মাঝে থাইরক্সিন প্রয়োগে তিনখানা মাত্র পা বেরিয়েছে, চতুর্থ পা আদৌ বেরোয়নি।

এই প্রসঙ্গে ২৮শে অক্টোবর (১৯৫৭) তারিখে হেগ থেকে রয়টার প্রচারিত যে খবরটি নিয়ে আপনি ২২শে ডিসেম্বর (১৯৫৭) তারিখের ইতস্ততঃতে সচিত্র মন্তব্য করেছিলেন, সেই খবরটিও এখানে উদ্ধৃত করি—

FROGS WITH 20 LEGS FOUND

The Hague, Oct. 18—Scientists do not know whether radioactive waste was responsible for monstrous deformities

in frogs found in an Amsterdam ditch, the Dutch Minister of Health said here today.

The Minister confirmed in Parliament today that deformed frogs—with upto 20 legs—had been found in the ditch, which was used as a dumping ground for nuclear waste by the Amsterdam nuclear institute.

But in a carefully worded reply to a question, he said that "one could not decide with certainty in the present state of scientific knowledge whether a direct relationship" existed between these two facts—Reuter

এখানে দেখা যাচ্ছে, তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রতিক্রিয়াতে নবজাতদের দৈহিক বিকৃতি ঘটছে। অবশ্য বিপরীতভাবে। কারণ দুটি ঘটনা সম্পূর্ণ পৃথক। একটিতে অঙ্গের পূর্ণ বিকাশে বাধা পড়ল, অন্যটিতে পূর্ণ বিকশিত অঙ্গের উপর অতিরিক্ত অঙ্গ বৃদ্ধি ঘটল। তবে রেডিওঅ্যাকটিভ খাদ্য আর এই বিকারের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি না তা বহু পরীক্ষায় নির্ধারিত না হ'লে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত ভাবে কিছু বলতে পারেন না, যদিও ব্যাপারটিতে সন্দেহের কোনো কারণ নেই।

থাইরক্সিনের ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, এ জিনিসটির ক্ষরণ বা secretion না হ'লে, অথবা অভাব ঘটলে মোটেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুস্থ বৃদ্ধি ঘটে না, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পৃথক হয় না, differentiation ঘটে না। এটা বহু পূর্ব থেকেই জানা আছে। থাইরক্সিন একটি হরমোন। এবং বি-১২ হচ্ছে ভাইটামিন। এ দুটি রাসায়নিক ভাবে পৃথক, অথচ ব্যাঙাচির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রূপায়ণে এদের একই ক্রিয়া, শুধু সময়ের কিছু ব্যবধান মাত্র। এর অর্থ কি? ইনটেসটিন্যাল ফ্লোরার আরও পরীক্ষা থেকে এ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতে পারে।

এখানে আর একটা কথা বলা দরকার। থাইরক্সিনের সাহায্যে অকালে, অর্থাৎ স্বাভাবিক differentiation বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পৃথক চেহারা পাওয়ার আগে, থাইরক্সিন প্রয়োগে রূপান্তর ঘটানো যায়, কিন্তু ব্যাঙাচির চার পা বেরোলেও তারা দু' তিন দিনের বেশি বাঁচে না। কিন্তু ব্যাঙাচিদের অপরিণত অবস্থায়—অর্থাৎ ডিম থেকে বের হবার পাঁচ-সাত দিন পরে

অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করলে এবং পাঁচ-ছয় মাস পরে থাইরক্সিন প্রয়োগ করলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় তাদের চার পা বেরিয়েছে সত্য, কিন্তু ল্যাজ লোপ পায়নি, বরং চার পা ও ল্যাজ নিয়েই তারা জলের নিচে জল-টিকটিকির মতো ঘুরে বেড়ায়। আবার তাদের আর সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তন ঘটলেও অন্ত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। ব্যাঙাচি অবস্থায় অন্ত্র যেমন ছিল তেমনি থেকে যায়। এমন অবস্থায় কেজীন ও ভাইটামিন বি-১২ খাইয়ে প্রায় এক মাস পর্যন্ত ল্যাজওয়ালা ব্যাঙ (অর্থাৎ ল্যাজ অথচ পুরো ব্যাঙ) হিসাবেই জীবিত রাখা সম্ভব হয়েছে।

এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন আছে। সেটি এই যে, অভিব্যক্তির ফলে যে সব পরিবর্তন স্থায়ী ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, এক প্রাণী ধীরে ধীরে অন্য প্রাণীর আকৃতি নেয়, এ ক্ষেত্রেও সেই রকম কিছু হয় কি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রায় অনুরূপ একটি জীবের কথা বলা যায়।

মেক্সিকোতে আক্সোলট্ল (Axolotl) নামে এক রকম জলচর প্রাণী দেখা যায় (একটি হ্রদের জলে)। বহুদিন যাবৎ জীব-বিজ্ঞানীদের মধ্যে ধারণা ছিল এটি একটি বিশেষ ধরনের প্রাণী। কিন্তু একবার সামান্য পরিমাণ থাইরক্সিন প্রয়োগে দিন কয়েকের মধ্যেই দেখা গেল সেটি স্থলচর স্যালামাণ্ডারে (land salamanderএ) পরিবর্তিত হয়েছে। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এরা 'লারভা' বা শূক অবস্থাতেই বংশ বৃদ্ধি করে আসছে। ইতি—

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।

এই চিঠিখানা থেকে জৈব বিজ্ঞানের কণিকামাত্র স্বাদ পাওয়া যাবে। প্রকৃতিতে কখন কি অবস্থায় কিসের ছোঁয়া লেগে এক একটা প্রাণী অন্য প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে, এবং কেন অনেকে যেমন ছিল তেমনি আছে অথবা কি ভাবে জড় পদার্থ জৈব পদার্থে রূপান্তরিত হ'ল এ সব প্রশ্নের জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা, এই জগতে যাঁরা প্রবেশ করেছেন তাঁরা এই নিয়ে মেতে আছেন, এবং আমরা এ জগতের বাইরে থেকেও যে খুব দুঃখে আছি মনে হয় না। বাইরের জগতেও বহু প্রশ্নোত্তর আছে। অবশ্য প্রশ্ন বেশি, এবং উত্তর কম, ঠিক ঐ সব বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত জগতের মতোই। তাঁদের

প্রশ্নের নমুনা কিছু দেওয়া গেল এই উপলক্ষে। আমাদের বাইরের জগতে বহু প্রশ্নের সঙ্গে আমরা প্রতিদিন পরিচিত। আপাতত আমাদের প্রধান প্রশ্ন—দৈনন্দিন জিনিসের দাম কমবে কবে, এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রেরা আমাদের সীমানা বেদখল করছে কেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

১৯৪৭এর মাঝামাঝি সময়ে গোপালদার কাছ থেকে জানা গেল, তাঁরা বাংলায় বিজ্ঞান প্রচারের জন্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রেরণায় একটি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলার আয়োজন করছেন, এবং আমাকেও তার মধ্যে থাকতে হবে। এই আয়োজনের সব চেয়ে উৎসাহী কর্মী ডক্টর সুবোধনাথ বাগচী। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুকে পুরোধা ক'রেই এই প্রতিষ্ঠান গড়া হবে। এঁদের দলে সবাই বিজ্ঞানী, এবং উচ্চস্তরের বিজ্ঞানী। আমার পূর্ব পরিচিত ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ীও একজন উৎসাহী কর্মী। সবাই বিজ্ঞানের সেবক, তার মধ্যে আমি অনধিকার প্রবেশ করব এ কথা ভেবে সঙ্কুচিত হয়েছিলাম। কিন্তু গোপালদা ভরসা দিলেন। শেষে ভেবে দেখলাম বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিজ্ঞানের না হলেও বাংলা ভাষার পক্ষ নিয়ে হয়তো কিছু কাজ করতে পারব, অতএব গোপালদার কথায় সহজেই প্রলুব্ধ হলাম। তাঁর হাতে বিজ্ঞান-সমর্থিত কোনো বশীকরণ কবচ বাঁধা ছিল কি না জানি না।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপনের সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয় ১৮ই অক্টোবর ১৯৪৭ তারিখে। সভা হয় সার্কুলার রোডের বিজ্ঞান কলেজে। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু সভাপতিত্ব করেন। সভাতে "বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ" এই নামটি গ্রহণ করা হয়, এবং ঘোষণা করা হয় ১৯৪৮ সালের ২৫শে জানুয়ারি তারিখে এই প্রতিষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিক ভাবে স্থাপিত হবে। যে যে উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপিত হবে তা লিপিবদ্ধ করা হয় এবং পরবর্তী আবেদনপত্রে তা ছাপা হয়ে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়।

এই উপলক্ষে যে সার্কুলারটি ছাপা হয়েছিল সেটি এই—

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

৯২ আপার সার্কুলার রোড. কলিকাতা-৯

বর্তমান জগতে জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই আমাদের বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হচ্ছে, অথচ বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদীক্ষা এমন ভাবে চালিত হচ্ছে না যাতে আমরা আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্ভার জীবনের দৈনন্দিন কাজে সুচিন্তিত ভাবে ব্যবহার করতে পারি। এর প্রধান অন্তরায় ছিল বিদেশী ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা। আজ ভারতে নব পটভূমিকার সৃষ্টি হয়েছে—চারিদিকে নতুন আশা ও আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। এই নতুন পরিবেশে জীবনকে সমগ্রভাবে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে এই প্রধান বাধা দূর ক'রে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের বহুল প্রচার ও প্রসার দ্বারা তাঁদের সহজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য বিজ্ঞানীদেরই।

গত ১৮ই অক্টোবর (১৯৪৭) অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অনুপ্রেরণায়, এই প্রচেষ্টার প্রথম সোপান হিসাবে 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' স্থাপনা করবার সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পরিষদের উদ্দেশ্য প্রথমতঃ জনগণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।

দ্বিতীয়তঃ স্কুল ও কলেজের পাঠ্যবস্তু সহজ ও সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক যথাযথতা অক্ষুণ্ণ রেখে বিভিন্ন পরিবেশে সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক ক'রে প্রকাশ করা।

তৃতীয়তঃ স্কুল ও কলেজের উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পাঠ্যপুস্তক, বিশেষ বিশেষ বিষয়বস্তু সংক্রান্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ করা।

চতুর্থতঃ লোকসাহিত্য ও শিশুসাহিত্য সবপ্রকারে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পদে সমৃদ্ধিশালী ক'রে তোলা।

পঞ্চমতঃ বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য ও তার পথের বাধাবিপত্তি দূর করবার জন্য বাৎসরিক সম্মিলন আহ্বান করা এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষামূলক অথচ জীবনের নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তুর প্রদর্শনী ও তৎসংক্রান্ত বক্তৃতার ব্যবস্থা করা।

আমাদের স্বল্প ক্ষমতার কথা জেনেও আমরা আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এগিয়ে এসেছি এই গুরু দায়িত্ব বহন করবার জন্য। সুধীবৃন্দের সহানুভূতি, সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতা পেলেই এই জাতীয় কর্তব্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব হবে। আমাদের একান্ত বিশ্বাস এ বিষয়ে আমরা সবারই অকৃপণ সাহায্য

পাব। বিশেষতঃ আমরা আশা করি কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য, কারণ আমরা সবাই এই মহান্ প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের ছাত্র বা শিক্ষক। আমরা আশা করি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহযোগিতা। আমরা আশা করি বিশ্বভারতীর সহানুভূতি, কারণ আমাদের প্রধান অগ্রণীর (সত্যেন্দ্রনাথ বসুর) হাতেই রবীন্দ্রনাথ তুলে দিয়েছিলেন তাঁর প্রথম বিজ্ঞানের বই 'বিশ্বপরিচয়।'

আমাদের সঙ্কল্পকে রূপদান করবার জন্য স্থির হয়েছে আগামী ২৫শে জানুয়ারি, ১৯৪৮ এই প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিক ক্রমে স্থাপনা হবে। সুধীবৃন্দের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ, এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাঁদা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের মূল সভ্য হয়ে তাঁরা যেন এই অধিবেশনে যোগ দেন এবং সর্বপ্রকার সহযোগিতায় আমাদের উদ্দেশ্য সফল করে তোলেন।

নাম ও ঠিকানা সহ চাঁদা (বাৎসরিক ১০ টাকা) পাঠাবার স্থান: ডঃ সুবোধনাথ বাগচী, কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ৯২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু	দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
সুবোধনাথ বাগচী	গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
জগন্নাথ গুপ্ত	পরিমল গোস্বামী
জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী	অমিয়কুমার ঘোষ
সর্বাণীসহায় গুহ সরকার	সুধাময় মুখোপাধ্যায়
সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	দ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
সুনীলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী	বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যতদূর মনে মনে পড়ে, এই প্রচারপত্রটি ডঃ সুবোধনাথ বাগচী রচনা করেছিলেন। ১৮ই অক্টোবর (১৯৪৭) যে প্রাথমিক সভা হয় তাতে নিম্ন-লিখিতরূপ কমিটি গঠিত হয়—

সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কর্মসচিব ডক্টর সুবোধনাথ বাগচী, যুগ্ম-সচিব শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত।

সদস্যবর্গ: ডক্টর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ-সরকার, ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীপরিমল গোস্বামী ও শ্রীসুধাময় মুখোপাধ্যায়।

পরিষদ আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার আগে আমাদের সাপ্তাহিক অধিবেশন বসত। প্রতি শুক্রবার। তারপর ২৫শে জানুয়ারির (১৯৪৮) পর ৩০শে জানুয়ারি (১৯৪৮) শুক্রবার বিজ্ঞান কলেজে যথারীতি আমাদের অধিবেশন বসেছে, এমন সময় তখন সন্ধ্যা প্রায় ৫৷৷টা, কে একজন খুব উত্তেজিত ভাবে এসে খবর দিলেন গান্ধীজি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। এ খবরে হঠাৎ যেন সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অবিশ্বাস্য কথা। গুজব নয় তো? সভা আর চলল না। সবাই বেরিয়ে এলাম। নীরবে। আমি কৈলাস বসু স্ট্রীটে প্রবেশ করতেই শুনতে পেলাম সবার মুখে ঐ একই কথা। মনে কেবলই এক প্রশ্ন, এর পর কি?

মনে হ'ল গোটা ভারতবর্ষকেই কে যেন গুলিবিদ্ধ ক'রে মেরে ফেলেছে। এমন শত্রু কে ছিল গান্ধীজির? একেবারে মেরে ফেলতে হল?

তারপর রেডিওতে শুনলাম সব। সন্ধ্যা পাঁচটায় গান্ধীজি আততায়ীর হাতে প্রাণ হারিয়েছেন।...

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ইতিমধ্যে আরও অনেক প্রখ্যাত বিজ্ঞানসেবীর সহযোগিতা লাভ করেছে এবং একটি বিশিষ্ট সত্তারূপে সমগ্র রাজ্যে পরিচিত হয়েছে। এরপর ২১শে ফেব্রুয়ারি (১৯৪৮) তারিখে বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়নের প্রশস্ত বক্তৃতাগৃহে যে বৃহৎ অধিবেশন বসে তার খবর ২৫শে ফেব্রুয়ারির যুগান্তরে এই ভাবে বেরিয়েছিল—

গত ২১শে ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪৷৷টায় সায়েন্স কলেজের ফলিত রসায়নের বক্তৃতাগৃহে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয়। বাঙলার প্রায় দুই শত বিজ্ঞান অনুরাগী ও সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে সভাপতির নির্দেশে সমবেত সভ্যগণ এক মিনিট নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া মহাত্মা গান্ধীর পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অতঃপর পরিচালক-মণ্ডলীর পক্ষ হইতে কর্ম-সচিব সমাগত সভ্যদিগকে অভ্যর্থনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং কোষাধ্যক্ষমণ্ডলী আয়ব্যয়ের হিসাব দাখিল করেন। বর্ষাকালের জন্য গৃহীত পরিষদের নিয়মাবলীর খসড়াটি বিবেচনা ও সংশোধনের জন্য অধ্যক্ষ পঞ্চানন নিয়োগীর সভাপতিত্বে একটি কমিটী গঠিত

হয়। তাহার পর বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার শতাধিক ব্যক্তি লইয়া একটি মন্ত্রণাপরিষদ ও কার্যকর সমিতি গঠিত হয়। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এবং ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসকে পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্বাচন করা হয়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্যকর সমিতির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন :—

সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, সহকারী সভাপতি—শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসত্যচরণ লাহা ও শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র। কর্ম-সচিব—শ্রীসুবোধনাথ বাগচী, সহকারী কর্ম-সচিব—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত।

সদস্য : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীপরিমল গোস্বামী, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, শ্রীসুকুমার বসু, শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ, শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীজীবনময় রায়, শ্রীসত্যব্রত সেন, শ্রীসুনীলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

অমৃতবাজার পত্রিকা (২৪-২-৪৮) এই প্রসঙ্গে অতিরিক্ত খবর আরও দিয়েছেন—উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—অধ্যক্ষ পঞ্চানন নিয়োগী, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ডক্টর বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক বীরেশচন্দ্র গুহ, অধ্যক্ষ জিতেন্দ্রমোহন সেন, ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী, ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, শ্রীঅমূল্য গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য, ডক্টর কুমুদবিহারী সেন, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মৈত্র, অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র সেনগুপ্ত, জনাব আমীর হোসেন চৌধুরী ও অন্যান্য।

আজ ১২ই ডিসেম্বর ১৯৬১ তারিখে পুরনো দিনের এই সব খবর লিখছি, আজই কাগজে দেখলাম রাইটার্স বিলডিংে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (বর্তমানে জাতীয় অধ্যাপক) বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রস্তাবিত ভবন নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি সাক্ষাৎ করেছেন।

চোদ্দ বছর পরে

প্রায় চোদ্দ বছর পরে বিজ্ঞান পরিষদ নিজস্ব স্থায়ী একটি ভবন নির্মাণের কল্পনা রূপায়িত করতে চলেছে, এটি অবশ্য সুসংবাদ। অনেক আগেই হ'তে পারত, কিন্তু এদেশে বিজ্ঞানের ন্যূনতম জ্ঞানের প্রসার ব্যবস্থা কিছুই ছিল না, কারো মনে কৌতূহলও নেই, এর জন্য কোনো দাবীও নেই। সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ে কৌতূহল জাগাবার ব্যবস্থা এদেশে হ'তে অনেক দেরি আছে। কোনও কৌতূহলী ছাত্র ঘরে ব'সে পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন বিষয়ে কিছু কিছু প্রাথমিক পরীক্ষা করতে চাইলে তার সে ইচ্ছা আর পূরণ হবে না। সে এখন সম্পূর্ণ নিরুপায়। আগে বাজারে ছোট ছোট ল্যাবরেটরি কিনতে পাওয়া যেত। পাঁচ টাকা, দশ টাকা, পঁচিশ টাকা বা আরও বেশি দামে তৈরি প্রাথমিক পরীক্ষার ল্যাবরেটরি। যদিও কজন এদেশী ছাত্র তা কিনেছে তা আমার অজ্ঞাত।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম প্রচারপত্রে যে সব উদ্দেশ্যেব কথা বলা হয়েছিল, তার কোনোটাই আজও সম্পূর্ণ সার্থক হতে পারেনি, এমন কি আংশিক সার্থকতাও লাভ করেনি। এ দেশে বিজ্ঞান প্রচার, বিশেষ ক'রে সাধারণের মধ্যে, অথবা তাদের মধ্যে বিজ্ঞানেব মনোভাব গড়ে তোলা, এ সব মনে হয় প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গে পরিষদের পক্ষ থেকে আরও একটি সংখ্যা যোগ করা উচিত ছিল। সে হচ্ছে এদেশের শিক্ষাবিভাগে যে সব জ্ঞানবিজ্ঞানেব বই প্রচলিত আছে এবং ছাত্রবা যে সব বই পড়তে বাধ্য হয়, সেই বই সম্বন্ধে খবরদারি করা, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন শিক্ষা বিভাগের পথে পথে চৌকিদারি করা।

এ কথা বলছি এই কারণে যে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (১৯৪৮) প্রতিষ্ঠিত হবার ঠিক ৯ বছব পরে, ১৯৫৮ সালে, দায় পড়ে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে কিছুদিন এ কাজ করতে হয়েছিল। আমি সামান্য চেষ্টাতে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যে অতি মারাত্মক একটি চেহারা দেখেছিলাম তা আজও ভাবলে আতঙ্কিত হয়ে উঠি।

আমি কয়েকখানি অনুমোদিত এবং বহু সংস্করণের সৌভাগ্যপ্রাপ্ত দু এক-খানা বই থেকে তার কিছু নমুনা উদ্ধৃত করছি। একখানা বইয়ের পরিচয়

স্বরূপ লেখক নিজে লিখে দিয়েছেন, "পশ্চিম বাংলার যে কোনও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় একমাত্র নির্ভরশীল পুস্তক।" বইখানা তখন ২৭৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ছিল এবং তার নবম সংস্করণ চলছিল।

১। স্বাভাবিক অবস্থায় একজন সুস্থ মানুষ মিনিটে ১ থেকে ১৮ বার নিশ্বাস নেয়।

২। নিশ্বাসের সঙ্গে যে অক্সিজেন গ্রহণ করি তা ফুসফুসের সাহায্যে রক্তের সঙ্গে মিশে যায় এবং শরীর থেকে রক্তধারা বাহিত ক্ষতিকর যবক্ষারযান ফুসফুসের সাহায্যেই বের করে দেয়।

৩। একটি দেহপোষক কার্বন-হাইড্রেট।

৪। আবহাওয়া মন্দির থেকে যন্ত্রের সাহায্যে ভূমিকম্প সম্বন্ধে পূর্বাভাষ দেশময় প্রচারিত হয়। 'পূর্বাভাষ' কথাটিব পাশে ইংরেজীতে (forecast) কথাটিও দেওয়া আছে।

আর একখানি বহু বিজ্ঞাপিত এবং চতুর্দশ সংস্করণের গৌরবপ্রাপ্ত (১৯৫৮) বই থেকে কিছু নমুনা উদ্ধৃত করি।

১। চিল শকুন প্রভৃতি পাখীরা পাখনা না নেড়ে কি করে আকাশে উড়ে বেড়ায়? ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ঐ সমস্ত পাখীরা সাধারণতঃ যে উচ্চস্তরে উড়ে বেড়ায়, সেখানে বায়ুর চাপ খুব বেশী, দ্বিতীয়ত ওদের ডানাও খুব মজবুত। ওরা তাই সেখানে পৌছয় শুধু হাওয়ায় ভর করে, পাখা দুটো মেলেই হাওয়ার ঢেউয়ে ভেসে বেড়ায়।

এই সময়েই প্রচলিত অন্য একখানি বইতে আরও একটি নতুন জ্ঞান পরিবেশন করা হয়েছে—আকাশে উঠে পাখীদের সর্বদা ডানা নাড়তে হয়, নইলে নিচে পড়ে যায়।

পূর্ব বইখানায় সমুদ্রের নিচের হাজার হাজার মাইলের নিচে অবস্থিত জীবদেব খবব দেওয়া হয়েছে। এ রকম অদ্ভুত বিজ্ঞানের খবরে ভরা এ সব বই সমস্ত বাংলা দেশকে শেখাবার ভার নিয়েছে, এবং এই বই হারভার্ড ও বার্লিনের বিজ্ঞানের উপাধিধারী অধ্যাপক প'ড়ে, ভূমিকায় বলছেন এমন উৎকৃষ্ট বই আর হয় না, তিনি নিজে এ বই পড়ে এ কথা বলছেন। এমনি অবস্থায় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য সফল হ'তে অনেক দেরি হবে। আমি একা চৌকিদারির যেটুকু চেষ্টা করেছি তা অতি সামান্য।

বিজ্ঞান পরিষদেরই এই ভার নেওয়া দরকার। পরিষদ এ জন্য প্রথমত আক্রমণমূলক অভিযান চালান। এবং যে পাঠ্যপুস্তকে প্রাণীবিশেষের পরিচয়ে "ইহাদের মাথা সম্মুখ দিকেই অবস্থিত" লেখা থাকে সে জাতীয় বই নিয়ে দেশে তুমুল আন্দোলন গ'ড়ে তুলুন। এমন কি পরিষদে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ কর্মীদের মুখে, "বিজ্ঞান শিক্ষায় ভাঁড়ামি চলবে না চলবে না" ধ্বনি দিয়ে তাদের পথে বা'র করারও আমি পক্ষপাতী। এবং "সাধরণ জ্ঞান" নামক শিক্ষার বীভৎস বিকার অবিলম্বে শিক্ষাবিভাগ থেকে বাতিল করাব দাবী তোলা হোক, এই আমার ইচ্ছা।

এতক্ষণ অনধিকারীর হাতে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রশ্রয় এবং প্রশ্রয়দাতাদেব কথা বলা হল। কিন্তু বাংলাভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের সদিচ্ছার বাবো বছর পরেও অনেক বিজ্ঞানশিক্ষকদের মধ্যেও বিজ্ঞানের মনোভাব গ'ড়ে ওঠেনি এও প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে বলছি। কিছুদিন আগে রেডিওতে "বিজ্ঞানেব জয়যাত্রা" পর্যায়ের কতগুলি বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছিল, তার অনেকগুলি আমি শুনেছি। বক্তাদের মধ্যে "ডক্টরেট" ছিলেন অনেকে। তাঁদের কারো কারো মুখে একই নিঃশ্বাসে পারমাণবিক এবং আণবিক—এই দুটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হ'তে শুনেছি।

বিজ্ঞানের বিচারে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, বহুদিন ধ'রে অ্যাটম ও মোলিকিউল—এই দুটি নাম মৌলিক পদার্থের আদিতম গঠন উপাদানের সম্পর্কে প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের পরিচয়রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই দুটি মূল বস্তুসত্তার বাংলা নাম পরমাণু ও অণু। এ নাম বদলের প্রশ্ন ওঠেনি। পরমাণু যে-কোনো বস্তুর সূক্ষ্মতম উপাদান, এবং যে উপাদানের ঊর্ধ্বে আব কোনো বস্তুসত্তার অস্তিত্ব নেই। পবমাণুর অবশ্য নিজের একটি গঠন-বৈশিষ্ট্য আছে। অর্থাৎ তার একটি কেন্দ্র আছে এবং তার চতুর্দিকে ঘূর্ণমান এক বা একাধিক কণিকা আছে যার নাম ইলেকট্রন। এই পরমাণু, অ্যাটমের প্রতিশব্দরূপে বাংলা ভাষায় বহুদিন স্বীকৃত। এবং মোলিকিউলেব বাংলা অণু। সুতবাং ইংরেজীতে যেমন অ্যাটম বম এবং মোলিকিউল বম নামক দুটি শব্দ নেই, কেন না অ্যাটম বম্ কখনও মোলিকিউল বম হ'তে পারে না, তেমনি বাংলাতেও পরমাণু বোমা কখনও অণু বোমা বা আণবিক বোমা হতে পারে না। বিজ্ঞানে যার সামান্য জ্ঞান আছে সেও ঐ দুটি কথা যে এক অর্থে

ব্যবহৃত হয় না, তা জানে। কিন্তু দেশে অনেক বিজ্ঞানশিক্ষিত ডক্টরেটরও বৈজ্ঞানিক মনোভাব নেই, সেজন্য তাঁরা ও দুটি একই অর্থে একই নিশ্বাসে ব্যবহার করতে বিবেকের কোনো বাধা অনুভব করেন না।

এইখানেই বিজ্ঞান পরিষদের ব্যর্থতা। অবশ্য আপাত ব্যর্থতা। এ দেশকে বিজ্ঞান শেখানো খুবই কঠিন হয়ে উঠছে। কঠিন আরও এ জন্য যে, এই সব ভুল প্রচারের পিছনে রয়েছে শিক্ষা বিভাগ অথবা সরকারী অন্য প্রতিষ্ঠান। যেমন ১১ই অক্টোবর, ১৯৫৯, বেতারে একটি প্রচারমূলক নাটিকার একটি বালিকা-চরিত্র জগদীশচন্দ্র বসুর নাম শুনেছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় উত্তরে বলল—শুনেছে। তিনি গাছের প্রাণ আছে আবিষ্কার করেছিলেন। এ উত্তর শুনে প্রশ্নকর্তা খুশি হয়ে তাকে একটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে নিলেন।

এই ভুল তথ্য প্রচার নিয়ে একটুখানি খোঁচা দিতে গিয়ে দেশের ছোট বড, ছাত্র-অছাত্র, বিজ্ঞানের ছাত্র, অনেকে আমাকে আক্রমণ করলেন। অর্থাৎ জগদীশচন্দ্র যদি গাছের প্রাণ আবিষ্কার না ক'রে থাকেন তবে কে করেছেন?

মিথ্যা তথ্য দেশের মধ্যে কি ভাবে প্রচারিত হয়েছে, এ থেকে তা বোঝা যাবে। আক্রমণকারীদের ভুল বিশ্বাস ছাড়ানো ভয়ানক শক্ত। আমি খুব ঘোরা পথ অবলম্বন করেছিলাম কৌতুক সৃষ্টির জন্য। তাতে জটিলতা আরও বেড়েছিল। শেষে ডক্টর তারকমোহন দাস একটি প্রবন্ধ পাঠালেন আমাকে, তাতে অত্যন্ত সরল ভাষায় গোডাতেই বললেন, জগদীশচন্দ্র বসু গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেননি। সে চেষ্টাও তিনি করেননি, ইত্যাদি।

এই প্রবন্ধ পডার পর পাঠকেরা কিছু শান্ত হলেন। এ সব মজার কাহিনী ইতস্ততঃতে বেরিয়েছিল ১৯৫৯-এর ২৫শে অক্টোবর থেকে।

তাই আমার মনে হয়, বিজ্ঞান পরিষদ বাংলা ভাষায় (প্রকাশিত গ্রন্থ এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার সাহায্যে) যেটুকু বিজ্ঞান প্রচার করছেন তার সঙ্গে তাঁদের আরও একটা বিভাগ খোলা উচিত। সে বিভাগটি, করপোরেশনের বাসের-অযোগ্য বিপজ্জনক বাড়ি ভেঙে ফেলার জন্য যে একটি সক্রিয় বিভাগ আছে, তার মতো হবে। দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট এই সব মিথ্যা জ্ঞানের বিপজ্জনক যন্ত্রগুলি তাঁরা ভাঙবার ব্যবস্থা করুন।

এবং আমি আবার বলছি, "সাধারণ জ্ঞান" জাতীয় অপাঠ্য অস্পৃশ্য অপ্রয়োজনীয় এবং সর্বক্ষেত্রে ক্ষতিকর সব বই শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অবিলম্বে বিদায় করা দরকার, নইলে বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য আরও বহুকাল অসিদ্ধ থেকে যাবে।

আবার ভাগলপুরে—বিজয়রত্ন বসুর সঙ্গে

১৯৪৮, ২৮শে এপ্রিল। কিছুদিন সর্দিজ্বরে ভুগছিলাম। সামান্য জ্বর গায়ে লেগেই থাকত, এবং তাকে অগ্রাহ্য করেই চলছিলাম। এমন সময় উপরে উল্লেখিত ২৮শে এপ্রিল তারিখে সকাল নটার সময় ভাগলপুরের বিজয়রত্ন বসু (রায় সাহেব) এসে হাজির। তিনি ছিলেন ভাগলপুর জলকলের সুপারিনটেনডেণ্ট। অদ্ভুত চরিত্র, অদ্ভুত সদাশয়তা। এঁর চরিত্রের কমিক দিকটি আমি স্মৃতিচিত্রণে বিস্তারিত বলেছি। ইনি অন্যের হিতার্থে কিছু করবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠতেন, এবং কাজ হোক না হোক, ব্যস্ততাটাই সবচেয়ে বড হয়ে উঠত, এবং তাব সঙ্গে তাঁর আন্তরিকতা।

তিনি কলকাতা এলে আমার সঙ্গে দেখা করতেন। সেদিন আমার ঐ রকম অসুস্থ অবস্থা দেখেই বললেন, ভাগলপুর চলুন, আমি আজই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি। রাত্রে যাব।

আমি বাধা দিতে যাচ্ছিলাম এবং তাঁকে বলছিলাম নানাবিধ কারণে এখন আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি তখন ম্যাট্রিকুলেশনের পরীক্ষক, কয়েক দিন পরেই খাতা নিয়ে ব'সে যেতে হবে এবং সেইটিই সবচেয়ে বড় বাধা।

কিন্তু বিজয়দার চরিত্রের কথা আগেই বলেছি, তিনি ব্যস্ত হ'তে পারলে আর কিছুই চান না এবং ব্যস্ত হওয়ার কোনো সুযোগই ছাড়েন না। তাই আমি আমার না যাওয়ার সমর্থনে যতগুলো কথা বলছিলাম, সে সব কথাকে ঢেকে তার উপরে নিজের কথাগুলি, তিনি তাঁর কণ্ঠ আমার কণ্ঠের চতুর্গুণ চড়িয়ে সুপারইমপোজ ক'রে যাচ্ছিলেন। কাজেই আমার কথা তাঁর কানে একটিও প্রবেশ করেনি, এবং কোনোমতেই করবার উপায় ছিল না। অবশেষে আমি ক্লান্ত হয়ে তাঁর কথায় রাজি হলাম। তাঁর গলার জোর ছিল অনেক বেশি এবং তাতে সেদিন পাড়ার লোক আকৃষ্ট হয়েছিল।

তাঁর কথা শেষ হ'লে অবশেষে আমি সামান্য একটা শর্ত আরোপ করলাম। বললাম, আপনার কথায় রাজি হয়েছি শুধু একটা কথা ভেবে, আমার ভাগলপুরে উপস্থিতির কথা বলাই (বনফুল) যেন কোনোমতেই টের না পায়। টের পেলে আপনার ওখানে আমার থাকা হবে না। এবং ভাগলপুর গেলে সেখানে এখানকার মতো অবসরহীন মুহূর্তগুলির ঠিক বিপরীত অবস্থা পেতে চাই। মানে, কয়েকদিন সম্পূর্ণ চুপচাপ প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোতে চাই। আপনার বাড়িটি শহর থেকে দূরে এবং গঙ্গার পাড়ের উপর, অতএব যদি কেউ টের না পায় তা হ'লে আমি যা চাই তা পেতে আমার আর কোনোই বাধা নেই। আপনি সারাদিন কলের কাছে থাকেন, আমি সারাদিন জলের কাছে থাকব। ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে চলমান নদী আর নৌকো স্টীমার দেখব, অথবা ঘুমোব।

বিজয়দা আমার কথা শেষ হবার বহু আগেই সমস্ত শর্তে খুব জোরের সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। বললেন নটার সময় তৈরি থাকবেন, আপনাকে তুলে নিয়ে যাব শিয়ালদহ স্টেশনে।

এ পর্যন্ত তিনি তাঁর কথা রেখেছিলেন। তার পর যা যা হ'ল, সে এক পৃথক কাহিনী।

গঙ্গায় এক পয়সা : গঙ্গার পাড়ে তৃণশয্যা

বিজয়দা এক রকম জোর করেই আমাকে রাত দশটার গাড়িতে শিয়ালদহের পথে ভাগলপুরে নিয়ে চললেন। গায়ে সামান্য উত্তাপ লেগেই ছিল। আগে এ রকম হয়েছে অনেক বার। প্রথমে সর্দি দিয়ে আরম্ভ, তারপর কয়েকদিন শুইয়ে রাখা। অথচ শুয়ে থাকা আমার আদৌ ভাল লাগে না। অফিসে যাওয়াটা এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, সূর্য পশ্চিম দিকে হেলতে আরম্ভ করলেই মন ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। সেজন্য অনেক সময়েই চিকিৎসকের উপদেশ অগ্রাহ্য ক'রে তপ্ত দেহকেই অফিসে নিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছি। এ তাপ ঘরে শুয়ে শুয়ে অনুতাপের চেয়ে ভাল। অথচ আশ্চর্য এই, রবিবারে ঘরে থাকতে কোনো অসুবিধা বোধ করি না। সেই নির্বাসিত লোকটার ঠিক বিপরীত। ছোট্ট দ্বীপে কৌটায় রক্ষিত খাদ্য সহ লোকটা

বহুদিন একা কাটাচ্ছে। চেহারা দেখে, অন্ততঃ মুখের দাড়ি দেখে, মনে হয় মাস দুই তো হবেই। এমন সময় একটি লোক জাহাজডুবি হয়ে ভাসতে ভাসতে সেখানে এসে হাঁটু জলে দাঁড়িয়েই নির্বাসিত লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, "দাদা, দ্বীপটি বাস করবার পক্ষে কেমন?" দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে নির্বাসিত লোকটি বলল, "মন্দ নয়, কিন্তু ভাই, রবিবারে বড্ড একা বোধ হয়।"

আমার এব ঠিক উল্টো। আমার রবিবার ভিন্ন অন্য দিনে শুয়ে থাকতে কষ্ট বোধ হয়, বড্ড একা-একা লাগে। তাই মনে হ'ল, শুতেই যদি হয়, ভাগলপুরে গঙ্গার পাড়ে শুয়ে থাকাটা মন্দ লাগবে না। অনেকখানি বৈচিত্র্য উপভোগ করা যাবে। আবও একটা অতিরিক্ত সুবিধার কথা মনে হ'ল। মানে, ঐখানেই যদি সব শেষ হয়ে যায়, তা' হলে অন্য কারো বিশেষ অসুবিধায় পডতে হবে না। শ্মশান খুবই কাছে।

ভাগলপুরে আমার সে অবস্থায় একমাত্র ভয় বলাইচাঁদকে। অর্থাৎ ডাক্তাররূপী বলাইচাঁদকে। দেখা হ'লে সকল নিয়ম উল্‌টে যাবে, খাওযার এবং বিরামের। আধুনিক চিকিৎসায় যে-কোন জ্বরে প্রাচীন কালের মতো উপবাসের ব্যবস্থা নেই, অর্থাৎ ভাত খাওয়া নিষেধ নেই। সব রকম জ্বরের শত্রু হচ্ছে ভাত, এ রকম ধারণা যে যুগে ছিল সে যুগের অভিজ্ঞতা আমার আছে। এ যুগেব সাধাবণ জ্ববে তাই ভাত মস্ত বড মুক্তি। আমার পক্ষে সেটি বড কথা। এখন আর চুরি ক'রে খাওযাব দরকার হয় না, রুগ্ন অবস্থায় প'ডে প'ডে ভাতের স্বপ্ন দেখতে হয় না। আব সেজন্য বিদেশে গেলেও অন্যের অসুবিধা ঘটে না পৃথক ব্যবস্থার জন্য। কিন্তু তবু বলাইচাঁদ সুখে হোক বা অসুখে হোক, খাওযা ব্যাপারে একেবারে কালাপাহাড। প্রাচীন পথ্য-দেবতার যাবতীয় মন্দির চূর্ণ ক'রে মুদ্গর হাতে ব'সে আছে সে। তার কাছে গেলে যেমন তার আদর্শে খেতে হবে (তার প্রধান খাদ্য প্রচুব মাংস প্রতিদিন, এবং আরও মাংস, এবং আবও), তেমনি সে আমাকে শুয়ে থাকতেও দেবে না। আর ঠিক এই ভযেই বিজয়দাকে শপথ করিয়ে নিয়েছিলাম, দিন সাতেক অন্ততঃ আমার ভাগলপুরে আসার খবর যেন প্রচার না হয়।

ইণ্টার ক্লাসের টিকিট ছিল। আশ্চর্য ব্যাপার যে বাংকের উপরে আধখানা স্থান খালি পাওয়া গেল। সেইখানে বিছানা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারও

বিস্তার করলাম। নিচের আসনেও খুব ভিড় হল না। আমার মনে হয়, কামরাখানা ইঞ্জিনের কাছে বলেই অনেকে হয়তো এদিকে আসেনি। এরা দুঃখবাদীর দল।

গাড়ি ছাড়ল নির্দিষ্ট সময়ের ঠিক পাঁচ মিনিট পরে। আমি নেমে পড়লাম উপর থেকে। মনে তখন এক নতুন উত্তেজনা। এতদিন 'এক চাকাতেই বাঁধা' ছিলাম, এবারে এক শ' চাকার উপরে পেলাম সেই বাঁধন থেকে মুক্তি। দীর্ঘ দুই বছর পরে।

বিজয়দার পাশে এসে বসলাম। কিন্তু তিনি ইতিমধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। ব'সে ব'সে ঘুমনো তাঁর পক্ষে খুবই সহজ, এবং গাড়িতে উঠেই ঘুম, এই দু'টি তুচ্ছ জিনিসকেও সেদিন কত ভাল লাগল। কিন্তু পরে জেনেছি, তাঁর ঘুম খুব তুচ্ছ জিনিস নয়। রেলগাড়িতে এ বিষয়ে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা এটা। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ লাভ হয়েছে ভাগলপুরে এবং সেখান থেকে ফেরবার মুখে। শেষ অভিজ্ঞতাটা তুলনাহীন। সে কথা পরে বলছি।

গাড়ির মধ্যে আমি উপর থেকে নেমে যে আসনটিতে এসে বসলাম, সেখানে আমার পাশে একটি যুবক বসে ছিল। দেখলাম, সেও নিদ্রাসিদ্ধ। গাড়ি কিছুদূর যেতেই সে পকেটে (নিজের পকেটেই।) হাত দিল এবং একটি পয়সা বা'র ক'রে হাতের মুঠোয় রাখল। তারপর আমাকে বলল, সে এখন ঘুমোচ্ছে, দক্ষিণেশ্বর ব্রিজের কাছে এলে তাকে যেন আমি জাগিয়ে দিই। জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল সে গঙ্গা পার হবার সময় একটা পয়সা জলে ফেলবে।

এ বয়সের এক তরুণ যুবক পয়সা গঙ্গায় ফেলবে, এই ব্যাপারটায় বেশ কৌতূহল জাগল আমার মনে। এ রকম পয়সা ফেলার কাজ আমার কল্পনায় বয়স্ক ধর্মপ্রাণেরাই ক'রে থাকেন, এ বয়সে কেউ করতে পারে, এমন ধারণা আমার ছিল না। অতএব এ নিয়ে তার সঙ্গে আমার কিছু প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হ'ল। ফলে আমি আমার দৌর্বল্য ভুললাম, এবং সে তার নিদ্রা ভুলল। আমার তর্কের মাঝখানে সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে হঠাৎ সে আমাকে অতি উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করতে লাগল। জলে একটা পয়সা ফেলা মানে সে-পয়সাটা নষ্ট করা, একটা গরিব মানুষকে দিলে ঐ এক পয়সায় তার এক বেলার খাওয়া চ'লে যায়। এমন কি সম্প্রদায় বিশেষ ভোর বেলা ষাঁড়কে

এক পয়সার জিলিপি খাওয়ায় ঐ একই উদ্দেশ্যে। শস্তায় পুণ্য হয়। এভাবে দেশের যে কত পয়সা নষ্ট হচ্ছে তার হিসাব নেই। ইত্যাদি বহু কথা সে বলল। তার যুক্তিগুলো এতক্ষণ যেন একটা কঠিন আবরণে ঢাকা প'ড়ে ছিল, আমার কথায় সেই ঢাকা খুলে গেল। আমি আরাম বোধ করলাম খুবই, এবং তার ফলে সাময়িক উত্তেজনায় ভুলে থাকা দুর্বলতাটাও আবার বেশ অনুভব করতে লাগলাম। আর নিচে ব'সে থাকা সম্ভব হল না, আমি আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু তবু ব্রিজ পার হবার সময় পয়সাটা জলেই নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং যুবকটি নিজের যুক্তিকে অতি সহজেই খণ্ডিত করতে পারল দেখে আমি পুলকিত চিত্তে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোর বেলা ২৯শে এপ্রিলের ভাগলপুরী শীত ও ধারালো হাওয়ার মধ্যে গিয়ে নামলাম প্ল্যাটফর্মে। ভাগলপুরে আমি অনেকবার গিয়েছি, এবং কোনো বারেই প্রায় রাত্রি ভিন্ন যাতায়াত হয়নি। মাত্র একবার দিনে এসেছি মনে পড়ে। টেলিস্কোপ হবার ভয় তখন আজকের মতো অতটা মনে আসত না, এবং সেজন্য এঞ্জিনের কাছের কামরাতেই আমি অধিকাংশ সময় গিয়েছি। এবারেও তাই। সেই দীর্ঘ ট্রেনের মাথার কাছে ঘন জনতার মধ্যে নেমে দাঁড়ানোমাত্র বিজয়দা বহুদূরের কা'কে যেন চিনতে পেরে ছুটে গেলেন সেদিকে, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে বললেন, খুব সুবিধা হয়ে গেল, কেশবমোহনবাবু এই গাড়িতে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর মোটরেই যাব ঠিক ক'রে এলাম।

কেশবমোহন ঠাকুর আমার পূর্ব পরিচিত, স্থানীয় একজন জমিদার। নানা জাতীয় ক্যামেরার অধিকারী। কলকাতাতেও ফোটোগ্রাফি সরঞ্জামের দোকানে অনেকবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে ধর্মতলা স্ট্রীটে। অতএব তাঁর সঙ্গে যাওয়া খুব অস্বস্তিকর মনে হয়নি। তাঁর বাড়ি জলকলের অনেকটা কাছে।

লক্ষ্যে পৌঁছে আরামের নিশ্বাস ফেললাম। উদার আকাশের নিচে এমন উদার অভ্যর্থনা বহুদিন পাইনি। রোদের প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। নদীর ওপারের বিস্তীর্ণ বালুচর তার সামান্য দু'চারজন জলপিয়াসী নর-নারীকে নিয়ে যে ছবি রচনা করেছে তা এপার থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তাদের চলন্ত মূর্তিগুলি পুতুলের মতো ছোট দেখাচ্ছে।

জলকলের এলাকায় সেই পরিচিত অশ্বত্থ গাছ, সুদীর্ঘ চাঁপা ফুলের গাছ, আম গাছ, তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। গাছের হনুমান পরিবার একটুখানি চঞ্চল হয়ে উঠল আমাকে দেখে। তাদের চোখে আমি তখন সাস্‌পেক্ট। অত্যন্ত সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে হয়তো বা "এ সপ্তাহ কেমন যাবে" না জেনে এসেছি ব'লে আমাকে তারা ঐভাবে বিদ্রূপ করছিল।

এমন মনোহর নির্বাসন আমি বহুদিন মনে মনে কামনা করেছি। কাজের ফাঁকে বছরে দু'চারটি অন্ততঃ এমন প্রশস্ত জীবন্ত নদীর নিরাপদ উঁচু পাড়ে, ঝাঁকড়া আম গাছের ছায়ায়, মাটিতে সর্বাঙ্গ ছড়িয়ে দিয়ে প'ড়ে থাকা বড় সৌভাগ্যের পরিচয় ব'লে মনে হয়। কিন্তু বছরে দূরের কথা, সমস্ত জীবনে এ সৌভাগ্য আর একটি বারও পাব কি না জানি না। পেলেও হয়তো তখন অন্যে বাক্য কবে, তুমি রবে নিরুত্তর।

এত আরাম লাগছিল নতুন পরিবেশে। দিন সাতেক্ কাউকে জানাব না। পরে বলাই যখন জানবে তখন সে কিছু হিংস্র হয়ে উঠতেও পারে, এমন আশঙ্কা মনে জেগেছিল, কিন্তু কয়েকটা দিন একা চুপচাপ প'ড়ে থাকার লোভটা দেহ এবং মন দুয়েরই দাবীতে এমন প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, সে ঝুঁকি নিয়েই নদীর পাড়ে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু সাবধান, পকেটমার নিকটেই আছে। এটিও অভিজ্ঞ লোকের কথা। তা ভিন্ন ঈসপের গল্পের একচক্ষু হরিণের গল্পটাও বহু প্রাচীন জ্ঞানীর উক্তি।

আমি এর কোনোটাই মনে আনিনি এবং সেজন্য আমার সব পরিকল্পনাই মাটি হ'ল। খানিকটা একচক্ষু হরিণের মতোই, আমার একটা চোখ নদীর দিকে ফিরিয়ে রেখেছিলাম, জমির দিকে ফেরাইনি। হরিণ তার একটি চোখ রেখেছিল জমির দিকে। তার মৃত্যু এসেছিল নদীর দিক থেকে, আমার এলো জমির দিক থেকে। হরিণ নদীর দিকে রেখেছিল তার কাণা চোখটা, আমি রেখেছিলাম সুস্থ চোখটা (মাইনাস্ ১·৫০ লেন্সের চশমাসহ)। জমির দিকের চোখটা আমার সব সময়েই কাণা।

বিপদ যে কার কোন্ দিক থেকে আসবে তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জানা যায় না। প্রায় তিন ঘণ্টা নদীর পাড়ে কাটিয়ে ঘরে ফিরেছি, তখন বেলা

প্রায় ১১টা, এমন সময় ভোলানাথ হন্তদন্ত হয়ে তার গাড়ি নিয়ে ছুটে এসেছে আমার সন্ধানে। সে বলাইয়ের অনুজ, জলকল থেকে আধ মাইল দূরে অবস্থিত বরারি হাসপাতালের ডাক্তার। এর কথা স্মৃতিচিত্রণে বলেছি।

আমার ভাগলপুরে আসার খবরটা কেশবমোহন ঠাকুর ভোলানাথের সঙ্গে দেখা হতেই ব'লে দিয়েছেন। দু'জনের যে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি, এ কথাটা আমার একেবারেই মনে আসেনি।

ভোলানাথ সংবাদ শুনে চ'লে গেছে বলাইর কাছে। মাইল চার দূরে 'অ্যাডাম'পুরে তার বাড়ি। তার ধারণা, ভাগলপুরে এলে আমি অবশ্যই বলাইয়ের বাড়িতে উঠব। ধারণা মিথ্যা ছিল না, কিন্তু এবারে যে তার ব্যতিক্রম তা সে জানবে কি ক'রে? বলাই শুনে বলল, না, দু' তিন দিন আগে তার চিঠি পেয়েছি, এখানে আসবার কথা ছিল না তাতে। তখন সব পরিষ্কার হয়ে গেল। বিজয়দার সঙ্গে এসেছি, অতএব সেখানেই উঠেছি। অতএব ভোলানাথ আবার ছুটে এসেছে জলকলে।

ধরা প'ড়ে গেলাম। প্ল্যান ভেঙে পড়ার মুখে। ভোলাকে বোঝাতে হবে না কিছু, কেন না জলকল তার বাড়ির কাছে হওয়াতে আমাদের প্রতিদিন দেখা হওয়ার বাধা নেই। কিন্তু বলাই শুনে ফেলেছে কথাটা। তাই ভয়ে ভয়ে তার প্রতীক্ষায় কাটাতে লাগলাম। গঙ্গার ধারে শুয়ে থাকার আরামের মধ্যে আতঙ্ক ঢুকল। থেকে থেকে চমকে চমকে উঠছি।

অনিবার্যকে সত্যিই রোধ করা গেল না।

পরদিনই বলাই-দম্পতি ঘোড়া গাড়ি নিয়ে এসে হাজির। বলল, এখুনি চল।

অবশেষে অনেক বুঝিয়ে দিন তিনেক সময় চেয়ে নিলাম। স্বাস্থ্য যথাপূর্বং। শুয়ে থাকা হ'ল না।

বলাইয়ের বাড়িতে দিন তিনেক কাটিয়ে এবং ক্রমাগত কথা ব'লে, এবং এক মুহূর্ত বিশ্রাম না ক'রে আবার ফিরে গেলাম জলকলের বাড়িতে। কিন্তু ইতিমধ্যে মনের শান্তভাব সব প্রবল ঝাঁকানি খেয়ে বিধ্বস্ত, তাই বিশ্রামে আর মন বসল না।—সকল পরিকল্পনা মারা গেছে, তবু ফিরে এসে যমের হাত থেকে তার একটুখানি অংশ কেড়ে নিয়ে, গঙ্গার পাড়ের তৃণশয্যায় শুয়ে শুয়ে দু'চার দিন তাকে উপভোগ করার চেষ্টা করেছিলাম মাত্র।

বিজয়দার ঘুম : মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া বন্ধ

প্রতিশ্রুত বিজয়দার ঘুমের শেষের পর্যায়গুলির কথা এই বারে বলা দরকার। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বারান্দায় ব'সে কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়তেন। তাঁকে তখন তোলে কার সাধ্য ?

বাল্যকালে বাবার কাছে শুনেছিলাম, তিনি যখন পাবনা জিলা স্কুলে পড়তেন তখন এক শিক্ষক ব্ল্যাক বোর্ডে চকের সাহায্যে রেখা টানতে গিয়ে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতেন। হাতের চক বোর্ডে যথাস্থানেই সংলগ্ন থাকত, এবং জেগে উঠে বাকিটা টানা শেষ করতেন। কিন্তু বিজয়দার যে ঘুম আমি প্রত্যক্ষ করেছি তার সঙ্গে কোনো ঘুমেরই তুলনা হয় না।

আমি যেদিন কলকাতা ফিরব, সেদিন রাত দশটায় কিংবা কিছু আগে বিজয়দার ব্যবস্থা মতো একখানা টু-সীটার এক্কা গাড়ি এসে হাজির। তাইতে আমার হোল্‌ড-অল এবং আমি বসতেই সবটা স্থান দখল হয়ে গেল। বিজয়দা তার উপর উঠে বসলেন এবং গাড়িখানা জলকল সীমানা পার হতেই সেই হোল্‌ড-অলের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

পৃথিবীতে বহু রকম আশ্চর্য ঘটনা ঘটে জানি, অনেক মিরাক্‌ল্‌ও ঘটে শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস হয় না সে সব। সেদিন কিন্তু বিশ্বাস করেছি। কারণ সেদিন সেই এক্কার উপরে বিজয়দার নিদ্রা-পদ্ধতির যে চেহারা আমি দেখেছি তাতে ভয় পেয়েছিলাম, না রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম, তা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি।

বিজয়দা হোল্‌ড-অলের উপর চিৎ হয়ে প'ড়ে ঘুমন্ত অবস্থায় দুখানা পা বাইরে ছড়িয়ে দিলেন, এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তাঁর নাক ডাকার শব্দ শোনা যেতে লাগল। এক্কার ঝাঁকানিতে সে ঘুমের কোনো ক্ষতি হ'ল না। আমি তাঁকে ঠেলা দিয়ে একটু জাগিয়ে বললাম, "বিজয়দা, প'ড়ে যাবেন, এভাবে ঘুমোবেন না।" তিনি জড়িত স্বরে সংক্ষেপে বললেন, "অভ্যাস আছে।" এবং তার পরেই যথাপূর্বং।

এক্কার ধাক্কায় ধাক্কায় বিজয়দার দুখানা পা ক্রমে বাইরে বেরিয়ে যেতে লাগল। আমি আতঙ্কিত দৃষ্টিতে সে দিকে চেয়ে আছি, মাঝে মাঝে ডেকে

তাঁকে সতর্ক করার চেষ্টা করছি। কিন্তু তিনি প্রত্যেকবার ঐ একই ভঙ্গিতে জড়িত স্বরে শুধু উচ্চারণ করছেন, "অভ্যাস আছে।"—ঐ কথাটি যেন একটি নিরেট পদার্থ, ধাক্কা মারলে নিশ্বাসের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে আসে বাইরে। কিন্তু তার পর "অভ্যাস আছে" কথাটাও এমন জড়িয়ে যেতে লাগল যে, তাকে আর তখন নিরেট পদার্থ ব'লে মনে করা গেল না। কিন্তু ততক্ষণে দেখি তাঁর দেহের নিম্নাংশ প্রায় কোমর অবধি বাইরে বেরিয়ে পড়েছে।

সম্মোহন বিদ্যার সাহায্যে মানুষকে এ রকম শক্ত করা যায় শুনেছি। কিন্তু বিনা সম্মোহনেও যে বিজয়দার মতো কিঞ্চিৎ স্থূলকায় ব্যক্তি এক্কা গাড়ির সঙ্কীর্ণ পরিসরে হোল্‌ড-অলের উপরে শুধু পিঠখানা রেখে দুখানা পা সহ অর্ধদেহ বাইরে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারেন তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হ'ত।

শেষে তাঁকে বাঁচাবার জন্য একটি ঘোরাপথ অবলম্বন করলাম। তাঁকে ধাক্কা মেরে মেরে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম, "বিজয়দা, এ বাড়িটা কবে হ'ল, এটাকে তো আগে দেখিনি?"

বিজয়দা বললেন, "বিজ্‌ব্রুর্‌র্‌ জ্‌জ্‌র্‌স্‌স।"

কিন্তু জাগলেন না, এবং প'ড়েও গেলেন না। আমি তাঁর প'ড়ে যাওয়াটাই নিশ্চিত আশঙ্কা করেছিলাম। এবং এ আশঙ্কা শুধু তাঁর জন্য নয়, আমার জন্যও। কারণ যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, আমার যাওয়া বন্ধ হবে, এবং শুধু তাই নয়, অত রাত্রে আহত (এবং সম্ভবতঃ অচেতন) বিজয়দাকে হাসপাতালে পাঠানো ইত্যাদির ঝঞ্ঝাটে সমস্ত রাত কাটবে সেই অসুস্থ দেহে। কিন্তু তাব চেয়েও বেশি ভয় যাওয়া স্থগিত রাখা। তখন কোনো মতেই আর যাত্রাভঙ্গের কথা ভাবা যায় না। কিন্তু এ যে একেবারে অলৌকিক কাণ্ড।

"বিজয়দা, স্টেশনের কাছে এসে পড়েছি, উঠবেন না?"

বিজয়দা অভয়মন্ত্র উচ্চারণ করেন, "ব্রর্‌র্‌রজ্‌জ্‌জ্‌স্‌সস্‌" এবং কোমর আরও একটু শূন্যে ঠেলে দেন।

কোমরসুদ্ধ দুখানা পা এক্কার বাইরে প্রলম্বিত, এবং এক্কা যত এগিয়ে যাচ্ছে, তিনিও তত বেরিয়ে যাচ্ছেন, এবং তাঁর পায়ের ডগা থেকে কোমর অবধি মাধ্যাকর্ষণের শক্তি একেবারে নেই, এ এক নতুন দৃশ্য।

অবশেষে স্টেশন। এক্কা স্টেশনের আঙিনায় প্রবেশ করতে না করতে

বিজয়দা উঠে বসলেন এক ঝাঁকানি মেরে। দেখে-শুনে আমি স্তম্ভিত। ঘুমের সঙ্গেই যে মানুষের সকল চেতনা এবং বোধ সব সময় নষ্ট হয় না, এবং কোনো কোনো মানুষের দুই-ই সমান্তরাল ভাবে চলে, তার চরম দৃষ্টান্ত দেখলাম বিজয়দার মধ্যে। বিজয়দা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসিটি হেসে যেন কিছু হয় নি, যেন তিনি এতক্ষণ ঘুমোন নি, এমনিভাবে এক লাফে এক্কা থেকে নেমে আমার মোট বহনের ব্যবস্থা ক'রে ফেললেন, এবং টিকিট কেনা থেকে আরম্ভ ক'রে আমাকে গাড়িতে তুলে শোবার ব্যবস্থা পাকা ক'রে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হলেন। এবং শুধু তাই নয়, সেই গাড়িতে তাঁর এক উত্তর প্রদেশীয় বন্ধু যাচ্ছিলেন, তাঁকে বার বার অনুরোধ জানালেন, আমাকে তিনি যেন একটু দেখা-শোনা করেন।

পশ্চিম হিমালয়েঃ দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ

ল্যানসডাউনবাসী এক অন্তরঙ্গ বাঙালী পরিবারের নিমন্ত্রণ পেয়ে পর বছর (১৯৪৯) ১৫ই জুন শিল্পী কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদারকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে ল্যানসডাউন ও দিন পাঁচেক পরে সেখানে থাকতে সিমলা থেকে আর এক অন্তরঙ্গ (১৯৫৯ মডেল) পরিবারের প্রধান কর্মসচিবের এক জরুরি চিঠি পেয়েই সিমলার পথে রওনা হ'য়ে গেলাম।

দ্বিতীয় চিঠিখানার লেখক কিরণ রায়। ১৯২০ থেকে অন্তরঙ্গ। (যাবতীয় ভ্রমণ কথা বিস্তারিতভাবে 'পথে পথে' বইতে লেখা আছে। কিরণের নামটি বিশেষভাবে এখানে উল্লেখ করছি এই কারণে যে, সে গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায় আরম্ভ থেকে সাহিত্য-ত্যাগী এবং ১৯৫১-এর গোড়া থেকে সাহিত্যিক ত্যাগী। তাই ১৯৪৯-মডেলের উল্লেখ। এখন অন্তরঙ্গের রঙ্গ অংশটা উঠে গেছে।)

যাই হোক, এবারের দুটি ভ্রমণেই একমাত্র জমির বিস্তার দেখা ভিন্ন আর কোনো দিক দিয়ে খুব বেশি কিছু লাভ হয় নি। ল্যান্সডাউনে কাম্য ছিল ছায়া, সিমলায় কাম্য রোদ। এক এক সময় এমন বৃষ্টি আর ঠাণ্ডা যে, তখন ঘরে শুয়ে থাকাতেই আরাম বোধ হয়েছে। অবশ্য দুপুরে খুবই গরম।

ভ্রমণের আরম্ভ থেকেই প্রায় প্রত্যেকটা জিনিস প্রতিকূল হয়ে উঠেছিল। প্রথমতঃ আবহাওয়ার উত্তাপ। জুন মাসে ও-পথে কেউ ইচ্ছে ক'রে যায় না। মেঘহীন ঘোলা তামাটে আকাশের নিচে ১১২ ডিগ্রী ফারেনহাইটের আগুন। এরই ভিতর দিয়ে শত শত মাইল অতিক্রম করা প্রাণান্তকর ব্যাপার। তারপর ল্যানসডাউন শহরের ৬০০০ ফুট উচ্চতায় বাংলা দেশের গ্রীষ্ম। তারপর এই শহরের যেসব ঝোপঝাড়-বেষ্টিত স্থানকে অত্যন্ত নির্জন ব'লে মনে হয়েছে, সেখানেই আমি ক্যামেরা, ও কালীকিঙ্কর রং তুলি স্কেচ বুক নিয়ে প্রবেশ ক'রে দেখি সৈন্যরা সেই সব স্থানে যুদ্ধের নানা কৌশল অভ্যাস করছে। অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ স্থান মনে ক'রে যেখানে বসেছি, হঠাৎ দেখি একদল সৈন্য কুচকাওয়াজ করতে করতে কোন্ অদৃশ্য স্থান থেকে বেরিয়ে এলো।

আর শুধু তাই নয়, এ শহরে আমাদের মতো নিরীহ এবং শান্তিকামী দুজন অতিথির উদ্দেশ্যহীন চলাফেরায় ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন কিনা, সে সন্ধানও চলছিল গোপনে গোপনে। কানে এসেছিল সে কথা। সেই পাহাড়ী ওঠা-নামার পথে সারাদিন ঘুরে বেদনাহত পা নিয়ে আমাদের নিজেদের নিরাপত্তা যে সেখানে কি পরিমাণ বিপন্ন হয়েছিল, তা দেখবার বিশেষ কেউ ছিল না। ওখান থেকে তাই না পালানো পর্যন্ত বড়ই অস্বস্তি বোধ করছিলাম। এমনি অবস্থায় সিমলা থেকে কিরণের চিঠি। সিমলা, ল্যান্সডাউন থেকে প্রায় দু হাজার ফুট উঁচু—তাই মনে হয়েছিল দেবতারা বর্তমানে ঐ খানেই আছেন। হয়তো তাঁরা কিরণকে এজেন্ট বানিয়ে তার উপর ভর ক'রে ঐ চিঠিখানা আমাদের উদ্দেশে লিখিয়েছেন।

আর দেবতারা সাহারানপুর স্টেশনে আরও একজনকে এজেন্ট বানিয়ে ওয়েটিং রুমে আমাদের দেখাশোনার ভার দিয়েছিলেন। তার নাম ফকিরচাঁদ। কিন্তু তার একার সাধ্য কি একটি মাত্র প্রথম শ্রেণীর অতি সুস্বাদু ডালভাতের ভোজ খাইয়ে সেই আগুনের হাত থেকে আমাদের বাঁচায়। সূর্যের এমন প্রচণ্ড নিষ্ঠুর মূর্তি আগে কখনো দেখিনি। প্রায় চল্লিশ বছর আগে প্রখর গ্রীষ্মে ভাগলপুরে পুরো একমাস কাটিয়েছিলাম। সে আগুনের কথা ভাবলে এখনো গায়ে ফোস্কা পড়ে। কিন্তু ১৯৫৯ সালের উত্তরপ্রদেশের আগুন সম্ভবতঃ সূর্য-দেহের সমান উত্তাপের স্বাদ দেবার জন্যই আমাদের মাথায় এসে

নেমেছিল সে যে কি, তা শুধু গভীর প্রেমের মতো উপলব্ধি করা যায়। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

গরমের এই দুর্ভোগ আমরা অন্তত শতকরা দশ কমাতে পারতাম যদি ল্যানসডাউনে কেউ বলতে পারত সিমলা যাওয়া কোন্ গাড়িতে সুবিধাজনক। কিন্তু কেউ পারেনি বলতে। তাই সমস্ত রাত নজিবাবাদ ওয়েটিং রুমে ব'সে কাটিয়ে পরদিন সকালে সাহারানপুরগামী এক গাড়িতে উঠে বসলাম। আমাদের এবারের যাওয়া দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর মিশ্রণে। (ইংরেজ আমলের ইণ্টার ক্লাস ও দ্বিতীয় শ্রেণী।) কিন্তু তখনকার এই দুই শ্রেণী যুদ্ধের আগে এর চেয়ে বেশি আরামজনক ছিল। অতএব এবারে নামমাত্র উচ্চশ্রেণীর উচ্চমূল্যের টিকিট কিনে টিকিটহীন প্রায়-উলঙ্গ নোংরা কয়েকটি ছোকরার সঙ্গে চললাম কালকাব পথে। (এই অসুবিধাটা দেবতারা কল্পনা করেননি।) অতএব তারা স্বাধীন ভাবে আম খেতে খেতে এবং আমের রস ও খোসায় গাড়িটিকে যথাসম্ভব স্বদেশী চরিত্রে রূপায়িত ক'রে আমাদের সহযাত্রী হ'য়ে চলতে লাগল।

পরদিন বৈকালে সিমলা। কিন্তু ইতিমধ্যে টিকিটহীন যাত্রীদের ভিড়ের চাপে, প্রায় অনাহারে ও সম্পূর্ণ অনিদ্রায় এবং আমাদের চোখে যাদের আচরণ ঘৃণ্য ও আমাদের সান্নিধ্য যাদের পছন্দ নয়, এমন সহযাত্রীদের সঙ্গে চরম মানসিক অস্বস্তি নিয়ে চলতে চলতে নতুন দেশ দেখার সমস্ত প্রবৃত্তি নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। এর উপর আবার কোনো স্টেশনে দেশের নিরাপত্তা রক্ষকদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়। অন্য দিকটা অনুকূল হ'লে এই ব্যাপারটিতে বিরক্তি জাগত না, কিন্তু সব- যেখানে প্রতিকূল, সেখানে সামান্য অসুবিধাও অত্যন্ত অসহ হয়ে ওঠে।

তারপর সিমলা। এখানেও স্টেশনে নেমে কিরণের অফিসের কাছে যখন বিছানার বোঝা ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে ক্লান্তভাবে কিরণের প্রতীক্ষায় ব'সে আছি, সেই সময় এক অতি অবাঞ্ছিত লোক এসে ক্রমাগত বলতে লাগল সে শহর দেখাবার ভার নেবে, আমাদের কিছু ভাবতে হবে না, ইত্যাদি। ছাড়তে চায় না সহজে।

কালীকিঙ্কর কিরণের অফিসে গিয়ে তাকে ডেকে আনল, তাকে আগেই খবর দেওয়া ছিল। কিন্তু এখানকার বৈচিত্র্যহীন পাহাড়ের পর পাহাড়ের

শুধু সহ-অবস্থান। দার্জিলিঙের মতো আমাদের মাথার শিয়রে তুষার-ঢাকা কোনো পাহাড়ের মাথা নেই, পথ চলা মানে আকাশে ওঠা আর পাতালে নামার পুনরাবৃত্তি। ক্লান্ত চরণ, অবসন্ন দেহ-মন। শুধু কাইথুরে দুর্গা ভিলার উষ্ণ পরিবেশ ভিন্ন আর কোথাও বিশেষ কোনো তৃপ্তি ছিল না। যদিও সেখান থেকে চ'লে আসার পর দুই প্রতারক দু'খানা চিঠি লিখে আমাদের সান্ত্বনা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। এই দুইয়ের একজন কিরণ, সে সিমলায় টানবার জন্য তার অপরূপ শোভার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে কার্ড পাঠিয়েছিল। দ্বিতীয় জনও দুর্গা ভিলাবাসী, নাম ফণী চাটুজ্জে, এবং দুটি পাখীই এক পালকের।

আমরা চলে আসার পব কিরণ লিখছে (সিমলা, ১০-৭-৪৯)

"পরিমল দা,

"তুমি এসেছিলে। সঙ্গে নিযে এসেছিলে আমার যৌবনের দিন। 'কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি।' আসলে আমরা incorrigibly romantic. বহু চেষ্টা ক'বেও matter of fact হওয়া গেল না।···

"তার পর তোমরা বাইবে যাবার পবই যে কাণ্ড করেছেন সিমলা-সুন্দরী। আর একটা সপ্তাহ যদি থাকতে। দেখি আর আপশোষ হয়।

"যখন যেমনটি হওয়া উচিত, পৃথিবীর বস্তু-স্রোত তাতে বাধা দেয়। ইতিহাস তাই রক্তপাতের পৃষ্ঠা। মধ্যে মধ্যে আসেন হেগেল-শোপেনহাউয়ার। বলেন, নিয়মটা ব্যতিক্রম, এবং ব্যতিক্রমটাই নিয়ম। নেপথ্যে হাসেন বস্তু-বিধি। কত কার্ল মারক্স এলো গেল। কত না বুদ্ধ-গান্ধী। বস্তু-বিধি সমান পদাঘাত ক'রে চলেছে সব। আজ যেটা বিধান, কাল সেটা নিষেধ।···

"হাসছো? বলছো এত কথা আসছে কেন?···তা নয়, তুমি যে যৌবনের দিনগুলো সামনে ফেলে গিয়েছিলে, এ তারই sequel। ভাবছিলাম, জীবনে কি পেলাম, আর কি হারালাম। এর মধ্যে এলো তোমার চিঠি।···

"কুষ্টিয়ার পরিত্যক্ত নীলকুঠীর বিরাট ভ্যাটগুলোর সামনে আট-নয় বছর বয়সে চীৎকার করে শুনতাম তার প্রতিধ্বনি। সে নীলকুঠি গোড়াই নদীর গর্ভে গেছে, কিন্তু আমি আছি, আজও প্রতিধ্বনি শুনছি।···

ইতি—কিরণকুমার"

সিমলা থেকে ফিরে যে চিঠি লিখেছিলাম, এ তারই উত্তর। নানা ছলে নৈরাশ্য ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা। শেষ পর্যন্ত দার্শনিকপনার মধ্যে নিক্ষেপ করার চতুর চেষ্টা।

দ্বিতীয় প্রতারকের চিঠিখানারও অংশ বিশেষ প্রকাশ করছি। ফণী চাটুজ্জে লিখছে (সিমলা ৫-৭-৪৯)—

"পরিমলবাবু—

"আপনার চিঠি পেয়ে প্রায় অতিভূত হলাম। কিছুদিন থেকে একটা ধারণা জন্মাচ্ছে যে, আমার মধ্যে একটা পাকা ভণ্ড আছে, যে নিজের আসল রঙটা লুকিয়ে রাখে, জাতি-ধর্ম-রুচি নির্বিচারে অপরের রঙের সঙ্গে রঙ মেলায় এবং আদরের toll আদায় ক'রে ছাড়ে। যেমন বর্তমান ক্ষেত্রে আপনার করলাম। আপনার সঙ্গে রুচির কিছু মিল আছে স্বীকার কার। কিন্তু আমাদের অফিসের পাঠান যুবক মোতিবাম খিওডা, বাম-জোচ্চোর হনুস্রাজ দুয়া ঝুনো অ্যাকাউণ্টস অফিসার দক্ষিণী 'রাও,' এবং স্বদেশী-বিদেশী আরও অনেকে? সকলের ডার্লিং হয়ে উঠি কি কৌশলে? আত্মবিশ্লেষণ আমার পেশা নয়, কিন্তু যখনই এ রকম un-earned income জোটে, তখনই প্রশ্ন জাগে জোচ্চোরিটা কোথায়?...

"কেউ না ঠকালেও আপনারা যে ঠকেছেন তাতে সন্দেহ নেই। আপনারা যাবার ক'দিন পর থেকেই সিমলা পাহাড রঙ্গমঞ্চ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার বর্ণনা কোনো কলমেরই সাধ্য নয়, আমার তো নয়ই। প্রতি মুহূর্তে যে নতুন নতুন কাণ্ড ঘটছে তার প্রতিরূপ দেওয়া তুলিতেই সম্ভব, এবং তাও যার তার তুলি নয়। কালাকিঙ্করবাবু কি করতেন জানি না। হয় তো ক্ষেপেই যেতেন। পাহাড়ের নানা শেড-এর সবুজ, আকাশের স্বর্গীয় নাল, মেঘের কাজল এবং জলন্ত শাদা মিলে কি অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার যে ঘটছে তা যদি দেখতে পেতেন! সূর্যাস্তগুলি তো প্রত্যেকখানি super-Turner!" —ফণী।

ফণী ও কিরণ—এই দু'জনের চিঠিতেই সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা আছে, এবং কিঞ্চিৎ নিষ্ঠুরতাও আছে, কেননা সেখানে আবার যে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, এ কথা নিশ্চয় তাদের মন জানত, কিন্তু তবু এই প্রলোভন কেন?

সর্বশেষ রেলওয়ের নিষ্ঠুরতা। ট্রেনে ঘুমনোর জন্য চল্লিশটি টাকা

অতিরিক্ত নিয়ে ঘুমনোর কোনো ব্যবস্থাই করেনি। পরে চিঠি দিয়ে তার জবাব পাইনি। এসব কথা 'পথে পথে' বইতে সবিস্তারে বলা আছে। অর্থাৎ ছাপার অক্ষরে প্রথমে প্রবাসীতে ও পরে বইতে প্রকাশিত হয়েছে। সে তো অনেকদিনের কথা। আজও রেলের কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সে টাকা ফেরৎ দেওয়া অথবা সেজন্য ক্ষমা চাওয়া—এরকম বিপ্লবকারী কোনো ঘটনাই অদ্যাবধি ঘটেনি। সম্ভবতঃ এই কারণেই ও পথে বিনা ভাড়ায় হাজার হাজার যাত্রী সুখ-ভ্রমণ ক'রে এই জাতীয় উচ্চস্তরের উদাসীনতার শোধ তুলছে।

এই দীর্ঘপথের অভিজ্ঞতার পর আর কলকাতা ছেড়ে ২৫ মাইলের উর্ধ্বে যাইনি, যদিও দ্বিতীয় এবং প্রথম শ্রেণীতে এর মধ্যেও বিনাভাড়ার যাত্রীদের পেষণ সহ্য করেছি বহুবার। এখন শুনছি যত ভাড়া বাড়ছে, তত বিনা টিকিটের যাত্রী বাড়ছে।

দ্বিতীয় স্মৃতি মন্থন

একথা স্মৃতিচিত্রণে বলেছি—স্মৃতির এক একটা অংশ সম্পূর্ণ নিবে গেছে, কোনো আকস্মিক মুহূর্তে তার মধ্যে কখন কোন্‌টা আলোকিত হয়ে উঠবে তা আগে থাকতে বলা যায় না। এমনি কত হারিয়ে যাওয়া মুহূর্ত এখন মনের মধ্যে নতুন করে ভেসে উঠছে মাঝে মাঝে। অবাক হয়ে ভাবছি, কেন এতদিন মনে পড়েনি।

হঠাৎ ফিরে পাওয়া একটি আনন্দের স্মৃতি বাল্যকালের পড়া ছেলেদের রামায়ণ ও ছোটদের মহাভারত। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা এ দু'খানি বইয়ের প্রথমখানি আমার সবচেয়ে প্রিয় বই ছিল স্কুল জীবনে। উপেন্দ্রকিশোর সম্পাদিত 'সন্দেশ'ও আমি নিয়মিত পড়েছি যখন প্রথম বেরোয়। এ সব কথা ভুলে যাওয়া অমার্জনীয়। 'সন্দেশ' কাগজখানা নতুন আকারে সম্প্রতি প্রকাশিত হ'তে দেখে সবই মনে প'ড়ে গেল। ১৯১৭ কি ১৮ হবে মনে নেই, সুকুমার রায়ের বক্তৃতা শুনেছি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে। তাঁর চেহারাটাও স্পষ্ট মনে পড়ছে।

পুরনো চিঠির সঞ্চয় ঘাঁটতে গিয়ে অনেক পুরনো কথা মনে প'ড়ে যাচ্ছে।

বছর ত্রিশেক পরে এক বন্ধুর একখানা চিঠি আবিষ্কার করলাম। বহু চিঠির মধ্যে লুকিয়ে ছিল। চিঠিখানার লেখক গিরিজা মুখোপাধ্যায়। লেখা হয়েছে বিলাত যাওয়ার পথে, ওরিয়েন্ট লাইনের 'অরমণ্ড' জাহাজ থেকে। চিঠিতে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অনেক কথা ছিল, তা বাদ দিয়ে বাকী অংশ উদ্ধৃত করছি। চিঠির তারিখ ৮ই অক্টোবর, ১৯৩১।

প্রিয় পরিমলবাবু,

অত্যন্ত অকস্মাৎ দেশ ছেড়েছি। কাজেই আসবার দিন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসিনি। আশা করি ত্রুটি মার্জনা করবেন।…

যতই জাহাজ বিদেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ততই তীব্রভাবে অনুভব করছি কত ছোটখাটো অজস্র বন্ধনে দেশের সঙ্গে সমস্ত অন্তরাত্মা বন্দী হয়ে আছে। মানুষ স্বদেশকে কতখানি ভালবাসে, বিদেশে না গেলে বোধ হয় তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না।

জাহাজে তেমন কিছু বিস্ময়কর ঘটেনি। এটা অষ্ট্রেলিয়া থেকে আসছে। কাজেই জাহাজে অষ্ট্রেলিয়ান যুবক-যুবতী আছেন। ছেলেগুলো বেশ ভদ্র। সবল এবং সুস্থ। কিন্তু মেয়েগুলো সবাই উড়ন-চণ্ডী, একেবারে হৈ হৈ মূর্তি। ইংলণ্ডের মেয়েরা এতখানি অসভ্য বোধ হয় নয়। আসলে অষ্ট্রেলিয়াও পুরো দস্তুর অ্যামেরিক্যানাইজড্ হয়ে যাচ্ছে, এ সব মেয়েদের দেখলে তাই মনে হয়।…

আশা করি সবাই ভাল আছেন।

গিরিজা মুখোপাধ্যায়

আমার লণ্ডনের ঠিকানা—

C/o Cox & Kings (Agents) Ltd.

13 Regal Street,

London S. W.

স্মৃতিচিত্রণে (২য় সং, ১৮৬ পৃষ্ঠায়) এঁর সম্পর্কে লিখেছিলাম—"দীর্ঘ ইউরোপ-প্রবাস-খ্যাত গিরিজা মুখোপাধ্যায় তখন সেণ্ট পলস-এর ছাত্র, তিনি দেউটি নামক একখানা মাসিক পত্র প্রকাশ করেছিলেন। সে কাগজে ব্যঙ্গ রচনা লিখেছিলাম, বলাইও লিখেছিল।"

অদ্যাবধি গিরিজার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। কয়েক বছর আগে

শুনেছিলাম, ইউরোপের নানা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে পার হ'য়ে শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরেছিলেন। তাঁর লেখা ইংরেজী একখানা বইয়ের বিজ্ঞাপনও দেখেছিলাম সে সময়। কিন্তু গ্রন্থকার বা গ্রন্থ কোনোটাই দেখার সুযোগ ঘটেনি আর।

গিরিজার সঙ্গে এক কালে সাহিত্যের স্বরূপ নিয়ে কত উত্তেজনাপূর্ণ তর্ক হয়েছে। সাহিত্যের ভঙ্গির কতক অঙ্গ বিষয়ে দু'জনের মতভেদ ছিল, তাই তর্ক। কিন্তু তা কদাপি মনান্তরের পর্যায়ে নামেনি। আজ সে সব কথা মনে হ'লে কৌতুক বোধ হয়। অতএব সে সব কথার পুনরুল্লেখের কোনো দরকার বোধ করি না। কিন্তু গিরিজার ঐ চিঠির মধ্যে এমন একটি কথা আছে যা নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করা চলে।

জাহাজ ভারতের সীমা ছেড়ে যাবার পর দেশের প্রতি তিনি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন, ছোটখাটো কত অজস্র বন্ধনে তিনি দেশের সঙ্গে বাঁধা ছিলেন।

কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। কোনো জিনিস হাবালে তার প্রতি আকর্ষণ বাড়ে, তার যথার্থ মূল্য বোঝা যায়। যে-কোনো তুচ্ছ জিনিস সম্পর্কেও এ কথা খাটে। দেশ সম্পর্কে অবশ্যই খাটে।

কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকে যায় এই যে, এই মূল্যবোধ কি সমস্ত জীবন একই থাকে?—এর উত্তর নির্ভর করে সেন্‌টিমেন্‌ট বা ভাবলালিত্যের তারতম্যের উপর। সেন্‌টিমেন্‌ট কথাটির ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ নেই। ও জিনিসটি হচ্ছে ভাবের ললিত রস। এর কোনো ব্যাখ্যা নেই, কিন্তু জিনিসটি কম-বেশি সবারই আছে। সেন্‌টিমেন্‌ট যার তীব্র, প্রিয় বস্তু হাবালে তার পক্ষে বাঁচা কঠিন হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। অনেকে সাইকোটিক রোগী হয়ে পড়ে। আবার যার আদৌ সেন্‌টিমেন্‌ট নেই, তার অবস্থাও খুব ভাল নয়। কোনো জিনিসে তার ভাবগত আকর্ষণ নেই। তার হাত থেকে অন্যের বাঁচা কঠিন হয় অনেক সময়।

সাধারণতঃ এই দুই চরমের মধ্যবর্তী লোকই সংসারে বেশি। এরা কোনো প্রিয় জিনিস হারালে সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে পড়ে না। এবং এরা যখন কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে দুঃখ অনুভব করে, তখন বুঝতে হবে এ দুঃখ তাদের স্থায়ী দুঃখ নয়। নতুন পরিবেশে আবার নতুন সেন্‌টিমেন্‌ট জাগে। শেষে

উপলব্ধি করে, যার বিচ্ছেদে এমন মর্মান্তিক দুঃখ, "তাহারে বাদ দিয়েও দেখি বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।"

এমন না হলে ক'জন লোক শেষ পর্যন্ত নিজেকে ললিত ভাবে বিগলিত হয়ে ডুবে যাওযাব হাত থেকে বাঁচাতে পাবত?

চিঠির ভাণ্ডার খুলতে গিয়ে এলোমেলো ভাবে অনেক চিঠি সামনে ছড়িয়ে পড়ল। ত্রিশ বছব আগেব (১৯৩১) গিরিজা মুখুজ্জেব চিঠির কথা বলেছি। এই সঙ্গে আরও আগের একখানা বিগত যুগের ছাপমারা পোস্টকার্ডের সংক্ষিপ্ত দুটো কথা বলতে ইচ্ছা হল। এই পোস্টকার্ডে ১৯০৬ সালেব ছাপ আছে সপ্তম এডোয়ার্ডেব কানের উপর। ভিতবে তাবিখ নেই, বাইবেব ছাপের তাবিখ ১০ এপ্রিল ০৬, পত্র লেখক শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, বালিগঞ্জ, রবিবাব। আমাব পিতাকে লেখা।

সবিনয় নিবেদন,

আপনাব পত্র পাইযা আপ্যায়িত হইলাম। এবাব হইতে ভাবতীর লেখক স্বরূপ আপনাব নিকট ভাবতী বিনা মূল্যে যাইবে।

নূতন গ্রাহকেব জন্য ধন্যবাদ জানিবেন। ইতি—

বিনীত

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

এ চিঠিখানা উল্লেখযোগ্য মাত্র একটি কাবণে যে, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের উত্তব পুরুষেব সঙ্গে আমাব পিতা বিহারীলাল গোস্বামীর উত্তর পুরুষের পবিচয় ঘটেছে কিছু বিপবীত ভাবে। অর্থাৎ অতঃপর আমি সম্পাদকরূপে শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়েব লেখা একাধিকবাব ছেপেছি, এবং এই উপলক্ষে তাঁব সঙ্গে আমাব পবিচয় ঘটেছে।

এর পবেব দুখানা চিঠি—শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীব লেখা। তিনি আমাব কাছে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন এই যে, কৃষ্ণনগবেব অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মিলনে তিনি কথাসাহিত্য বিভাগেব সভানেত্রী রূপে যে অভিভাষণটি লিখবেন তাব উপকরণ যেন আমি সংগ্রহ ক'রে দিই। এই প্রস্তাবে আমি বাজি হওয়াতে তিনি যে চিঠিখানা লেখেন সেখানা এই—

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি
৬০-বি মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৪-১-৩৮

কল্যাণীয় পরিমল,

...তুমি আমাকে কথাসাহিত্যে অভিভাষণ সম্বন্ধে সাহায্য করবে জেনে আমি যার পর নাই সুখী হয়েছি। আমি জানি তুমি এ সম্বন্ধে যে তথ্য দেবে তা কত মূল্যবান ও সুচিন্তিত হবে। একেই তো এ রকম একটি অভিভাষণ লিখতে গেলে অনেক জানা থাকা দরকার, তা ছাড়া ভাবতেও হবে অনেকখানি। এ সব করতে আমার একেবারেই সময় অভাব। আপাততঃ তুমি বই ঘেঁটে কথাসাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারাটি আমাকে ধরিয়ে দেবে, শেষে নিজের ভাষায় সেটি গেঁথে নেব। নানা ভাবে আমি এত ব্যস্ত যে বেশি সময় এর জন্য দিতে পারছি না। অতএব তুমি অভিভাষণটি এক রকম তৈরী করেই দেবে, আমি নিজের ভাষায় গুছিয়ে নেব মাত্র।...

—ইতি বড়মা

শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী সবারই বড়মা ছিলেন সমিতিতে, আমিও ঐ নামেই ডাকতাম। (এখন তিনি পুরী-বাসিনী এবং সেখানেও সবাব বড়মা)।

তাঁর অনুরোধ আমি পালন করেছিলাম। এবং সেই উপকরণ কালানুযায়ী সাজিয়ে দিতে আমি তৎকালীন আধুনিক কাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সকল কথাসাহিত্যিকের যথা অচিন্ত্য-প্রেমেন-শৈলজানন্দ-বনফুল-মানিক প্রভৃতির নাম উল্লেখ করেছিলাম। এই লিখনটি পাবার পর তিনি যে ভাবে সেটিকে সাজিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আমি আরও কিছু পরিবর্তনের কথা বলেছিলাম। তাঁর লেখাতে তৎকালীন জীবিত কথা-সাহিত্যিকদের নাম তিনি বাদ দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি যে চিঠিখানা দিয়েছিলেন তা থেকে তার কারণ বোঝা যাবে। চিঠিখানা এই—

ওঁ

৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন
কলিকাতা, ৩-২-৩৮

কল্যাণীয় পরিমল,

কাল তোমার চিঠিখানি পেয়ে বিশেষ উপকৃত হয়েছি এবং তোমার নির্দেশ মত স্থানে স্থানে পরিবর্তন করে দিলুম। কাকা মহাশয় (রবীন্দ্রনাথ)

পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেছেন এই সব প্রবন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে নাম উল্লেখ করতে, তাই নাম উল্লেখ করতে সাহস পাই নাই। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বর্তমান সম্মিলনীর জন্য যে অভিভাষণ লিখেছেন তাতে একজনেরও নাম উল্লেখ করেন নাই, যা বলবার সব সাধারণভাবে বলেছেন, আমার প্রবন্ধটা একবার কাকামহাশয়কে দেখিয়ে আনার জন্য আমি শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিচ্ছি—তিনি যা বলেন তাই করি।

আমি এসব বিষয়ে অনেকটা আনাড়ি সবাই তা জানে তবে তাই বলে যা তা লিখতে হবে তা হতে পারে না। কেউ কানে না নিলেও মনে না গ্রহণ করলেও আমাকে অবশ্য সাবধান হ'তেই হবে। তোমার suggestion পেয়ে কাল খানিক খানিক বদলেছি এবং তাতে ভাল হয়েছে। কাকামহাশয় পছন্দ করেন না অনেক নাম উল্লেখ করতে তাই সাহস করলুম না, তবে তাঁরা যে প্রতিভাশালী সে কথা বিশেষ করে উল্লেখ করেছি।··

—বড়মা

অতঃপর অভিভাষণটি কি রূপ নিয়েছিল তা এখন আমার মনে নেই।

চিঠির পর চিঠি সামনে খুলে নিয়েছি, বাছাইয়ের সময় নেই, যেখানা হাতে উঠছে, দেখছি সেখানার সঙ্গেই বহু স্মৃতি বিজড়িত।

সার তারকনাথ পালিতের কন্যা লিলিয়ান পালিত—পরে মিসেস লিলিয়ান মল্লিক ও তারপর মিসেস লীলা সিং। তাঁর সঙ্গে, তাঁর (এবং সম্ভবত কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্যের) একটি বিশেষ প্রয়োজনে সাক্ষাৎ ঘটেছিল ভাগলপুর থাকতে। তিনি ছিলেন দীপনারায়ণ সিং-এর পত্নী। দীপনারায়ণ সিং তার কিছুকাল পূর্বে মারা গেছেন, অতএব লীলা সিং-এর বড়ই ইচ্ছা তাঁর স্বামী সম্পর্কে বাংলা·ভাষায় কিছু লেখা হোক। কপিলপ্রসাদ তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এই উদ্দেশ্যে। তিনি আমাকে সামান্য কিছু ইংরেজী কাগজে প্রকাশিত খবর কেটে আমাকে দিলেন, তারই উপর ভিত্তি ক'রে আমাকে বাংলায় লিখতে হবে।

আমি স্বীকৃত হবার পর তাঁর অনুমতি নিয়ে তাঁর বিরাট বাড়িখানা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। উদ্দেশ্য, কোন্ পরিবেশে দীপনারায়ণ জীবনের অনেকখানি কাল কাটিয়েছেন তার সঙ্গে পরিচয় লাভ করা।—ঘটনাটি ২৬ বছর আগের।

কলকাতা ফিরে লিখেছিলাম দীপনারায়ণের চরিত্রচিত্র। এবং তা একখানা কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু কোন্ কাগজে তা আর এখন মনে নেই, সে লেখাটির কোনো কপিও আমার কাছে নেই। অতএব আমার দিক থেকে তার কোনো পরিচয় দিতে পারা গেল না। কিন্তু সে লেখা প'ড়ে লীলা সিং আমাকে যে চিঠিখানা লিখেছিলেন, তাতে আমার আনন্দ এবং আত্মতৃপ্তির কারণ ঘটেছিল। কারণ চিঠিখানা নিতান্তই ধন্যবাদ বাহক ছিল না। কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

MANSURGUNJ

Bhagalpur

E.I.R,

The 3rd July, 1936

My dear Parimal Babu,

...Please do not think I am trying to flatter you when I say that I was greatly touched and moved by what you have written. It shows not only the command of language but the insight of a true artist for you to have written as you have done about one whom you did not personally know but only knew through his intimate friends and those who loved him. You have caught such salient points of his character that it seems amazing to me how any one who did not know my husband personally could have done so, much has been written about him since his death but nothing I have read has really moved me as greatly as your article. ..

With deepest thanks

and kind regards

Believe me, Yours very sincerely

Lila Singh

আরও কয়েকখানি ছোটখাটো চিঠির কথায় পুরনো দিনের কথা মনে জাগছে। নিচে দুখানা পোস্টকার্ডের সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে দুই লেখকের একজনের

গাম্ভীর্য ও অপর জনের ব্যঙ্গপ্রিয়তার পরিচয় মিলবে। প্রথমখানির লেখক মোহিতলাল।

ঢাকা, ৮।১১।৩৪

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্রের জবাব দিতে পারি নাই—আশা করি সে জন্য দুঃখিত হইবেন না। আমার বিজয়ার প্রীতি নমস্কার জানিবেন। আশা করি কুশলে আছেন।

মাঝে অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম—এজন্য লেখা পাঠাইতে বড় বিলম্ব হইল। আশা কবি, এখনও সময় আছে। আজ লেখা পাঠাইলাম। শীঘ্র প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন।

অসুস্থতাবশতঃ বঙ্গশ্রীর প্রবন্ধ লিখিয়া উঠিতে পারি নাই—আরম্ভ করিয়াছি কিন্তু এত অল্প সময়ে হইয়া উঠিবে কি না সন্দেহ। সজনীবাবুকে বলিবেণ। তাঁহার পত্রের প্রতীক্ষায় আছি—না পাইয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছি। সংবাদ দিবেন। ইতি—

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

দ্বিতীয় চিঠিখানা সজনীকান্তের—

25/2 Mohanbagan Row

Cal 8-10-35

পরিমলদা,

বিজয়াব প্রীতিনমস্কার। কোথায়ও যাওয়া হইয়া উঠে নাই, বর্ধমানেও নয় কারণ বর্ধমান গোটাটাই এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। বিষম ভীড—আমি অফিস ঘরে বেঞ্চে রাত্রি যাপন করিতেছি।

আশা করি আপনার মাথা এতদিনে ছাড়িয়াছে—দোহাই ম্যালেরিয়া ধরাইবেন না।

যুদ্ধের খবব যাহা পাইতেছি তাহা সত্য নয়, আপনি যাহা কল্পনা করিবেন তাহাই সত্য।

শীঘ্র আসিবেন. ডুবাইবেন না।

ইতি—সজনী

আমি অল্পদিনের জন্য দেশে গিয়েছিলাম, সেখানে এই চিঠিখানা পাই। এতে যে যুদ্ধের কথা আছে সেটি অ্যাবিসিনিয়ার সঙ্গে ইটালির যুদ্ধ। ৩রা অক্টোবর ১৯৩৫ তারিখে এই দুই দেশের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তার পাঁচ দিন পরে এই চিঠিখানা লেখা।

'অলকা' মাসিকপত্রে থাকাকালে এঞ্জিনিয়ার কবির একখানা কার্ড পেয়েছিলাম।—

9 Pratapaditya Road
Kalighat 8. 8. 39.

প্রীতিভাজনেষু,

পরিমলবাবু, আমার যে রচনাটি অলকায় প্রকাশিত করাব কথা স্থির হইয়াছে সে সম্বন্ধে আপনার সহিত অল্পক্ষণের জন্য একবার আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। যদি আগামী কাল সন্ধ্যার সময় আমার বাসায় অনুগ্রহপূর্বক একবার আসেন তবে বিশেষ আনন্দিত হইব। রচনাটি নকল করিবার সময় দুই একটি কথা আমাব মনে হইল, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

এই চিঠিখানার সঙ্গে যে সব স্মৃতি আজও মনের মধ্যে স্পষ্ট থাকা উচিত ছিল, তা নেই। অনেক চেষ্টা ক'রেও সব কথা মনে আনা গেল না। অলকা আষাঢ় ১৩৪৬ (ইং ১৯৩৯) সংখ্যা থেকে আমি প্রমথ চৌধুরীর সহকারীরূপে নিযুক্ত হই। পরবর্তী শ্রাবণ সংখ্যায় আমি যতীন্দ্রনাথের "বরনারী" কবিতা ছাপি। উপরের চিঠিতে যে রচনার কথা আছে তার নাম "শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত"। প্রবন্ধটি চন্দ্রশেখর প্রতাপ শৈবলিনী চরিত্রের এবং সম্পর্কের মধুর কবিজনোচিত বিশ্লেষণ। কিন্তু দ্বিতীয় স্মৃতির বিশ্বাসঘাতকতায় আমাদের মধ্যে সেদিন কি আলোচনা হয়েছিল তার কোনো আভাস দেওয়া গেল না। এইটুকু শুধু মনে আছে আলোচনা অল্পক্ষণের জন্য হয়নি, ঘণ্টাতিনেক কেটেছিল আলোচনা এবং চা, সন্দেশ মিলে!

যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল, যদিও খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় নয়। উপাসনা-মাসিককে কেন্দ্র ক'রেই প্রথম পরিচয় ঘটে, এই কাগজে তিনি নিয়মিত লিখতেন এবং সম্পাদকের তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

একখানা অতি-সংক্ষিপ্ত, অথচ চরিত্রের আর এক দিক প্রকাশক একখানি কার্ড বেশ মজার লাগছে। আমি লেখা চেয়ে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে একখানা জোড়া কার্ড লিখেছিলাম তাঁর বারাকপুরের ঠিকানায়। সংলগ্ন কার্ডখানায় আমি একটু রসিকতা ক'রে, তিনি তাঁর ঠিকানা তারিখ এবং আমাকে সম্বোধন যা লিখতেন সে সব আমিই লিখে দিয়েছিলাম, যাতে তারপর থেকে তাঁর কথা এবং নাম সই করলেই চলবে।

সেই কার্ডের ঐ অবস্থা দেখে বিভূতিবাবুরও মনে রসিকতার প্রবৃত্তি জেগে থাকবে।

বারাকপুর, ৬-৯-৪৫

পরিমলবাবু,

আশ্চর্য কথা। বিশ্বাস করুন একখানা চিঠিও পাইনি। মাইরি বলচি। আপনার চিঠি পেয়ে উত্তর দেব না। আপনি বিশ্বাস করেন? দিন দশেক অপেক্ষা করুন। নিশ্চয় পাঠাবো ···দেবো, আজই লিখছি।···

ইতি—বিভূতি

পরবর্তী চিঠি দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর। পত্রলেখক রূপে দেবীপ্রসাদ খুব মন খোলা।

Devi Prasad Roychoudhury M. B. E.

Principal

Govt. School of Arts & Crafts, Madras

প্রীতিভাজনেষু,

পরিমল বাবু, আপনার চিঠি পেয়ে আনন্দ ও বিস্ময়ের টানা পোড়েনে পড়ে গিয়েছি। "নিজের কথা" পড়ার পরেও আমার প্রতি আকর্ষণ এসে থাকলে বুঝতে হবে হয় আপনি সুস্থ অবস্থায় নেই, নয় আপনি ডাহা ভদ্রলোক, অথবা নিজেকে ঠকিয়েছেন। আমার সৎগুণ যেটুকু আছে তা 'ময়্যালস'-এর চাপে মারা পড়েছে। আব্রুর ভিতরকার বস্তু বাইরে জানতে চাইলে গোপনে কোন দিন সুবিধা খুঁজে নেওয়া যাবে।···কালীর [কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদারের] সঙ্গে আমার যা সম্বন্ধ তা প্রায় নাড়ীর টানের। আমার

ভাই বোন নেই। উভয়ের অভাব ওকে দিয়ে অনেকটা পূর্ণ হয়, সুতরাং বাড়িয়ে-বলা গুণকীর্তনকে প্রশ্রয় দেবেন না।···

এবার দুটো ফুল এবং দুটি লেপার্ড শিকার করেছি। ফুলকে তৃতীয় লেপার্ডের চোখ মনে করে গুলি চালিয়েছিলাম প্রায় ৭০-৮০ ফুট দূর থেকে, রাত তখন বারোটা হবে। পাগলা হাতী মারবার জন্য সরকার সালেম জেলায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। হাতী পাওয়া গেল না, ছোট বাঘ মেরেই ফিরতে হল। ফুল আর লেপার্ড শিকারের গল্প তো ছাপা চলে না।···

···বাঁচার অবলম্বনে বৃহৎ সহায় হৃদয়। ঐ বস্তুটির সহিত মানুষের যদি কোন যোগ না থাকে তা হলে তাকে চালাক বলা চলে কিন্তু মানুষ বলে স্বীকার করা যায় কিনা সন্দেহজনক। যাকে ভাল লাগে তাকে নিঃসঙ্কোচে ভাল বলার বাধা যেখানে উপস্থিত হয় সেখানে বুঝতে হবে ভালকে প্রাণ দিয়ে স্বীকার করা হয়নি।

···চেহারাটা দিনের পর দিন গলদে ভরে উঠছে। নানা পত্রিকায় মুসোলিনি সাহেবের ছবি বার করে তলায় আমার নাম বসিয়ে দিচ্ছে। কয়েক দিন আগেই 'ওরিয়েন্ট' কাগজে এইরূপ একটি যাচ্ছেতাই কাণ্ড দেখলাম। আপনাকে সিটিং দেবার জন্য একটা দিন ছুটিও নিয়ে নিতে পারি।

হরদম ছবি আঁকছি, মূর্তির নতুন কম্‌পোজিশন ধরেছি, কাজটা যদি মনের মত হয় তা হলে দেশকে কিছু দিয়ে যেতে পারব। বড় কাজ আরম্ভ করলেই কালীর [কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদারের] কথা মনে পড়ে। ছেলেটা এমন প্রাণ দিয়ে শিখত যে আমারই ওর ছাত্র হয়ে যাবার ইচ্ছা আসত। আমার যতদূর মনে পড়ে ফাইন্যাল ইয়ার একজামিনেশন-এ ও প্রথম স্থান অধিকার করে কিন্তু ডিপ্‌লোমা আজও নেয়নি। অধিকন্তু আগের বার পরীক্ষাতেই বসল না পাস করার ভয়ে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছেলেকে বিদায় দিতে হয়। এক বৎসর বেশী শেখবার জন্য ইচ্ছে করে ফেল মেরে গেল। কালীর আঁকা ছবি বার হোক, তার সঙ্গে মানুষটাকেও সাধারণের কাছে চিনিয়ে দেওয়া দরকার—ওর জীবন ধারা একটা আদর্শের বস্তু। এ চিঠি আপনি ওকে নিশ্চিন্ত মনে দেখাতে পারেন, ও আমাকে চেনে।

আমরা যা চেষ্টা করছি তা গুণের প্রচার, আধুনিক বীভৎসতার বিরুদ্ধে

অভিযান। আমার কাছে যারা শিখেছে তার মধ্যে কালী, পানিকর, ও সুশীল আসল শিল্পী মনের অধিকারী। কালীকে আমার চিত্র-বিদ্যার পুঁজিপাটা সব দিয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কাছে পেলাম কৈ? মেকানিক্যাল বহু জিনিস, বহু ছবি, কষ্ট করে সংগ্রহ করেছিলাম, সেগুলি আমার মৃত্যুর পর কারো কাজে আসবে না, এটা আমার কাছে খুব আনন্দের বিষয় নয়।

অনেক লিখলাম, আমার প্রাণ ভরা ভালবাসা জানবেন।

ইতি—

গুণমুগ্ধ দেবীপ্রসাদ

দীর্ঘ চিঠিখানার একটি অংশ উদ্ধৃত করলাম। চিঠির মধ্যে আপন ক্ষমতা বিষয়ে সন্দেহহীন প্রত্যয়দৃঢ়তা, শিল্পীজনোচিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং রচনা, এবং সবার উপরে হৃদয়ের স্বীকৃতি আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

সজনীকান্তের মৃত্যুসংবাদ

এই পর্যন্ত লিখে রেখেছিলাম কয়েক দিন আগে। ইতিমধ্যে গত ১১ই ফেব্রুয়ারি পেলাম সজনীকান্তের মৃত্যু সংবাদ। আমি অপরাহ্নে মোতিলাল নেহরু রোডে গিয়েছিলাম এক বন্ধুর বাড়িতে সান্ধ্য নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। রাত ন টার পরে বাড়িতে ফিরেই পেলাম দুঃসংবাদ। আমি দুপুরে কিছু বিশ্রাম করি, এবং আমারও হৃদ্‌যন্ত্রের যৌবন গত হয়েছে, তাই আমার প্রতি বিবেচনাবশত আমাদের প্রিয় বন্ধু শ্রীনির্মলকুমার বসু আমাকে যথাসময়ে সজনীকান্তের মৃত্যু সংবাদ জানাতে নিষেধ করেছিলেন। পরে শ্রীদেবব্রত ভৌমিক যখন আমার বাড়িতে ফোন ক'রে জানান, তখন আমি ছিলাম বালিগঞ্জে। হিমানীশ ফোন ধরেছিল, এবং তখনই চলে গিয়েছিল সেখানে। আমি রাত্রে ফোন ক'রে জানলাম মৃতদেহ বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে।

আমার সমস্ত রাত ঘুম হ'ল না।

সজনীকান্তের যে চিঠিখানা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি, সে চিঠির কথা তাঁর মনে থাকবার কথা নয়, প্রকাশিত হবার পর তিনি দেখবেন এই ছিল আশা।

কিন্তু তা আর হ'ল না। ঐ চিঠির সামান্য কয়েকটি ছত্রকে ঘিরে আছে এক বিরাট ইতিহাস।

সজনীকান্ত ও আমি বহুদিন একত্র বাস করেছি, তাঁর দুঃখের দিনের সকল অবস্থার সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম।—আমি ও তাঁর সুহৃদ এবং নীরব কর্মী প্রবোধ নান। শনিবারের চিঠির সমস্ত ভার তিনি আমার উপরে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তিনি তখন বঙ্গশ্রীর সম্পাদক। আমি বারো আনা ভার ছেড়ে দিয়েছিলাম প্রবোধ নানের উপর। আমি দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর সজনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। বঙ্গশ্রীতেও আমি তাঁকে সাহায্য করেছি, এবং পরে বেতনসহ নিযুক্তও হয়েছিলাম আংশিক সময়ের জন্য। বঙ্গশ্রীর সম্পাদকীয় তিনি, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ও আমি লিখতাম। কখনও সবটাই আমরা লিখতাম সজনীকান্তকে বাদ দিয়ে।

সজনীকান্তের কাজ ছিল গুণী সাহিত্যিক ও শিল্পীকে একত্র করা এবং এ বিষয়ে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল সহজাত। রচনার উৎকর্ষ বিচার তাঁর হাতে যে রকম হ'তে দেখেছি তা আমার কাছে বিস্ময়কর বোধ হয়েছে। গুণী লোককে চিনে নেওয়া শুধু নয়, তাঁকে কাছে ডেকে এনে বন্ধু বানানো ছিল তাঁর একটি মহৎ গুণ।

চরিত্রে অবশ্য একটু বেশি মাত্রায় পরস্পরবিরোধিতা ছিল এবং শিশুসুলভ চাপল্য ছিল খুবই। আর আমার বিশ্বাস ঠিক এই জন্যই সজনীকান্ত একটি চিত্তাকর্ষক চরিত্র ছিলেন। আমার 'সপ্তপঞ্চ' ও 'পথে পথে' বইতে সে সব দিনের কথা আছে।

এঁর সম্পর্কে স্মৃতিচিত্রণে আরও বিস্তারিত বলেছি। আজ এ মুহূর্তে আর কিছু বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না। মাত্র ১৪ দিন আগে ২৮শে জানুয়ারি তারিখে শ্রীসুকমল ঘোষের বাগান-বাড়ির বার্ষিক নিমন্ত্রণে তাঁর সঙ্গে দেখা। অনেক কথা হ'ল। তার আগের বছরের একটি অতি বেদনাদায়ক ঘটনার কথা আলোচিত হ'ল। শনিবারের চিঠির প্রথম যুগের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য সেবারে উপস্থিত ছিলেন। আমি মুভি ক্যামেরায় ছবি তুলছিলাম। সজনীকান্ত তাঁকে কাছে ডাকলেন, একত্র ছবি উঠবে, কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। আমি তাঁর এই রূঢ়তা দেখে কিছু অবাক হয়েছিলাম। যেখানে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত—সেখানে ত্রিশ বছর আগের

সাহিত্য-দ্বন্দ্ব স্মরণ ক'রে তা অস্বীকার করার ব্যাপারটাকে মূঢ়তা ভিন্ন আর কি বলা যায়। এখানে একদিকে দেখলাম উদারতা আর এক দিকে দেখলাম অহেতুক গোঁড়ামি। শনিবারের চিঠির সে যুগে অন্ত যাঁরা আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রবোধকুমার সান্যালের নাম বোধ করি সবচেয়ে উপরে। কিন্তু তাতে দুজনের বন্ধুত্বের বিশেষ হানি হয়নি।

যাই হোক, এ বিষয়ে আলোচনা বৃথা। চরিত্র-বৈচিত্র্য সংসারে থাকবেই।

শিশিরকুমার ভাদুড়ি

কৈলাস বসু স্ট্রীটে থাকতে ১৯৫২ সালে শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে আমার নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হ'ল। তিনি ১৯১৭-১৮ সালে ছিলেন আমার অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর কলেজে। ইংরেজী ভাষাতত্ত্ব পড়েছি তাঁর কাছে। এমন চিত্তাকর্ষক চেহারা, ব্যক্তিত্ব, এবং পড়াবার ভঙ্গি—আমার সেই দিনের তরুণ মনে যে ছাপ এঁকেছিল তা যেমন মধুর তেমনি গভীর।

তারপর মুগ্ধ হ'য়ে দেখেছি তাঁর সীতা অভিনয়। তাঁর যত অভিনয় সবই দেখেছি, কিন্তু প্রথমে সীতা দেখে মনে যেমন উন্মাদনা জেগেছিল তেমন আর কিছুতে হয়নি। থিয়েটার দেখা আমার ছিল একটা নেশা। স্টার, মিনার্ভা, মনোমোহন, অ্যা ফ্রেড, নাট্যমন্দির— কোনোটাই বাদ ছিল না। দৃশ্যপটের ম্যাজিক থেকে আরম্ভ ক'রে শিশিরকুমারের আধুনিক রুচিসঙ্গত দৃশ্যপরিবেশ— এক এক যুগে এক একটায় মুগ্ধ হয়েছি। ১৯১০ সালে এর আরম্ভ, কিন্তু ১৯২১ থেকে নিয়মিত দেখেছি।

বিদ্যাসাগর হস্টেলে থাকতে শিশিরকুমারের অভিনয় শিক্ষা দেখেছিলাম, কিন্তু তাঁর নিজের অভিনয় আগে দেখেছি সীতাতে। একুশ-বিশনের সীতা দেখি নি। নাট্যমন্দিরে যে েশ চৌধুরীর সীতা দেখে সম্পূর্ণ নতুন একটি আনন্দের স্বাদ পেয়েছিলাম। অভিনয় দেখে অভিভূত হওয়া আমার এই প্রথম। অভিনয় শেষে মনে হয়েছিল হঠাৎ যেন কোন্ এক আদিযুগের গভীরতম আনন্দবেদনার স্বপ্ন-স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে কলকাতার কঠিন রাজ-পথের পাথরের উপর পতন। কোন্টা সত্য? সীতার পাতাল প্রবেশের

আকস্মিকতায় আহত বিভ্রান্ত রামচন্দ্রের আর্তনাদ, না ট্রাম-ঘোড়াগাড়ি ফেরিওয়ালা? সেটি অবশ্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা গেল আসন্ন গাড়িচাপা পড়ার হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ?

প্রথম দিন সীতা অভিনয় দেখে আগের দেখা সকল নাটকের স্মৃতি যেন মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেল। রামচন্দ্র 'সীতা সীতা' ব'লে আর্তনাদ করেছিলেন, দ্বিধাবিভক্ত বধির ধরণীর বুকে আপন কণ্ঠের পুষ্পমাল্য ছিন্নভিন্ন ক'রে নিক্ষেপ করেছিলেন, তার বেদনা মনের মধ্যে গভীর আলোড়ন তুলল। এক একটি দৃশ্য ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের মতো মনের মধ্যে ঝলকিত হয়ে উঠেছিল, মনে হচ্ছিল এমন জিনিস তো পূর্বে কোনোদিন দেখিনি। এমন যে হ'তে পারে তারও কল্পনা করিনি কোনোদিন। বহুযুগের ওপার হতে বহুদিনের ভুলে যাওয়া অতীত যেন সত্যই জীবন্ত হয়ে উঠে আবার কোথায় মিলিয়ে গেল। এমন বেদনার্ত হয়ে উঠল মনটা। একটা অতি দুর্দাম আকর্ষণ অনুভব করছিলাম 'সীতা'র প্রতি। আবার কখন দেখতে পাব সেই শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

বার বার দেখলাম। প্রতিদিন নতুন ক'রে ভাল লাগল। নাটকের কথা-অংশ অতি সামান্য এবং তুচ্ছ, এবং ও রকম ভাষা যদি প্রথমে বইতে পড়তাম তা হ'লে মনে অবশ্য বিতৃষ্ণা জাগত। যেমন একটি ধূলোর কণা দেখে লাগে। কিন্তু সেই কণা ঝিনুকের মধ্যে যখন মুক্তা হয়ে ফুটে ওঠে স্তরের পর স্তরের প্রলেপে, তখন সেই ধূলিকণার সন্ধান কে রাখে? সীতাও তেমনি তুচ্ছ অবলম্বন পেয়ে নিটোল মুক্তা রূপে ফুটে উঠেছিল। একটিমাত্র মানুষের শতমুখী পরিকল্পনায় শত বর্ণে রঞ্জিত একখানা ছবি। এর বিষয়টাই এমন যে, এর জন্য দর্শককে নতুন ক'রে প্রস্তুত করতে হয়নি, কিন্তু এর প্রকাশ সম্পূর্ণ নতুন এবং যার জন্য দর্শকের পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। আর এই জন্য এর অনাস্বাদিতপূর্ব রসসৌন্দর্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটি আঘাত ছিল। সে আঘাত বিভ্রান্ত করেছিল, অভিভূত করেছিল। অপ্রত্যাশিত আনন্দ এমনি ভাবে প্রথমে আঘাতের ভিতর দিয়েই হৃদয়ে প্রবেশ করতে চায়। এমন আনন্দে চিন্তাশক্তি মূর্ছিত হয়। এ আনন্দের ভিতর দিয়ে বার বার উত্তীর্ণ হলে তবে সে মূর্ছা ভাঙে।

শিশুকাল থেকে রামায়ণে রাম ও সীতার দুঃখ আমাদের মনকে ভ'রে

রেখেছে। রামায়ণের চরিত্র, তার পরিবেশ, তার কাহিনী, তখন থেকেই সবার মনে একটা বিশেষ ছাপ এঁকে দিয়েছে। এবং সবকিছুকে ছাপিয়ে শিশুমনকে আচ্ছন্ন করেছে রাম ও সীতার ট্র্যাজিডি। হয় তো বা শিশুকালে হনুমানের ল্যাজের দিকে, বা রাবণের দশটি মাথার দিকে, অথবা কুম্ভকর্ণের ঘুমের দিকে কৌতূহলটা বেশি থাকে, এবং হনুমান ল্যাজের আগুনে লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়েছে ব'লে তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভ'রে ওঠে, কিন্তু তবু আমার মনে হয় সেই সব সত্ত্বেও শিশুহৃদয় রাম ও সীতার দুঃখকে বেশি সত্য ব'লে মানে। এবং রামায়ণের প্রতি তার আকর্ষণের প্রকৃত কারণ সেটাই। মনের স্তরে এই বেদনা আমাদের প্রত্যেকেরই জমা হয়ে আছে, তাই 'সীতা' অভিনয়ের অভিনবত্ব সেই দুঃখকেই আবার বাইরে টেনে আনল।

বলেছি দর্শকদের মুখে কোনো কথা ছিল না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল একটি ঘটনা। একদিন বনফুলের সঙ্গে সীতা দেখছিলাম। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে গভীর নীরবতা, অভিনয় চলেছে, এমন সময় পিছনে দু-একজন ছোকরা কি যেন মন্তব্য করতে শুরু করল। বনফুল তা শুনে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, মশায় আত্মদর্শনে যান, এখনও টিকিট পাবেন। তাতে ফল হয়েছিল। মিনার্ভায় তখন 'আত্মদর্শন' চলছিল।

'সীতা'র পরিকল্পনা ছিল আমার কল্পনার বাইরে। অধ্যাপক শিশির-কুমারকে আপাতত ভুলে গেলাম, তবে গর্বেরও কারণ হ'যে রইল সেটি, কেন সে কথা বলা বাহুল্য।

সীতা নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শিশিরকুমারের যে শিল্পীজনোচিত মনোযোগ এবং সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া গেল তা যে-কোনো দেশের পক্ষেই গর্বের বিষয়। দূর অতীতকে রূপায়িত করা হচ্ছে, সেজন্য দর্শককে প্রস্তুত করার কৌশলটিও চমকপ্রদ। যেন কোনো রহস্যময়ী মায়াবিনী, ঘননীল আলোকাবরণের ভিতর থেকে অস্পষ্ট অবয়বে, অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে অতীত-উদ্বোধক মন্ত্র উচ্চারণ করছে। খুব ধীর মধুর সুরে গাওয়া সেই

"কথা কও কথা কও"

নামক রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের উদ্বোধনী কবিতাটির অংশ থেকেই অভিনবত্বের চমকপ্রদ সূচনা। একই সঙ্গে সুন্দর একটি সেন্টিমেন্ট, নাটকের প্রবেশ দ্বার খোলার চাবিকাঠি এবং উচ্চ রুচির পরিচয়,

দর্শককে আনন্দে উচ্ছল ক'রে তুলেছিল। দর্শক নীরব, শেষ দৃশ্য পর্যন্ত তার মুখে আর কোনো কথা নেই—তার মন রামের মর্মভেদী বেদনায়, সীতার ধীর স্থির চিত্তে দুর্ভাগ্যবরণের বেদনায়, অভিভূত। সে বেদনায় সমস্ত ভুবন তখন আচ্ছন্ন, সে বেদনায় সমুদ্রের উচ্ছ্বাস, তার অতল গভীরতার মর্মস্থলে, মর্মবেদনাজাত এক অনির্বচনীয় আনন্দ। এর তুলনা হয় না।

আবহ গঠনে যেখানে যত গুণী ছিলেন সবাইকে ডাকা হয়েছিল। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র রায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, নৃপেন্দ্র মজুমদার—প্রভৃতি গুণিগণ কেউ বা নেপথ্যে পরামর্শ দিয়ে, কেউ বা সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রে, কেউ বা মঞ্চে প্রকাশিত হয়ে, সীতাকে সর্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুললেন। হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখলেন গান ও দিলেন নৃত্য-পরিকল্পনা, কৃষ্ণচন্দ্র দে গাইলেন আবহ গীতি, নৃপেন্দ্র মজুমদার বাজালেন ক্লারিওনেট। কৃষ্ণচন্দ্রের কণ্ঠে 'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে' গানটি যেন সমস্ত 'সীতা' ট্র্যাজিডির সঙ্গীতরূপ। অভিনয় পরিকল্পনা এবং মঞ্চে শিল্পী সমাবেশ, এবং তাঁদের সবাক অভিনয় শুধু নয়, নির্বাক অভিনয়ের অভিনবত্বও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলার রঙ্গমঞ্চে এ কল্পনা পূর্বে কেউ করেননি।

শিশিরকুমার বাংলাদেশকে যা দিলেন তা তাঁর সঙ্গেই চলে গেছে, তা আর ফিরে আসবে না। কিন্তু তাঁর সেই প্রথম যুগে তিনি যে শুধু অভিনয়, অভিনয় শিক্ষা, এবং নাট্য প্রয়োগ ক্ষমতার আশ্চর্য দৃষ্টান্তে বাংলাদেশের হৃদয় হরণ করেছিলেন এ কথাটা এ দেশের নাট্য ইতিহাসেই শুধু থেকে যাবে, আর কোথাও তার কোনো চিহ্ন থাকবে না, এ ভাগ্য আগের যুগের সকল অভিনয়শিল্পীর।

সেদিন বাংলার বিখ্যাত সকল কবি শিল্পী সাহিত্যিক তাঁর অভিনয়ে যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তার কিছু সংকলন হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার" নামক গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যাবে। এ বইটি অত্যন্ত মূল্যমান সেজন্য, শুধু বহু স্থলে তারিখহীনতার ত্রুটি দুঃখের কারণ ঘটিয়েছে। তবু এই বইতে অন্যান্য অভিনন্দনের সঙ্গে তৎকালীন কলেজের ছাত্র অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের যে কবিতাটি সংকলিত হয়েছে তা পড়লে হঠাৎ

সে যুগের সীতা অভিনয়ের সমস্ত ছবিটি আবার মনে জেগে ওঠে। কবিতাটি হৃদয় দিয়ে লেখা—হৃদয় স্পর্শ করে।

দীর্ঘ দুই বাহু মেলি আর্তকণ্ঠে ডাক দিলে
সীতা সীতা সীতা
পলাতকা গোধূলি প্রিয়ারে
বিরহের অস্তাচলে তীর্থযাত্রী চলে গেল ধরিত্রী দুহিতা
অন্তহীন মৌন অন্ধকারে।
যে কান্না কেঁদেছে যক্ষ কলকণ্ঠা
শিপ্রা-বেবা-বেত্রবতী-তীরে
তারে তুমি দিয়েছ যে ভাষা :
নিখিলের সঙ্গীহীন যত দুঃখী খুঁজে ফেরে বৃথা প্রেয়সীরে
তব কণ্ঠে তাদের পিপাসা।
এ বিশ্বের মর্মব্যথা উচ্ছ্বসিছে
ওই তব উদার ক্রন্দনে
ঘুচে গেছে কালের বন্ধন ;
তারে ডাকো—ডাকো তারে—যে প্রেয়সী
যুগে যুগে চঞ্চল চরণে
ফেলে যায় ব্যগ্র আলিঙ্গন।
দনার বেদ মন্ত্রে বিরহের স্বর্গ লোক
করিলে সৃজন
আদি নাই, নাই তার সীমা।
তুমি শুধু নট নহ, তুমি কবি,
বক্ষে তব প্রত্যুষ স্বপন
চিত্তে তব ধ্যানের মহিমা।

এই আশ্চর্য সুন্দর স্মৃতি জাগানিয়া কবিতাটির জন্য কবি অচিন্ত্যকুমারকে অভিনন্দন জানাই।

শিশিরকুমার ভাদুড়ির সীতার কথা বলেছি—তাঁর অভিনয় সম্পর্কে অতিরিক্ত বলা বৃথা। এ যুগের যাঁরা তাঁর প্রথম যুগের অভিনয় দেখেননি, তাঁর প্রয়োগকুশলতা দেখেননি, তাঁদের কাছে শুধু বর্ণনায় তার সামগ্রিক সৌন্দর্যের কিছুই বোঝানো যাবে না। তাঁর শেষ বয়সে অথবা অভিনয়-জীবনের শেষ পর্যায়ে সীতার অভিনয় অনেকবার হয়েছে শুনেছি, কিন্তু আমি দেখিনি। ইচ্ছে করেই দেখিনি। তবে ৩৫ বছরের অভিনয়-প্রসিদ্ধ আলমগীরে (এবং রঘুবীরে) পূর্ব অভিনয়ের সমস্ত সৌন্দর্যই তিনি বজায় রাখতে পেরেছিলেন। তখত-এ-তাউসে জাহান্দার খাঁর ভূমিকাতেও তাঁর প্রতিভা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। তবে অনুজ্জ্বল পরিবেশে সামগ্রিক প্রকাশ-রূপটি নিষ্প্রভ বোধ হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আলমগীরের ভূমিকা শেষ পর্যন্ত বার বার দেখবার মতো ছিল।

অভিনয়ে গুরুগিরি করবার ক্ষমতা তাঁর অক্ষুণ্ণ ছিল, এবং উৎসাহ ছিল অদম্য। এ সব তার অভিনয় শিক্ষা দেবার আসরে বসে ব'সে প্রত্যক্ষ করেছি।

বন্ধু বিনয়কৃষ্ণ দত্তের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। (বিনয়কৃষ্ণের কথা স্মৃতিচিত্রণে অনেকখানি বলা হয়েছে) বিনয় সমস্ত জীবন তাই পরার্থে উৎসর্গ করেছে। বিরাট লাইব্রেরির মাঝখানে নিষ্ঠাবান পাঠকরূপে তার সাধনা। এই হ'ল তার ইনডোরের পরিচয়। আউটডোরে বিনয় হাজার হাজার টাকা এবং লাইব্রেরির শত শত বই অন্যকে বিলিয়েছে। অন্যের ব্যবসায়ের প্ল্যান গ্রা, এবং নিজের সামর্থ্য এবং টাকা ফ্রী। এখন সম্পদের প্রায় শেষ প্রান্তে উপস্থিত।

এমনি অবস্থায় শিশিরকুমারের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটল। এবং তখনও বাজারে তার এমন ক্রেডিট যে শুভকাজে অগ্রণী আদর্শবাদী ধনী বন্ধুরা বিনয়ের কথায় শিশিরকুমারের প্ল্যান-সাফল্যে টাকা দিতে রাজি। টাকা তোলবার সফল পরিকল্পনাও বিনয়ের অনেক ছিল, এবং শিশিরকুমারের তা মনে ধরেছিল।

শিক্ষিত অভিনয়-উৎসাহী যুবক-যুবতীদের একত্র করা হ'ল। ঠিক হ'ল

'তপতী' নাটক মঞ্চস্থ করা হবে তাদের সহযোগিতায়। শ্রীরঙ্গম মঞ্চে রিহার্সালের আয়োজন হয়েছিল। আমি সময় পেলেই সেই আসরে উপস্থিত হয়েছি এবং নবাগতদের শেখানোর কৌশল দেখেছি। তাঁদের ভুল উচ্চারণে বিরক্ত না হওয়া, এবং ঠিক কোন্ জিনিসটি হ'লে তাঁর মনের মতো হবে তা বার বার অক্লান্ত পরিশ্রমে বুঝিয়ে দেবার অনন্যসাধারণ আগ্রহ এবং ধৈর্য দেখে অবাক হয়েছি। যে বয়সে সাধারণতঃ লোকে অল্প পরিশ্রমে কাতর হয়, সেই বয়সে এ রকম শ্রমনিষ্ঠা দুর্লভ ব'লে মনে হয়েছে।

শিশিরকুমার আমার শিক্ষক ছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজে। তারপর বহুকাল পরে তিনি যখন স্বাস্থ্যের খাতিরে উত্তেজক পানীয় ব্যবহার পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন, যখন কৃত্রিম উত্তেজনার আর প্রয়োজন নেই, তখনই তিনি গভীর পড়াশোনার মধ্যে এবং বন্ধু সন্ধান ক'রে তাদের সাহচর্যের মধ্যে ডুবে থাকতে আরম্ভ করলেন। এমনি অবস্থায় আমার সঙ্গে পুনঃ পরিচয় হ'ল, এবং আমি তখনই তাঁর বন্ধুত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত হলাম। সেটি ১৯৫১ সাল। তার পূর্বে ছ-সাত বছর তিনি উত্তেজক কিছু স্পর্শ করেননি। একদিন আমার ব্যবহারের একটি টনিক দেখে কৌতূহল বশতঃ জিজ্ঞাসা করলেন, "ওর নাম তো দেখছি এস্ কে বি। তার মানে শিশিরকুমার ভাদুড়ি। ওতে কি আছে?" ভাইটামিন ইত্যাদির সঙ্গে শতকরা পাঁচ অ্যালকোহল আছে শুনেই চমকে উঠলেন। বললেন, "এক পারসেণ্ট থাকলেও আমার চলবে না।"

আমার মনে হয় অত্যধিক সুরা পানে তাঁর দেহে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যাতে দেহটি সম্পূর্ণ অ্যালকোহল-বিরোধী হয়ে পড়েছিল। শুনেছি তাঁর সুরাপান মাত্রা ছাড়িয়েছিল এক কালে। এবং তাতে তাঁর ক্ষতিও হয়েছে অনেক। শরৎচন্দ্র পণ্ডিত সে সময় কোনো বন্ধুর মুখে শিশির ভাদুড়ি নাম উচ্চারণ শুনে হেসে বলেছিলেন, নাম তো শিশির ভাদুড়ি নয়, বোতলের ভাদুড়ি। 'শিশি'-র অর্থে শিশির উচ্চারণ করেছিলেন।

অতএব আমার সঙ্গে যখন নতুন পরিচয় হ'ল তখন তাঁকে আবার সেই অধ্যাপক রূপেই দেখলাম, শুধু বয়সে চেহারার সামান্য পার্থক্য চোখে পড়ল। সম্ভবতঃ মাঝখানে তাঁর অনেক অভিনয় দেখেছি বলেই চেহারার বহু পরিবর্তনটা আমার চোখে পড়েনি। অধ্যাপক রূপে তাঁর সুমার্জিত ব্যবহার, পোষাক, বাচনভঙ্গি এবং উচ্চারণ আমার মনে স্থায়ী চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল।

তিনি তখন অনেকটা দূরে ছিলেন, তাঁর সান্নিধ্য অত্যন্ত লোভনীয় মনে হ'ত। তার পর থিয়েটারে আত্মপ্রকাশের পর তিনি সম্পূর্ণ দূরে স'রে গিয়েছিলেন। সে সময়ে যদিও কদাচিৎ তাঁর সঙ্গে দু' একটা কথা হয়েছে, কিন্তু তা এমনই হঠাৎ এবং পরিকল্পনা-বর্জিত যে, তাকে কোনো মতেই আলাপ বলা চলে না। তার পর কলেজের ঘর থেকে দীর্ঘ চল্লিশ বছর পার হয়ে তিনি এলেন আমার ছোট্ট ঘরখানিতে। এবং এসেই ঘনিষ্ঠ ভাবে, অন্তরঙ্গ ভাবে, এবং আত্মীয় ভাবে মিশলেন।

তাঁর সহৃদয়তা আন্তরিক ছিল, কারণ এদিকে তাঁর হৃদয় ছিল অত্যন্ত প্রকাণ্ড। আর একটি বিষয় আমি স্পষ্ট দেখেছি তাঁর চরিত্রে। সে হচ্ছে তাঁর ভ্রাতৃপ্রেম। তিনি এদিক দিয়ে রামের ভূমিকা শুধু মঞ্চেই অভিনয় করেননি, জীবনেও সে আদর্শ অনুসরণ করেছেন। যেখানে তাঁব যত আত্মীয়, সেখানেই ছিল তাঁর নাড়ির টান। তাঁর নিজের জীবনে সীতা-হারার দুঃখও বিঁধে ছিল।

শিশিরকুমার সম্পর্কে অনেক কথাই মনে পড়ে। আরও কিছু বলি।

সেদিন শনিবার, ১৯৫৫—২রা এপ্রিল। আমার কাছে সদ্য এম. এ. পাস দুটি তরুণী এসেছিল তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। তখন সকাল সাড়ে নটা। আলাপ চলছিল তাদের সঙ্গে। প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে, এমন সময় শিশিরকুমার ভাদুড়ি প্রবেশ করলেন আমার ঘরে। গত ৫১ সাল থেকে সপ্তাহে তিন চার দিন প্রায় নিয়মিত আসছিলেন এবং ১৯৫৫ পর্যন্ত সে আসা প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল।

উপস্থিত দুটি তরুণীকে অগ্রাহ্য ক'রে শিশিরকুমার আমার সঙ্গে তাঁর অভ্যস্ত রীতিতে নানা বিষয়ে আলাপ করতে আবস্ত কবলেন। তার মধ্যে থিয়েটার, ইংরেজী সাহিত্য, আরো কত বিষয়ে। কোনো একটি বিষয় বেশিক্ষণ বলতেন না, বিশেষ উত্তেজিত না হ'লে। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রায় তিন চার মিনিট পর পর বিষয় বদল হয়ে যেত বক্তার অজ্ঞাতসারেই।

প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেছে—অতিথি দুজন উসখুশ করছিল। আমার মনে হ'ল কিছু বলবার সুযোগ না পেয়েই হয়তো, কারণ মেয়েরা বেশিক্ষণ চুপ ক'রে থাকতে পারে না। তাদের অবস্থা দেখে আমি একটু চিন্তিত বোধ করছিলাম সত্যিই। কারণ শিশিরকুমারের আলোচ্য বিষয়ের কোনোটাই

নীরস ছিল না, এবং শুধু তাই নয়, অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল, এবং এক থেকে আর এক বিষয়ে যাওয়ার মধ্যেই ছিল তার আকর্ষণ।

আমার মনে হঠাৎ একটা সন্দেহ জাগল। আমি তরুণী দুটিকে সোজা ব'লে বসলাম "এঁকে তোমরা নিশ্চয় চেন।"

বুঝলাম আমার সন্দেহ অমূলক ছিল না। মেয়ে দুটি অসহায় ভাবে আমার দিকে চেয়ে রইল।

একজন অপরাধীর মতো কাঁপা গলায় বলল, "না তো।"

বললাম, "এঁর নাম শিশিরকুমার ভাদুড়ি।"

দুজনেই তৎক্ষণাৎ তাকে প্রণাম করল। সম্ভবত ভাবল, না-চেনার কিছু প্রায়শ্চিত্ত অন্তত হল।

সেই মুহূর্তে যুগের পরিবর্তনটা সহসা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। ওদের দোষ নেই। তবু মনে হয়েছিল, এমন ব্যক্তিত্বের পরিচয় তো সহজে মেলে না, এমন সহজ মধুর কণ্ঠ, এমন দৃঢ়প্রত্যয়যুক্ত মতপ্রকাশ এবং প্রসঙ্গটা প্রধানত ছিল নাটক ও নাট্যসাহিত্য বিষয়ে। অতএব ওদের মনে অন্তত একটা ক্ষীণ সন্দেহও জাগা উচিত ছিল।

কিন্তু এ আমার নিতান্তই দুরাশা। ওদের সন্দেহ জাগেনি কারণ জীবিত থাকতেই শিশিরকুমার আধুনিকতম যুগের কাছে ছিলেন একটি আইডিয়া, একটি কিংবদন্তী অথবা একটি স্পর্শাতীত সুদূর এবং সুদুর্লভ ব্যক্তিত্ব মাত্র, কোনো ব্যক্তি নয়। তাই আমার মনে হ'ল এরা যদি বা এঁর অভিনয় দেখে থাকে, তবে এঁকে আলমগীর অথবা মাইকেল অথবা চাণক্য রূপে দেখেছে, তাই আমার ভাড়াঘরে এত কাছের একজন বিরলকেশ মানুষকে শিশিরকুমার ভাদুড়ি রূপে কল্পনা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

কিন্তু আমার এ ধারণাও ঠিক নয়।

কারণ তারা পরিচয় পাবার পর মন্ত্রমুগ্ধবৎ ব'সে রইল, উঠে যাবার ক্ষমতা আর তাদের রইল না। আরো আধঘণ্টা পরে শিশিরকুমার উঠে গেলেন। আমি ওদের প্রশ্ন করলাম "তোমরা কি এঁর অভিনয় দেখনি?"

ওরা দুজনেই বলল, "না।"

নতুন কালের আর একটা যবনিকা উঠে গেল আমার সামনে থেকে। ওরা শিশিরকুমারের অভিনয় দেখেনি! ওদের জন্মের আগে থেকে শিশির-

কুমার অভিনয় ক'রে আসছেন, সেদিনও অভিনয় করবেন। এক আলমগীরের অভিনয়ই তো তখন ৩৫ বছর চলছে। এতদিনে একবারও ওদেব মনে হয়নি শিশিরকুমারের অভিনয় দেখার কথা।

এরা কি আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েদের প্রতিনিধি ?

কিন্তু তাতে দোষের কিছু নেই। অবশ্য ওরা ভুল করেই লজ্জিত হয়েছিল, শিশিরকুমাব লজ্জিত হন নি।

তিনি জানতেন।

দেশ যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তাতে রুচি বদল অনিবার্য, এ কথা যে-কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তির মনেই স্পষ্ট। তাঁব দুঃখ ছিল শুধু এই যে, আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষিতেরা থিয়েটাব বিষয়ে কৌতূহলী নয়। তিনি সব সময়েই বলতেন থিয়েটাব হচ্ছে একটা জাতের দর্পণ—মিরার। জাতকে চেনা যায় তাব থিয়েটারের উৎকর্ষ দেখে, থিয়েটার সম্পর্কে তার আকর্ষণ দেখে। সংস্কৃতির যতগুলো অঙ্গ আছে তার মধ্যে এটি একটি প্রধান অঙ্গ। অভিনয় উৎকর্ষ লাভ করতে হ'লে অভিনয়-শিল্পীদেব বিশেষ শিক্ষা পেতে হবে, শুধু natural aptitude থাকলেই যথেষ্ট নয। একেই বলা চলে অশিক্ষিত পটুতা, এতে বেশিদূর এগোন যায় না।

১৯৫২ সালের ২৯শে নবেম্বর তিনি একদিন বিস্তারিত ভাবে এ বিষয়ে আলাপ কবেছিলেন। রয়্যাল অ্যাকাডেমিব প্রস্পেক্টাস দেখিয়েছিলেন আমাকে। সহজ পটুত্বের কথা হচ্ছিল। অভিনয ব্যাপাবটি নিঃসন্দেহে একটি আর্ট, এবং এই আর্ট সম্পর্ক যার সহজ পটুত্ব আছে, সেই এতে কৃতিত্ব দেখাতে পারে, কিন্তু সে কৃতিত্ব অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সভ্যজগতে অভিনয় শিল্পী হ'তে হ'লে শিল্পীকে এ সম্পর্কিত অনেক কিছু জানতে হয়, জ্ঞান বাদ দিয়ে শুধু অভ্যাস নয়। রয়্যাল অ্যাকাডেমির প্রসপেক্টাসে এই জ্ঞানের আয়োজন যা দেখা গেল তার দশ ভাগের এক ভাগও কি এ দেশে করা সম্ভব ? এই প্রশ্নই উঠেছিল একদিন। কারণ এ শিক্ষা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. শিক্ষার সমপর্যায়ের, কিংবা তারও বেশি।

শিশিরকুমার আমার কাছে একদিন (১৬-১-৫২) বললেন, একটা কমিটি গঠন করতে হবে, তার উদ্দেশ্য হবে বাংলা দেশে নাটক ও নাট্যাভিনয় মিলিয়ে থিয়েটারের উন্নতিসাধন। তাঁর এই পরিকল্পনায় অস্পষ্টতা ছিল না

কিছু। বললেন, এর দুজন পৃষ্ঠপোষক থাকবেন, একজন থাকবেন প্রেসিডেন্ট ও একশ জন অ্যাসোসিয়েট মেম্বার। এঁরা সমস্ত বাংলাদেশব্যাপী বক্তৃতার ব্যবস্থা করবেন, শিক্ষায়তন এবং লাইব্রেরি গড়বেন। বাংলা উচ্চারণ শেখার বিশেষ ব্যবস্থা তার অন্তর্ভুক্ত হবে, মোটকথা আদর্শটা হবে প্রায় রয়্যাল অ্যাকাডেমির। যেদিন এই আলোচনা হয় সেদিন হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সহকারী সম্পাদক সরোজ আচার্যকে আগেই ডাকা হয়েছিল। এ রকম আয়োজন সম্ভব হ'লে খবরের কাগজের তরফ থেকে যথাসম্ভব সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সরোজ। কিন্তু আয়োজন হ'ল কোথায়?

মনে রাখতে হবে শিশিরকুমার শিক্ষকতা করেছেন কয়েক বছর, এবং বি-এ ইংরেজী সাহিত্য এবং ভাষাতত্ত্বও পড়াতেন। তাই সাহিত্য ও ভাষার প্রতি তাঁর মমত্ব এবং শিক্ষা-প্রচার বাসনা ছিল তাঁর মজ্জাগত। আরো বড় কথা, আমি কয়েক বছর ধ'রে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর সঙ্গে মিশে একটি জিনিস লক্ষ করেছি যে, তিনি কি পড়তে হবে, কেমন ক'রে আবৃত্তি ও উচ্চারণ করতে হবে, এবং কেমন ক'রে অভিনয় করতে হবে, যারা অভিনয় শিখতে চায় তাদের এ সব শেখানোর জন্য এক এক সময় ছটফট করতেন। পড়াশোনা করার কি অপরিসীম আগ্রহ। বিশেষ ক'রে নাট্য-সাহিত্য। বলতেন, "শিক্ষার কোথায়ও শেষ নেই, জীবন ফুরিয়ে এলো, তাই এখন একটা দিনকে টেনে দুটি দিনের সমান লম্বা করি রাত জেগে। অনেক সময় সমস্ত রাতই বই প'ড়ে কাটাই।"

এজন্য তিনি বই কিনতেন এবং আমার কাছ থেকে আধুনিক কালের যা কিছু বই পেতেন, তাও পড়তেন। স্মৃতিশক্তি নষ্ট হচ্ছে এজন্য বড়ই দুঃখ করতেন। অথচ কোথায় যে নষ্ট হয়েছে তা বোঝা যেত না, আমাকে একদিন বললেন, "জানো, পাছে ভুলে যাই, এজন্য মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য আর যোগেশ চৌধুরীকে অনেক সময় তোয়াজ ক'রে কাছে বসিয়ে আবৃত্তি করতাম এবং এইভাবে মুখস্থ করা জিনিস মন থেকে স'রে যেতে দিতাম না। কেউ না থাকলে একা আবৃত্তি করতাম।"

বই পড়ার নেশা ক্রমেই তাঁর উগ্র হয়ে উঠেছিল, এবং ১৯৫৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাঁকে আমি খুব বেশি বেশি বই পড়তে দেখেছি। একদিন বেশ একটা যোগাযোগ ঘটে গেল। বিখ্যাত গ্রন্থব্যবসায়ী রূপা অ্যাণ্ড কো-এর

শ্রীডি. মেহরা আমার কাছে প্রস্তাব করলেন তিনি ও তাঁর বন্ধু শ্রীসিংহকে শিশিরকুমারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। ব্যবস্থা সহজেই হয়ে গেল। আমরা ২৫-৪-৫৩, শনিবার অপরাহ্ণে শ্রীরঙ্গমে গিয়ে পৌঁছলাম। দেখলাম শ্রীমেহরা শ্রদ্ধাপ্রণামী স্বরূপ অনেকগুলো নাট্যবিষয়ক ইংরেজী বই শিশির-কুমারকে উপহার দিলেন। শ্রীমেহরা যে এ রকম একটি সাধু সঙ্কল্প করেছিলেন, তা আমি আগে জানতাম না। শিশিরকুমার বই পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন। আমার কাছেও এ ব্যাপারটি বড়ই প্রীতিপ্রদ মনে হয়েছিল, কেননা শ্রীমেহরা কোনো স্বার্থের জন্য নয়, শুধু একজন মহৎ শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাতেই গিয়েছিলেন।

নাট্যকলা শিক্ষার কথা শিশিরকুমার অনেক বারই আলোচনা করেছেন, কিন্তু কেমন ক'রে যে তা সম্ভব তার কোনো মীমাংসা হয় নি। বলতেন এ কাজ সরকারের, কিন্তু সরকারের এর কোনো বিভাগে প্রভাব বিস্তারের তিনি বিরোধী ছিলেন।

একদিন সাধারণ শিল্পীদের সম্পর্কে বললেন. "এদের সবচেয়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে দর্শকের কাছ থেকে হাততালি পাওয়া। এরা ইন্‌সিন্‌সিয়ার, হাততালি পাওয়ার চেয়েও বড় জিনিস হচ্ছে অভিনয়ে আন্তরিকতা। আমি জানি দর্শকেরা কোন্ জায়গায় হাততালি দেবে, সে জন্য আমি আগে থাকতে সেখানে নাটকীয়ত্ব খুব কমিয়ে ফেলি, সে মুহূর্তটা পার হয়ে গেলে তবে তাদের খেয়াল হয়। সব জায়গায় তা অবশ্য পারা যায় না। কিন্তু আমি চেষ্টা করি, কারণ হাততালিতে আমি বিরক্ত হই, অভিনয়ের কথাগুলো ঐ শব্দে ডুবে যায়, বড় অস্বস্তি বোধ হয়।"

এ সব বলেছিলেন ১৩-১-৫২ তারিখে। এর প্রায় দশ মাস পরে ২৬-১১-৫২ তারিখে, তাঁর সম্প্রদায়কে বর্ধমানে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে এমন কথা বলেছিলেন। (সম্ভবত প্রস্তাব এসেছিল, গিয়েছিলেন কি না আমায় খেয়াল নেই, হয়তো যাননি।) কিন্তু এই প্রসঙ্গের পরেই দুঃখের সঙ্গে বলতে লাগলেন, 'রমা' (পল্লী সমাজ) নাটকের বিক্রি প'ড়ে গেল কেন তা তিনি বুঝতে পারছেন না। তিনি কি তবে তাঁর অভিনয় ভঙ্গি বদলাবেন? তবে কি তিনি হাততালি পাবার জন্য চেঁচিয়ে অভিনয় করবেন? বললেন

মাইকেলের মুখের ইংরেজী আবৃত্তিও হয়তো দর্শকেরা পছন্দ করে না, অথবা নিমচাঁদের মুখের।

কিন্তু এ সবই তাঁর সরব চিন্তা, গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নয়।

একদিন (৷-১-৫২) আমাকে টমাস হার্ডির ডাইনাস্টস বইখানা পড়তে দিলেন বিশেষ অনুবোধ জানিয়ে। আরো অনেক বই দিয়েছেন, কিন্তু আমি বিশেষভাবে এই বইখানার কথা উল্লেখ করছি, কেননা এমন অদ্ভুত আঙ্গিকে লেখা এই এপিক-নাটকখানি তিনি যত্ন ক'রে পড়েছিলেন এবং এ বই তিনি পছন্দ করেছিলেন।

আর একদিন একখানা ইংরেজী বই কিনে আমাকে উপহার দিয়েছিলেন, সেই স্মৃতিটি আমার প্রতি তাঁর অসীম স্নেহের একটি স্বাক্ষরিত প্রমাণ। এ বইয়ের কথা পরে বলছি।

তাঁর সঙ্গে যত বিষয়েই আলোচনা হোক, থিয়েটার সম্পর্কে আলোচনাই তার মধ্যে সবচেয়ে ছিল প্রধান, তার পরেই সাহিত্য, তারপর অন্য সব। রাজনীতিও আলোচনা হ'ত কিন্তু সেটি ছিল তার ব্যক্তিগত নীতি, এ বিষয়ে তাঁর কিছু নিক্ত ধারণা ছিল, এবং সেখানে অনেক ক্ষেত্রে মতভেদের অবকাশ ছিল, কিন্তু সাধারণ ইংরেজী সাহিত্য এবং নাট্য-সাহিত্য বিষয়ে তিনি ভিন্ন মানুষ, তাঁর পড়াশোনার সঙ্গে অথবা তার স্মৃতিশক্তির সঙ্গে তাল রেখে আলোচনা চালানো আমার পক্ষে অন্তত সুসাধ্য ছিল না।

একদিন (২২-৮-৫৩) বেলা ১০টায় এসেই বললেন, "আমাদের দেশে নাট্য-সমালোচনা সাহিত্যের পর্যায়ে তোলা দরকার।" কিন্তু প্রায় ঐ একই নিশ্বাসে বললেন, "কি ক'রে যে হবে তাও তো জানি না। ইংরেজী কাগজে তো নাটক বর্জন করাই হয়েছে। নাটক সমালোচনা, বিশেষ শিক্ষিত লোক ভিন্ন, সাহিত্য হবে কি ক'রে? বিলেতে নাটক সমালোচনা ওরা উচ্চাঙ্গের সমালোচনা-সাহিত্য বানিয়েছে, আমাদের দেশে তেমন হ'ল কৈ?" আমি বললাম, আমাদের দেশের নাট্য-সমালোচনার একটি নমুনা আমার মনে আছে। একখানা বাংলা কাগজে নাট্যসমালোচক অভিনেতাদের উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, নাটক "ওয়েল রিহার্সাল্‌ড্" হওয়া দরকার।"

শিশিরকুমার উচ্চহাস্যে ঘর মুখরিত করেছিলেন ইংরেজীর নমুনা শুনে।

পরদিন (২৩-৮-৫৩) রবিবার, রাত থেকেই আবহাওয়া খারাপ চলছিল,

দমকা হাওয়ার ধাক্কা লাগছিল মাঝে মাঝে। বৃষ্টির প্রায় বিরাম ছিল না। তার মধ্যেই শিশিরকুমার এসে হাজির। এসেই একখানা বই আমার হাতে দিয়ে বললেন, "বইখানা কালই কিনেছি তোমার জন্য, পড়ে দেখো।"

এই বইয়ের কথাই আগে বলেছি। দেখলাম আমার নামে উপহার লিখেই এনেছেন। তিন শ বছরের ইংরেজী নাট্যসমালোচনার নমুনা রয়েছে এই বইতে। বলাবাহুল্য আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম। তাঁর নিজের অভিনীত নাটকের সমালোচনা আমি একাধিকবার করেছি। ১৯৩৬ সালে নারদচন্দ্র চৌধুরী সম্পাদিত 'নূতন পত্রিকা'য় রীতিমত নাটকের সমালোচনাই সম্ভবত আমার প্রথম নাট্যসমালোচনা। তাতে আমি ঐ নাটকের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, এবং অন্যান্য চরিত্র এবং নাটক থেকে শিশিরকুমারের অতি বেশি স্বতন্ত্র এবং প্রবল হয়ে যাওয়া আমার খুব ভাল লাগেনি, যদিও তিনি তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বে সব দুর্বলতা ঢেকে দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

তারপর শ্রীবঙ্গমের 'পবিচয' নাটক আমি রেডিওতে সমালোচনা করি। এই নাটকে শিশিরকুমারের এমন একটি সহজ স্বাভাবিক এবং নাটকীয়ত্বহীন অভিনয় দেখেছিলাম, যা আমি আজও ভুলতে পারিনি। নাটকীযতা সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে একটি চবিত্রে এতখানি গুরুত্ব এবং ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলা বাংলা মঞ্চে আর আমি দেখিনি। রায়বাহাদুরের ছোট্ট ভূমিকায তিনি সেদিন আমার চোখে অত্যন্ত বড হয়ে উঠেছিলেন। না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হ'ত।

এরপর 'প্রশ্ন' নাটকে তিনি এই ধরনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু নাটকের গঠন ছিল ছোটগল্পের। শেষ দিকটা, যাকে বলে 'ভিনেটেড,' তাই। অনেক বেশি প্রত্যাশা জাগিয়ে নাটকটি এমন জায়গায় এসে হঠাৎ শেষ হ'ল যে আমরা তাতে একটু বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। আমার সঙ্গে সেদিন 'বনফুল' ছিল। বেরিয়ে আসার পর প্রবোধকুমার সান্যালের সঙ্গে দেখা, সেও অভিযোগ ক'রে বলল, এ কি হ'ল? আমাদের মনেও সেই প্রশ্ন। এই তারিখটি হচ্ছে ৩-১-৫৩, প্রশ্নের প্রথম অভিনয়। এরপর ৬ই জানুয়ারি তারিখে শিশিরকুমার এলেন আমাদের বাড়িতে। প্রশ্ন নাটক নিয়ে আলোচনা হ'ল। তিনি বললেন, "আমি রিভাইজ করব, তুমি আবার দেখ। শেষ দৃশ্য বদলাব।" ১১ই জানুয়ারি দ্বিতীয় বার দেখতে গেলাম প্রশ্ন।

দেখার পর একটি সমালোচনা লিখলাম যুগান্তরের জন্য এবং সেটি যুগান্তরে (১৬-১-৫৩, শুক্রবার) অভিনয়-সমালোচনার বিশেষ বিভাগে ছাপা হ'ল।

দৃশ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটালেও মূল নাটকের বদল হ'ল না। তাই মনে ক্ষোভ রয়ে গেল এবং আমার যা মনে হ'ল ঠিক তাই লিখলাম। এবং তা প'ড়ে শিশিরকুমার আমার সঙ্গে একমত হলেন। সমস্ত নাটকখানার বিশ্লেষণমূলক সমালোচনা এবং কিঞ্চিৎ বিরূপ সমালোচনা হওয়া সত্ত্বেও তিনি সে সমালোচনা পছন্দ করলেন. এতে আমি তাঁকে সেদিন ব্যবসাদারির চেয়েও শিল্পবোধকেই বড় স্থান দিতে দেখে তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণার আরও একটি জোরালো সমর্থন পেলাম।

১৯৫১ সালের মে মাসেও তিনি প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর তখৎ-এ-তাউসের অভিনয় সম্পর্কে আমার অভিমত জানতে চেয়েছিলেন। তার উত্তরে আমি একটি দীর্ঘ সমালোচনা লিখে তাঁকে দিয়েছিলাম। যে সব ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতি আমার চোখে পড়েছিল তা সমস্তই লিখে জানিয়েছিলাম। সে সমালোচনার নকল আমার কাছে এখনও আছে। শিশিরকুমার তার মধ্য থেকে গ্রহণযোগ্য অনেকগুলো বিষয় বিবেচনা করেছিলেন এবং প্রস্তাবিত পরিবর্তন পরবর্তী অভিনয় থেকেই করেছিলেন। অন্য দু একটা পরিবর্তন সম্ভব ছিল না ব'লে করেন নি।

আমাকে বই উপহার দেওয়ার প্রসঙ্গে ফিরে যাই। তার কিছুদিন আগে মাঝে মাঝে নাটক কোনো চরিত্র-অভিনয়ে অভিনেতার ভূমিকা কি, তা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। নাট্যকার যে ভাবে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন অভিনেতা ঠিক তা অনুসরণ করবে, না সে চরিত্রের নিজস্ব ব্যাখ্যা দেবে, এই ছিল আলোচনার বিষয়। নাট্যকারের কল্পিত সীমা প্রতিভাবান অভিনেতা অতিক্রম ক'রে যেতে পারে, সে অধিকার তার আছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে অভিনেতার জন্যই নাটক সফল হয়েছে বেশি, শুধু লেখার জন্য নয়। বিষয়টি এমনই পরিচিত যে এ নিয়ে মতভেদের কোনো কারণ ছিল না।

যাই হোক আমার উপহার পাওয়া বইখানা পড়তে গিয়ে দেখি সম্পাদক ঐ একই বিষয় উল্লেখ করেছেন।—

"The actor's performance became itself self-important,

and his 'rendering' of a particular part—i. e. the personal force he imposed upon the character—was no less deserving of attention than the author's aim and purpose in creating the character. It was the actor, in fact, who was said to 'create' what he might be supposed merely to interpret."

এই কথাগুলো বলা হয়েছে প্রাচীন গ্রীক নাটকের তুলনায় পরবর্তী, অর্থাৎ আধুনিক যুগের পবিবর্তন সম্পর্কে। তারপর সম্পাদক নিজে এ বিষয়ে একমত হয়েছেন।

তখনই বোঝা গেল এই বিষয়ে আলোচনার ফলেই আমার এই বইখানা লাভ হ'ল।

উইংস-এর আড়াল থেকে অভিনেতা রূপে শিশিরকুমার নীরবে অথবা সরবে—যেমন ভাবেই মঞ্চে প্রবেশ করুন, আমার ঘরে কিন্তু সব সময় কথা বলতে বলতে প্রবেশ করতেন। যেন একটা গোটা বিপ্লব এসে প্রবেশ করল একটা নির্জীব পরিবেশে। একা মানুষ দশ জন মানুষের আবহ সৃষ্টি করতেন।

১৯৫২ সালের গোড়ার দিকের একটি কথা বলি। ২৭শে জানুয়ারি, রবিবার, সাড়ে নটা। শিশিরকুমার দরজা থেকেই বলতে বলতে ঘরে প্রবেশ করলেন—"নাটক উচ্চ সাহিত্য না হলেও নাটক হওয়া সম্ভব, এবং তা সম্ভব একমাত্র উচ্চাঙ্গের অভিনয়ে।"—তিনি বসবার পর আমি বললাম, "ঠিক গানের মতো। গানের কথা সাহিত্য না হলেও চলে, তুচ্ছ কথা নিয়েই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কারবার। এই তো আপনি যে সব নাটকে বেশি নাম করেছেন, সেগুলোকে কি সাহিত্য হিসেবে উঁচু স্থান দেন?"

"কি দরকার। নাটকের নিয়মে বাঁধা থাকলেই হ'ল, না যদি থাকে, যদি সম্ভাবনা থাকে, তা হ'লে ওলটপালট করে নিই। তোমার গানের উপমাটা ঠিক হয়েছে, তবে রবীন্দ্রনাথের যে সব নাটক অভিনয় করেছি, তার প্রত্যেকটি কথা উচ্চারণ ক'রেও আনন্দ পেয়েছি। অভিনয়ের জন্য ঠিক তেমন কথার হয় তো দরকার ছিল না, কিন্তু ওটা অতিরিক্ত আনন্দ। সে আনন্দ একেবারে আমার সকল স্নায়ুর আনন্দ।

আমি বললাম "রবীন্দ্রসঙ্গীতে আমি তেমনি আনন্দ পাই।"

শিশিরকুমার বললেন "গান জানি না, শুধু আবৃত্তি করি।"

আমি বললাম, "রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তিতে আপনি প্রয়োজনীয় স্থানে যতটা ইমোশন যোগ করেন, রবীন্দ্রনাথের নিজের আবৃত্তিতে তার চেয়ে অনেক বেশি ইমোশন থাকত।"

"কি জানি ওঁর কাব্যের ব্যাখ্যাতা হিসাবে উনি হয়তো সবচেয়ে বড, কিন্তু নাটক আমার চেয়ে তিনি ভাল অভিনয় করেন নি।"

আমি বললাম, "একমাত্র তাঁর জয়সিংহের ভূমিকা দেখেছি, যাকে ঠিক অভিনয় বলা চলে। রূপক নাটকে তাঁর নিজস্ব অভিনয় ঠিক অভিনয় নয়। কিন্তু জয়সিংহ আমার খুব ভাল লেগেছিল। তবে এ কথা ঠিক যে রাম বা রঘুবীর বা আলমগীর তাঁর পক্ষে অভিনয় করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু আপনি নাটক ওলট-পালট ক'রে নেওয়ার কথা কি বলছিলেন?"

শিশিরকুমার বললেন, "নীলাম্বরকে আমিই মেরেছি জান?"

"বুঝতে পারছি না কথাটা।"

"বিরাজ বৌএর কথা বলছি। শরৎচন্দ্র নীলাম্বরকে মারতে রাজি ছিলেন না, কিন্তু আমি বুঝিয়ে দেওয়ার পর শরৎচন্দ্রই মারতে রাজি হলেন।"

এমন সময় প্রায় একই সঙ্গে পর পর বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, বঙ্গবাসী কলেজের বি. এ. ছাত্র ল চং গী (বর্তমানে পুলিস সার্জেণ্ট) ও অধ্যাপিকা অরুন্ধতী সেনের প্রবেশ।

প্রসঙ্গান্তর ঘটল। সেদিন সাজাহানের সম্মিলিত অভিনয় ছিল, সাতটায় গিয়েছিলাম শ্রীরঙ্গমে। অভিনয় দেখিনি, তবে নেপথ্যে ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী, কবি জসিমুদ্দীন, তুলসী লাহিড়ী, বিকাশ রায়, প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হ'ল।

বিরাজ বৌ সম্পর্কে একটি গল্প মনে পড়ল, বলেছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, ১৯৫২, ১১ই এপ্রিল তারিখে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে শিশিরকুমারের তর্ক হয়েছিল একদিন। একে ঝগড়াই বলা চলে। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "আমার বই এত জনপ্রিয় যে তা কুকুরের গলায় বেঁধে পথে ছেড়ে দিলেও সবাই তার গলা থেকে নিয়ে পড়বে।" শিশিরকুমার তার উত্তরে বলেছিলেন, "না, কেউ পড়বে না, বরং আমি যদি পথে দাঁড়িয়ে অ-আ-ক-খ আবৃত্তি করি, তা হ'লে

সবাই ঐ বই ছেড়ে আমার আবৃত্তি শুনতে আসবে। আপনি কুকুরের গলায় বই বেঁধে দেখেছেন, (বইয়ের নাম উহ্য রাখলাম) কেউ পড়েনি, কিন্তু আমি যখন ষোড়শী অভিনয় করি, তখন তা দেখতে সবাই ভিড় করেছিল।"

এর মূলে কতখানি সত্য আছে জানি না, তবে আমি শিশিরকুমারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন, হয়েছিল কিছু তর্ক।" প্রেমাঙ্কুর আতর্থী বলেন, তিনি শিশিরকুমারের মুখে অনেক দিন আগে এ গল্প শুনেছেন।

এই সব নানা অন্তরঙ্গ আলোচনার ভিতর দিয়ে আমাদের মধ্যে একটা আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ১৯১৭-১৮তে তিনি ছিলেন আমার ইংরেজীর অধ্যাপক, ১৯৫১ থেকে তিনি হলেন আমার সুহৃৎ এবং আত্মীয়। এবং তিনি আমাকে চুরুট দিচ্ছেন, আমি তাঁকে। ১৯৫১ সালের গোড়ার দিকে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু রাজসাহীর সুবিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের সুরেন্দ্র-মোহন চৌধুরী (অ্যাডভোকেট) প্রথম শিশিরকুমারকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসেন, এবং তিনিই আমাকে তাঁর বন্ধুর স্তরে তুলে দেন। এই মিলনে তিনি এজেন্টের কাজ করলেন এবং তা হ'ল প্রায় ক্যাটালিটিক এজেন্টের মতো। কারণ সুরেন্দ্রমোহন কাজের মানুষ, তাই তিনি স'রে পড়লেন। বেলা দশটায় আমাদের বাড়িতে আর ক্লায়েন্ট পাবেন কোথায় ?

শিশিরকুমার বাস করতেন শ্রীরঙ্গম সংলগ্ন বাড়িতে। তাঁর প্রয়োজন ছিল একটি অন্তরঙ্গ পরিবেশের, আমার কাছে সে পরিবেশ তিনি পেতেন। মধ্যাহ্নভোজন করেছেন মাত্র একবার আমাদের বাড়িতে। যে সব রান্না তিনি ভালবাসতেন, মাঝে মাঝে তা পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী আজ ১৯৫৯ সালে কাজে মহাস্থবির হলেও তখন মহাস্থবির ছিলেন শুধু নামে, এবং চুল প্রায় শাদা হ'লেও হাতেপায়ে মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন মহা জঙ্গম। তিনিও প্রায় রোজ আসতেন। তাঁদের আর এক বন্ধু প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (জংলীদা) মাঝে মাঝে আসতেন। মাঝে মাঝে আসর এমন জ'মে উঠত যে দু তিন ঘণ্টা পর্যন্ত কারো ওঠার কথা মনে হ'ত না।

১৯৫৪ সালের শারদীয়া দৈনিক বসুমতীতে "আমার দেখা শিশিরকুমার ভাদুড়ি" (পরে 'ম্যাজিক লণ্ঠন' বইতে সঙ্কলিত) প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি সে প্রবন্ধ প'ড়ে একদিন হাসতে হাসতে আমাকে বললেন, "তোমার

লেখা সব বৃথা হয়েছে, আমার বিষয়ে যা লিখেছ তা ভুলে সবাই আমার লাঠির কথা বলছে !"

এটি নিতান্তই কৌতুক ক'রে বলা। আমিও বললাম "এবারে তা হ'লে লাঠিই ধরুন।"

কত সুখ দুঃখের কথা তিনি আমাকে বলতেন। কৌতুকপ্রিয়তাও কম ছিল না, কিন্তু সে কৌতুক অনেক সময় বেদনামিশ্রিত। একদিন (২৯-১১-৫২, শনিবার) এসেই বললেন, "দু তিনজন পাওনাদার ঠেকিয়ে অশোক চ'টে গেছে তার বাবার উপর, আর তার বাবা যে সমস্ত জীবন পাওনাদার ঠেকিয়ে এলো।"

১১-১২-৫২, বৃহস্পতিবার আলমগীরের ৩২ বার্ষিক অভিনয় হয়। তার দিন পনেরো পরে নলিনীকান্ত সরকার আমার কাছে এসেছিলেন। তারিখ ২৬-১২-৫২। শিশিরকুমার তাঁর অভ্যস্ত সময়ে আমার ঘরে প্রবেশ করতেই নলিনীকান্ত সোল্লাসে ব'লে উঠলেন "শিশিরবাবু, আমি আপনার চেয়ে তিন দিনের বড়।"

কথাটা এভাবে বলতে শুনে মনে হ'ল নলিনীকান্ত ইতিমধ্যেই বোধ হয় দিন গুনতে আরম্ভ করেছেন, এবং হয়তো সম্প্রতি এই তথ্যটি আবিষ্কার ক'রে শিশিরকুমারকে বলবেন বলেই প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। অন্ততঃ দেখে তো তাই মনে হ'ল। তারপর দুজনে বয়সোচিত একটি আলোচনা আরম্ভ করলেন। আলোচনার বিষয় চোখের হানি (হৃদয়গ্রাহী আলোচনা)। খুবই স্বাভাবিক। সাম্প্রতিক সংস্কৃতি বিনিময়ের মতো গোষ্ঠীগত স্বাস্থ্য সংবাদ বিনিময়ও সব সময় দেখা যাবে। এই গোষ্ঠীবিভাগ ব্যাধির গোষ্ঠীজাত। অর্থাৎ ব্ল্যাড প্রেশারের রোগীরা পরস্পর দেখা হ'লে কার প্রেশার কত জিজ্ঞাসা করে। হৃৎপিণ্ডের ব্যাধি থাকলে পরস্পর হৃৎসংবাদ আদানপ্রদান হয়। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের গল্পেই মনে হয় পড়েছি, ফুলশয্যার রাত্রে বর বধূকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করছে তোমাদের ম্যালেরিয়া বেলা কটায় আসে ?

যাই হোক শিশিরকুমার ও নলিনীকান্ত দুজনেই একটা বিষয়ে একমত হলেন যে তাঁদের কারোই ছানি পাকেনি, অর্থাৎ কাটাতে দেরি হবে। ডক্টর শ্রীমতী উমা রায় একদিন ছানির কথা শুনে শিশিরকুমারের জন্য একটা ওষুধ

ব্যবস্থা করল, টোটকা ওষুধ এবং তা সে নিজেই সংগ্রহ ক'রে দিতে লাগল বাজার থেকে। শুনেছিলাম তাতে সামান্য কিছু উপকার হয়েছিল।

শিশিরকুমার বললেন, "ছানির জন্য অভিনয়ে অসুবিধা হচ্ছে। দৃষ্টিকোণ সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। মঞ্চে যে অনুপস্থিত-প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বলবার কথা, বলতে গিয়ে হঠাৎ দেখি সে আমার পাশেই উপস্থিত।"

যাবার সময় দুজনে এক সঙ্গে বেরোলেন। আমি এগিয়ে দিতে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শিশিরকুমার নলিনীকান্তকে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি তারা গুনতে পারেন?" নলিনীকান্ত তার উত্তর না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করলেন, "আপনি চোখে সরষেব ফুল দেখেন কি?"

শিশিরকুমার হাসতে হাসতে বললেন, "সব সময় দেখছি।"

এমনি ধরনের ছোটখাটো কত ব্যথাবেদনা হাস্যপরিহাস মুখরিত দিনগুলো প্রায় এক নিশ্বাসে কেটে গেল। একটা কালের এক বিরাট পুরুষ, এবং স্বয়ং একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানরূপে দেশের সকল মানুষের মনের স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা তিনি পেয়েছেন, যদিও নিজের অনমনীয় ব্যক্তিত্বের প্রবলতাব জন্য অল্প দু-একজনের মনে বিদ্বেষও জাগিয়েছেন কম নয়। এও তো দেখা গেল, তাঁর চিতার আগুন নিবতে না নিবতে কেউ কেউ তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন প্রবন্ধ লিখে। উক্ত কার্যটির জন্য উপযুক্ত সময়টিই বেছে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এও থাকা দরকার। ফুলটা ফোটাতে কাঁটার কৃতিত্ব কিছু আছে বৈ কি। না হলে জীবন স্বাদহীন হত। অতএব দুঃখ নেই।

শিশিরকুমারের মৃত্যুর পর তাঁর পরম সুহৃৎ শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় আমাকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন, চিঠিখানা আমি উদ্ধৃত করি। চিঠির তারিখ ৩০শে জুন, ১৯৫৯। ঐটিই মৃত্যুর তারিখ।

"সুহৃত্তম,

"সূর্যোপাসনা সমাপ্ত; জীবন-মহীরুহ থেকে আর একটি ভাস্বর শিশির-বিন্দু ঝ'রে পড়ল ধরার মৃত্তিকায়। নিযতির এই অমোঘ বিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কবা বৃথা।

"ব্যাধি আমাকে শয্যাগৃহেই আবদ্ধ ক'রে রেখেছে।

"তৈরি ক'রে রেখেছি ভাই মনটা,
সাড়া দেব বাজলে পরেই ঘণ্টা।

আয়ু ফুরিয়ে গেছে। যেটুকু জীবন আছে সেটুকু ফাউ। ইতি—শুভার্থী

হেমেন্দ্রকুমার রায়"

"বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না" ও ভূত

'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না' এই নামে একটি ধারাবাহিক লেখা আহ্বান করেছিলাম ১৯৫২ সালে যুগান্তর সাময়িকীতে। কথাটির আসল অর্থ হচ্ছে বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা সহজে চলে না, বা হঠাৎ মনে হয় কোনো ব্যাখ্যা নেই, বা আমাদের বুদ্ধির অতীত কোনো ব্যাখ্যা থাকলেও থাকতে পারে। অলৌকিক কোনো পৃথক বস্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও আছে এমন বিশ্বাস আমার নেই। প্রকৃতি মানেই বিশ্বপ্রকৃতি, অনন্ত শূন্যে যা কিছু দৃশ্য বা অদৃশ্য, যা কিছু আমাদের ধারণার মধ্যে অথবা বাইরে, সবই বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। আমাদের বিশ্ব মহাবিশ্বের অন্তর্ভুক্ত একটি ছোট্ট বিশ্বমাত্র। মহাশূন্যের সমুদ্রে ভাসমান একটি দ্বীপ। আমাদের এই ছোট্ট বিশ্বদ্বীপে মাত্র ১৫ হাজার কোটি সূর্য আছেন। যে সূর্য আমাদের পালন করবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি সেই ১৫ হাজার কোটির মধ্যে অত্যন্ত নিরীহ আকারের একটি সূর্য। (তাঁকে ঘিরে যে সব গ্রহ-উপগ্রহ ঘুরছে, তারই একটি হচ্ছে পৃথিবী।)

১৫ হাজার কোটি সূর্য সমন্বিত আমাদের এই বিশ্বের বাইরে আরও যে কত বিশ্ব আছে তার সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। অগণিত আছে। রেডিও টেলিস্কোপে তাদের আওয়াজ মাঝে মাঝে ধরা পড়ছে। তাদের কোনো দূরবীক্ষণ যন্ত্রেই দেখা যায় না। শুধু রেডিও টেলিস্কোপে যেটুকু সাড়া পাওয়া যায়। এক বিশ্বের সঙ্গে আর এক বিশ্বের সংঘর্ষ চলছে এমন খবরও পাওয়া গেছে ঐ রেডিও টেলিস্কোপে।

আমাদের ধারণার বাইরে এ সব। কিন্তু তাই ব'লে এ সব ঘটনা অতিপ্রাকৃত নয়, সবই প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত, প্রকৃতির বাইরে কিছুই নেই, অতিপ্রাকৃত কিছুই নেই। আমরা নিজেদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞানে প্রকৃতির যে সামান্য অংশ জানি, তার বাইরের ঘটনা আমরা জানি না বলেই তা প্রকৃতির বাইরের ঘটনা নয়, তা শুধু আমাদের জ্ঞানের বাইরে মাত্র। অতএব

অলৌকিক কথাটার অর্থ সব সময়েই আপেক্ষিক ধরা যেতে পারে। অর্থাৎ অলৌকিক তাকেই হয় তো বলা যায়, যা লৌকিক বুদ্ধিতে ধরা যায় না। প্রকৃতপক্ষে তা মিরাকল নয়।

প্রকৃতিতে মিরাকল বা অলৌকিক যদি কিছু থাকে তবে সেই অলৌকিকত্ব প্রত্যেকটি দৃশ্য বা অদৃশ্য বস্তুর মধ্যে প্রকাশিত। প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু এবং অতিপরমাণুর মধ্যে প্রকাশিত। সে হিসাবে বিশ্বজগৎটাই একটা মিরাকল।

সমস্ত বিশ্বজগতের দৃশ্য-অদৃশ্য সকল বস্তুর মূলে পরমাণু। এই পরমাণুর নিজস্ব একটি গঠন আছে। অর্থাৎ একটি কেন্দ্র আছে এবং তার চারদিকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন নামক নেগেটিভ বিদ্যুৎকণিকা ঘুরছে। কেন্দ্রটি যদি একটি মটরের মতো বড় হ'ত, তাহলে সমস্ত পরমাণুটির আকার হ'ত একটি ঘরের মতো। একটিমাত্র পরমাণুকে বাড়িয়ে দেখলে এমনি বড় দেখাত। অথচ একটি পিনের মাথায় এই পরমাণু যে কত কোটি আছে তার হিসাব করা দুঃসাধ্য।

এই পরমাণু আমার জৈব দেহ গঠন করেছে। এই পরমাণুর বিশেষ সংযোগে আমার চেতনা এবং মননশক্তি সৃষ্টি হয়েছে। অজৈব বস্তু জৈব বস্তু সৃষ্টি করেছে। এ কি কম অলৌকিক?

এ যদি হৃদয়ঙ্গম করা যায় তা হ'লে সংসারে একমাত্র ভূত সুপারন্যাচরাল হবে কেন? অলৌকিক হবে কেন? তা ভিন্ন ভূত বা প্রেতদেহ দেখাটা সত্য দেখা কি না তা নিয়ে মতভেদ আছে। মনের রহস্য আজও আমাদের অজ্ঞাত। সে চেতনার বাইরে সত্য কিছু দেখে কি না তার বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ সম্ভবত আছে, কিন্তু আমি জানি না। তবে আমি নিজে কখনও ভূত দেখিনি, দেখবার আশাও করি না। যে জাতীয় ভয়ে ভূত দেখা যায়, সে জাতীয় ভয় আমার মনে নেই।

কিন্তু একটি ব্যাপার দেখে বিস্মিত হয়েছি যে, বাংলা দেশে হাজার-হাজার লোক ভূত দেখেছে। এবং প্রতিদিন দেখছে। অন্য দেশের লোক কখনও এত ভূত দেখে না। তাই প্রত্যক্ষদর্শীদের লেখার চাপে ঘরে স্থানাভাব ঘটতে লাগল।

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না, এই ফীচারটির উদ্দেশ্য ছিল জীবনের বহু দুর্বোধ্য ঘটনার বিস্ময়জাত সুপাঠ্য লেখা পরিবেশন করা। কিন্তু প্রায় সব

লেখাই ভূত সম্পর্কে আসতে লাগল, এবং তাতে বোঝা গেল বাঙালী-ভূতের মধ্যে অভিনবত্ব বা দুর্বোধ্যতার চমক আর নেই, বাঙালী-ভূত বাঙালীদের নিত্য সহচর, অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। সাধারণতঃ মানুষ দেখে' আমাদের বিস্ময় জাগে না, যদিও মানুষের কথা ভাবতে গেলে এর চেয়ে বড় বিস্ময় সংসারে আর কি আছে। কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ চমক লাগার আঘাত নেই ব'লেই আমরা তা ভুলে থাকি। একটি মানুষ দেখেছি বললে কেউ আর চমকে ওঠে না। ভূতের বেলাতেও তাই। সবাই যদি এত ভূত দেখে, তা হ'লে চমকাবার কি আছে।

এই কথাটা বোঝাবার জন্য ভূতদর্শীদের কাছে সোজা আবেদন না ক'রে একটি গল্প লিখে সেই গল্পের ভিতর কৌশলে আমার সমস্ত বক্তব্যই প্রকাশ করলাম। গল্পটির নাম অধর সরকার। সে একটি ভূত দেখার গল্প পাঠিয়ে জানতে এসেছে সেটি ছাপা হবে কি না। বললাম, ছাপা হবে না, এবং কেন হবে না বুঝিয়ে দিলাম। সে অনেক কথা। গল্পের শেষে আমি একটুখানি অন্যদিকে দৃষ্টি এবং মন ফিরিয়েছিলাম, ইতিমধ্যে দেখি অধর সরকার নেই।

এরকম ঘটনায় বিস্ময়ের কিছুই থাকতে পারে না, কারণ প্রতিদিনই প্রায় দেখছি কোনো বন্ধু বা কোনো নবাগত আলাপ করতে করতে কখন হঠাৎ উঠে গেছে খেয়াল থাকে না, কিন্তু যে হেতু তার চ'লে যাওয়া আমি লক্ষ করিনি, সেই হেতু সে ভূত, এমন কখনও মনে করি না। আমার অধর সরকারও তেমনি হঠাৎ অদৃশ্য হয়েছিল, এবং একটি জীবন্ত মানুষ আমার অন্যমনস্কতার মুহূর্তে আমার সামনে থেকে উঠে গেলে যেমন হওয়া উচিত, অধর সরকারের উঠে যাওয়াকেও তেমনি ফিজিক্যাল বা ভৌতিক অন্তর্ধানের সীমানাতেই রেখেছিলাম, কোনো আত্মিক অন্তর্ধানের কোঠায় ফেলিনি। তবে এমন ভাবে লিখেছিলাম যাতে ভূতবিশ্বাসীদের মনে হ'তে পারে অধর সরকার একটি ভূত।

উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল কারণ অনেক চিঠি এসেছিল। অনেকেই আতঙ্কিত, শেষে কি না যুগান্তর সাময়িকী বিভাগেই একটা জ্যান্ত ভূত এলো? এ বড়ই আশ্চর্য।

এ সব চিঠি প'ড়ে সরল বিশ্বাসী পাঠকদের ভুল ভাঙার জন্য সোজা তাঁদের চিঠির উত্তর না দিয়ে আরও একটি গল্প লিখে তার ভিতর কৌশলে প্রকাশ

করলাম ওটা বানানো গল্প এবং অধর সরকার বিশুদ্ধ গল্পের অধর সরকার। ইউরোপীয় তিনজন জনপ্রিয় ডিটেকটিভ-গল্পের ডিটেকটিভ এসে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সন্ধান চালালেন এবং তাদেরই একজন সে কথা জানিয়ে গেলেন। বললেন, গল্পটা উদ্দেশ্যমূলক। অর্থাৎ আমার বক্তব্য নিজে না ব'লে ডিটেকটিভকে দিয়ে বলানো হ'ল।

কিন্তু ফল হ'ল উলটো। এ কাহিনীকেও পাঠকেরা সত্য ঘটনা ব'লে বিশ্বাস করলেন। আমার এই গল্পে এক ডিটেকটিভ এক জায়গায় বলেছেন, ভূত গল্প লিখতে জানে না, আর জানলেও অনুরোধ করতে আসবে কেন, সম্পাদকের ঘাড়ে চেপে জোর ক'রে ছাপিয়ে নিতে পারত।

কিন্তু এর ফলে এক মজার ঘটনা ঘ'টল। একজন মহিলা আমার উপর ক্রুদ্ধা হলেন। তিনি লিখলেন আপনি ভুল লিখেছেন, ভূত সব পারে, আমি বহুকাল ভূত নিয়ে গবেষণা করছি, আমি প্রমাণ দেখাতে পারি।

এই চিঠিখানায় বিশেষ কৌতুক অনুভব ক'রে আমি ছেপে দিলাম। ছাপায় অনেক ঝুঁকি ছিল। কেন না এ চিঠি পডলে বাংলাদেশের প্রায় সবাই পত্র লেখিকার ঠিকানা চেয়ে চিঠি দেবেন, এবং প্রত্যেককে ঠিকানা সরবরাহ করতে ২৪ ঘণ্টা কাটবে। অনেক চিন্তা ক'রে চিঠিখানা ঠিকানাসুদ্ধ ছেপে দিলাম। (কোনো পত্র লেখিকারই ঠিকানা আমরা ছাপি না, বিশেষ নির্দেশ ভিন্ন। পত্রলেখিকারা এতে অনেক সময় মনে করেন ঠিকানা দিতেই হয় না। এটি ভুল ধারণা। ঠিকানা চিঠিতে না থাকলে সে চিঠি ছাপা হয় না, কিন্তু চিঠি ছাপবার সময় আমরাই ঠিকানাটি বাদ দিয়ে ছাপি।)

কিন্তু এই ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম করতে হ'ল। কেন, তা আগেই বলেছি। তা ভিন্ন পত্রলেখিকা খুব জোরের সঙ্গে লিখেছিলেন, 'ভূত সব পারে' তা তিনি প্রমাণ করিয়ে দিতে পারেন, তাই মনে হ'ল এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ থেকে পাঠকদের বঞ্চিত ক'রে লাভ কি? অবশ্য আমি নিজে ভূতের ক্ষমতা কতটা আছে বা না আছে তার প্রমাণ দেখতে আদৌ উৎসুক হইনি, কারণ আমিও জানি ভূত সব পারে।

ঠিকানাসুদ্ধ চিঠি ছাপা হ'ল, তাই আমাদের কাছে এ বিষয়ে পাঠকদের কোনো চিঠিই এলো না, এবং তাতে বেশ আরাম বোধ করলাম। তারপর এ ব্যাপারটি আর মনে ছিল না। এমন সময় দিন সাতেক পরে একটি ছেলে

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে প্রবেশ করল আমাদের বিভাগে, তার হাতে একখানা খোলা চিঠি, পেন্সিলে লেখা। লিখেছেন ঐ পত্রলেখিকা। প'ড়ে দেখি ভীষণ ব্যাপার। মহিলা লিখেছেন, 'আমার ঠিকানাসমেত চিঠি ছেপে আমার সর্বনাশ করেছেন। আমার বাড়িতে শত শত লোক এসে পড়ছে, আমাকে বাঁচান।'

কিন্তু কি ক'রে যে বাঁচাব ভেবে পেলাম না। কারণ ঐ পত্রবাহক ছেলেটির কাছে শুনলাম মহিলার স্বামী সব কাজ ছেড়ে লাঠি নিয়ে দরজায় ব'সে লোক তাড়াচ্ছেন।

আমি ভেবে পেলাম না কেন এত লোকের ভূত দেখায় কৌতূহল। আমার ধারণা এক মাত্র আমি ভিন্ন বাংলাদেশের আর সবাই ভূত দেখেছেন। কারণ তখনই ভূতদর্শীদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার বর্ণনা সম্বলিত রচনায় সাময়িকী বিভাগ প্রায় ভ'রে উঠেছিল।

তবে উক্ত মহিলার দুর্ভোগের কথায় খুবই বেদনা অনুভব করেছিলাম। তিনি তাঁর চিঠিতে যে সরলতার প্রকাশ করেছিলেন ততখানি না করলেই ভাল করতেন। এবং যিনি ভূত নিয়ে গবেষণা করছেন এবং ইচ্ছে করলে অন্যকে ভূত দেখাতে পারেন ব'লে মনে করেন, তাঁর উচিত এ ইচ্ছাকে দমন করা। নিজের পরিচিত বা বশমানা ভূত অন্যকে দেখিয়ে তবে তার ভূতে বিশ্বাস জন্মাতে হবে, এ ইচ্ছায় বিপদ আছে। যদি কেউ বিশ্বাস না করে, তবে সে তার নাস্তিকতা নিয়ে সুখে থাক না? তাকে ভূতের অস্তিত্ব-বিশ্বাসে দীক্ষা দিয়ে এমন কি লাভ হবে?

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা দরকার এই যে, ভূতকে অপমান করলে বা ভূতের মানহানিকর কিছু বললে তা নিজের অপমান ব'লে না মানাই ভাল। ভূতের অপমান নিজের গায়ে মাখতে নেই। অনেক ভূত অবশ্য নিরীহ আছে, তারা মানুষকে দেখে ভয় পায়, এবং কদাচিৎ মানুষের সামনে আসে। তাদের অসহায়ত্ব স্মরণ ক'রে ভূত না-মানা লোকদেরও কিছু সংযত হওয়া উচিত। তাদের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করা উচিত নয়। কিন্তু যে সব ভূত হিংস্র এবং আত্মরক্ষায় পটু তাদের বিরুদ্ধে যে-কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

ভূত সম্পর্কে আমার নিজস্ব কোনো মত নেই, কারণ আমি ভূত দেখিনি।

আমি মনে করি প্রত্যেকেরই একটি ক'রে ব্যক্তিগত ভূত থাকা উচিত। তা হ'লে অন্য ভূত দেখার ইচ্ছা কমতে পারে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভূতে দারুণ বিশ্বাসী ছিলেন। ভূতজগতের **সমস্ত** ভূগোল তাঁর মুখস্থ ছিল। এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আগে মারা গেলে তিনি আমাকে দেখা দেবেন। শুনেছি এ প্রতিশ্রুতি তিনি আরও অনেককে দিয়েছিলেন, কিন্তু কারো কাছেই তিনি উপস্থিত হননি। আমার সেজন্য মনে হয় যারা প্রতিশ্রুতি দেয় না, একমাত্র তারাই ছায়া মূর্তিতে দেখা দিতে পারে।

ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তিত্ব মৃত্যুর পরে পৃথক ভাবে থাকতে পারে কি না সে প্রশ্ন এখানে তোলা না অপ্রাসঙ্গিক হবে। এ সম্পর্কে আমার মূল বক্তব্য আমি ১৯৫৩ সালে মাসিক বসুমতীতে "জাগিল কি ঘুমায় সে" এই নামে লিখেছিলাম (পরে 'ম্যাজিক লণ্ঠন' বইতে সংকলিত)।

পুনরায় "বিশ্বাস করুন আর নাই করুন" পর্য্যায় আরম্ভ ক'রে আরও বিপন্ন বোধ করছি। এবারে ভূতদর্শীর সংখ্যা সকল অনুমান ছাড়িয়ে গেছে। স্কুলের ছেলেমেয়ে থেকে আরম্ভ ক'রে যে-কোনো বয়স্ক ব্যক্তির নিজস্ব ভূত দেখার অভিজ্ঞতায় ঘর ভ'রে উঠছে আবার।

১৯৫৩ সালে প্রথম উদ্বোধন গল্পটি লিখেছিল অনুজোপম বন্ধু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পর পর দুটো। দুটোই বানানো বা শোনা গল্প কিন্তু তার নিজের অনবদ্য লিখনশিল্পের স্পর্শে তা খুবই সুন্দর হ'য়ে উঠেছিল। দুটো গল্পই সে লিখেছিল ছদ্মনামে। এই 'ছদ্মনাম' শব্দটির এখানে ব্যাখ্যা দরকার। বলা উচিত ছদ্মনামের ছদ্মনাম। কারণ এই প্রিয় কথাশিল্পীর "নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়" নামটিই তো একজাতীয় ছদ্মনাম। অনেকের হয় তো এটা জানা নেই। কিন্তু এটাকে এতদিনের ব্যবহারের পর ছদ্মনাম বললে কেউ মানবেন কি না সন্দেহ।

আমি আগেই বলেছি মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি দৃশ্য বা অদৃশ্য বস্তুই এক একটি মিরাকল বা ব্যাখ্যার অতীত জিনিস। কিন্তু তাদের চলাফেরা বা ব্যবহারের ভিতর এমন একটা শৃঙ্খলা আছে বা আছে ব'লে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা জন্মে গেছে যে তাদের মধ্যে অলৌকিক কিছুই দেখি না। সবই অলৌকিক, তাই কোনোটাকেই পৃথকভাবে অলৌকিক মনে হয় না।

এরই মধ্যে আমাদের জানা নিয়ম শৃঙ্খলার বাইরে হঠাৎ কোনো কিছু দেখলে তাকেই মনে হয় আলৌকিক। সে জন্য এককালে ধূমকেতুকেও অলৌকিক বলা হয়েছে।

ধরা যাক কোনো ব্যক্তির মারাত্মক কোনো অসুখ হয়েছে। কোনো চিকিৎসাতেই সারছে না। এমন সময় হঠাৎ কোনো বাইরের দৈব চিকিৎসক মন্ত্র পড়া জল খাওয়ালেন এবং রোগী ক্রমে ভাল হ'তে লাগল।

এর ব্যাখ্যা কি? হঠাৎ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

অথচ এর ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু তখন-তখনই ব্যাখ্যাটি যে পাওয়া গেল না, তার মধ্যে নিশ্চয়ই বিস্ময় আছে। এমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না ব'লেই এতে বিস্ময় আছে। এর মধ্যে আপাত দুর্বোধ্যতার ধাক্কা আছে। বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না—পর্যায়ের উদ্দেশ্যেই ছিল জীবনের নানা বিভাগের এই জাতীয় সব ঘটনা প্রকাশ করা, এবং তা রিপোর্টিং মাত্র নয়। রচনাগুলি সামান্য সাহিত্যধর্মী হবে এমনি আশা করা হয়েছিল। কিন্তু বলা বাহুল্য এই পর্যায়ে পাইকেরি হিসাবে ভূত প্রবেশ ক'রে সব ব্যর্থ ক'রে দিয়েছিল। 'বিশ্বাস করুন আর নাই করুন' এই নব-পর্যায়েও দলে দলে ভূত ঢুকে পড়েছে।

আরও ভূত। এবং চোর

যেসব ভূতের কথা আমরা বাইরে থেকে পাই তারা অত্যন্ত নিরীহ এবং ভালমানুষ ভূত। অন্যের উপকার করার জন্য তারা সব সময় ব্যগ্র। এবং প্রত্যেকটি ভূত তার আত্মীয়ের একটি মাত্র উপকার ক'রেই অদৃশ্য হয়, আর কখনও ফিরে দেখা দেয় না।

কোনো ভূত ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসে, নিজের মারা যাবার পর অন্যে যারা বেঁচে আছে, তাদের উপকারের জন্য। কোনো ভূত গুপ্তধনের সন্ধান দেয়। কোনো ভূত তার আত্মীয়কে কোথাও যাওয়া নিষেধ করে, কারণ গেলেই তার অনিষ্ট হবে। এবং তা সে তার ভূতজীবনের ভবিষ্যৎ দৃষ্টির ক্ষমতায় দেখতে পায়।

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এ সব ঘটনা প্রতিদিন ঘটছে। অথচ

আমাদের দেশে ভূতের ভয় সম্ভবত সব চেয়ে বেশি। কেন এই ভূতের ভয়? হাজার হাজার লোক হাজার হাজার ভূত দেখছে, এবং সে সব ভূতের প্রত্যেকে সচ্চরিত্র, নীতিজ্ঞানসম্পন্ন, কর্তব্যপরায়ণ এবং প্রত্যেকের ঘাড়ে একটি ক'রে সৎকাজ করার দায় চাপানো আছে, এবং সেই সৎকাজটি তার করা হয়ে গেলেই সে আর ফিরে আসে না। আমার মনে হয় বাঙালীরা জীবিত থাকতে তার মনুষ্যত্ব ভুলে থাকে, কিন্তু ম'রে ভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার সুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয়। এ রকম ভৌতিক জীবন আমাদের প্রত্যেকেরই কাম্য হওয়া উচিত। সংসারে যত মানুষ, অন্তত তত ভূত যদি থাকত, তা হলে সংসার থেকে অনেক দুঃখ দূর হয়ে যেত। কারণ ভূতেরা তাদের আত্মীয় বা বন্ধুদের জন্য যে সৎকাজটি করে তা সামান্য নয়। তাদের জীবনের সব চেয়ে বড় সঙ্কটটি থেকেই তাদের তারা উত্তীর্ণ ক'রে দেয়। আমি সে জন্য বলেছি, প্রত্যেকেরই একটি ক'রে ব্যক্তিগত ভূত থাকা দরকার।

কিন্তু হায় রে! সংসারে সব জিনিসটাই যদি আমাদের মনের মতো হ'ত, তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি। সব মনের মতো পাওয়া যায় না, মাত্র সামান্য একটুখানি পাওয়া যায়। তাই দেখি, এত চরিত্রবান ভূত থাকা সত্ত্বেও হিংস্র ভূত অনেকগুলো বেশ নিশ্চিন্ত মনেই এদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যদিও তারা সব সময় দেখা দেয় না। তারা দুর্লভ, তারা আত্মাভিমানী। তারা ভাল ভূতের মতো পরোপকার করে না, তাদের পথ সরল পথ নয়, যদিও তারাও আর এক ভাবে পরোপকার করে। চরিত্রবান সদ্‌ভূত যেমন আপনা থেকেই দেখা দেয়, এরা তা করে না, এদের ডেকে আনতে হয়। এরা হিংস্র, কিন্তু তবু এদেরও ভূতসমাজে একটা বড় স্থান আছে।

"বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না" পর্য্যায় যখন আরম্ভ করি, তখন থেকেই আমি এদের সবার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে প্রবৃত্ত হই এবং এই বিশ্লেষণের ফলে এক অদ্ভুত জিনিস আমি আবিষ্কার করেছি। আমি দেখেছি ভূতেরা মোটামুটি ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত। এই বিভাগটি তাদের সমাজ-চেতনার দিক থেকেই করেছি। এই সমাজ-চেতনা কথাটির একটুখানি ব্যাখ্যা দরকার। এর মানে হচ্ছে মানুষের সমাজ সম্পর্কে ভূতের চেতনা। দুই জাতীয় ভূতের দুই জাতীয় চেতনা, অথচ দুইই সদুদ্দেশ্যমূলক।

আমি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর হিংস্র ভূত সম্পর্কে পত্রান্তরে কিছু আলোচনা করেছিলাম। এই ভূত মানুষকে সুখে থাকতে দেয় না। কিন্তু কেন দেয় না? সে কি ভূতের দোষ? ভূত কি সত্যই অন্যকে অসুখী ক'রে সুখী হয়? আমি যে আলোচনা করেছিলাম (বসুধারা, ১৯৫৮) তার মর্ম হচ্ছে এই—

কোনো মানুষ সুখে আছে এটা কি ভূতের পক্ষে অসহ্য? তাই কি সে তাকে সুখের গণ্ডি থেকে বা'র ক'রে দুঃখের সীমানায় এনে ছেড়ে দেয়? মানে, সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়? অথবা এ কথার মানে কি এই যে সুখে থাকতে ভাল লাগছিল না ব'লেই দুঃখকে ডেকে আনা হ'ল?

এই প্রশ্নটি আমার মনে জাগতেই মনের মধ্যেই মূল সত্যটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মনে হ'ল এ ভূত মানুষের মনের মধ্যে বাস করে। অর্থাৎ মানসিক সুখের পাশেই এর বাস। তাকে একটুখানি ডাকলেই সে মত্ত হস্তীর মতো সুখের পদ্মবনে এসে ঢোকে।

তাই, মানুষের সুখ দেখলেই যে-ভূতের ঈর্ষা হয়, কেউ সুখে আছে দেখলে যে-ভূত কিল মারতে আসে, সে-ভূত ভূতসমাজে আদৌ আছে কি না, সেই বিষয়েই আমার মনে সন্দেহ জাগল। আরও চিন্তা ক'রে দেখলাম, হিংস্রতা ভূতের স্বভাবধর্ম নয়। হ্যামলেট নাটকে হ্যামলেটের পিতৃ-ভূত রাজার লোকের হাতে মার খেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ মানুষই হিংস্র, কিন্তু ভূত তার মতো হিংস্র নয়।

আমার মনে হয় সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় এই কারণে যে, মানুষ নিজেই নিজের অনাবৃত পিঠটি ভূতের সামনে পেতে দিয়ে বলে "ভাই, এবারে কিলোতে থাক।" এ লোভ ভূতের পক্ষে সংবরণ করা কঠিন, কেন না ভূতেরা সাধারণত হীনতাভাব বা inferiority complex-এ ভোগে। ওদের সামনে পিঠ পেতে দিয়ে লোভ দেখাতে থাকলে তাই ওরা তা সামলাতে পারে না। পথে টাকা প'ড়ে থাকতে দেখলে যেমন যে-লোকটি চোর নয় সেও সাময়িক ভাবে চোর হয়, এও তেমনি। ভূত এই জন্যই সুখী মানুষের পিঠে কিল মারে। সুখী মানুষ নিজেই এটি চায়। সুখে থাকতে ভূতের কিল খেতে সে চায়।

এর কারণ আর কিছুই না, মানুষ যখন সুখে থাকতে চায় তখন সে বুঝতে

পারে না যে এ সংসারে বিশুদ্ধ সুখ ব'লে কোনো উপভোগ্য বস্তু থাকতেই পারে না। বিশুদ্ধ সুখ আর বিশুদ্ধ দুঃখ একই জিনিস, এরা সে ধারণা করতে পারে না। দুঃখের স্বাদ পেলে তবে সুখের স্বাদ পাওয়া সম্ভব, এবং সুখের স্বাদ পেলে তবেই দুঃখ কাকে বলে বোঝা যায়। তাই মানুষ যখন কিছুকাল একটানা সুখের মধ্যে থেকে হাঁফিয়ে ওঠে, সুখের আতিশয্যে ছটফট করতে থাকে, তখন তার একমাত্র মুক্তি ভূতের হাতে কিল খাওয়া। সুখের মধ্যে কিছুকাল বাস করলে বোঝাই যায় না যে সুখের মধ্যেই বাস করা হয়েছে। তাই সুখের বোধ জাগাতে হলে প্রত্যেকটি মানুষেরই মাঝে মাঝে একবার ক'রে ভূতকে ডাকতে হয়। বেঁচে থাকতে হ'লে যেমন খাওয়া পরা চাই সুখে থাকতে হ'লে তেমনি প্রত্যেকটি লোকের অন্তত একটি ক'রে ব্যক্তিগত ভূত থাকা চাই। মানুষ যখন সুখের মধ্যে থেকে সুখের বোধ হারায় তখনই তাকে গা থেকে জামা খুলে ব্যক্তিগত ভূতের সামনে কিল খাবার জন্য গিয়ে দাঁড়াতে হয়।

এই ভূতকেই জনসমাজে হিংস্র নামে চালানো হয়েছে। অথচ একটু ভাবলেই বোঝা যাবে এরাও সমাজের উপকারই করে, এবং মনে হয় এরাই বেশি করে। অতএব হঠাৎ মনে হয় ভূতের ভয় বাংলাদেশ থেকে দূর হওয়া উচিত। অবশ্য এ এমন একটি জটিল জিনিস যে, এটি দূর হ'লে সমগ্র সমাজ-জীবনই হয়তো ভেঙে পড়বে। তার মানে হচ্ছে এই যে, আগে যেমন বলেছি সুখে আছি বুঝতে হ'লে ভূতের সামনে পিঠ পেতে দাঁড়াতে হয়, তেমনি সমস্ত জীবনে নির্ভীকতার স্বাদ মাঝে মাঝে পেতে হ'লে পাশাপাশি কিছু ভয় থাকা দরকার। চোরের ভয়, ডাকাতের ভয়, দুর্ঘটনার ভয়, বজ্রপাতের ভয়, অসুখের ভয়, আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু ভয়, নিজের মৃত্যু ভয়, এবং তার সঙ্গে ভূতের ভয়। আমার মনে হয় এই রকম নানাজাতীয় ভয় আছে ব'লেই সমাজ-জীবনে আমরা এত সুখে আছি, জীবনের অর্থ বুঝতে পারি, সৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারি। এই সব ভয়ের মূল ভিত্তি হচ্ছে ভূতের ভয়। যদি সমাজ-জীবনকে একটি প্রাসাদের সঙ্গে তুলনা করি তা হ'লে এই সমস্ত ভয়কে সেই প্রাসাদের স্তম্ভ ব'লে মনে হবে। প্রধান স্তম্ভটি হচ্ছে ভূতের ভয়ের স্তম্ভ। এই স্তম্ভটি যদি ভেঙে দেওয়া যায়, তা হলে সমস্ত ভয়ের স্তম্ভ একে একে ভেঙে পড়বে, এবং প্রাসাদটি আর খাড়া থাকতে পারবে না।

আগেই বলেছি ভূতের ভয় দূর করার কথায় হঠাৎ উৎসাহ জাগতে পারে। কিন্তু একটি দূর হ'লে তার সঙ্গে আর সব ভয়ও যে দূর হয়ে যাবে। সমাজজীবনে এত বড ট্র্যাজিডি আর হ'তে পারে না। তাই দ্বিতীয় বার চিন্তা করলে এ কাজে আর উৎসাহ জাগবে না। আমি সেই জন্যই ভূতকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলাম একটি পৃথক বিভাগ খুলে। কিন্তু প্রশ্রয় পেয়ে ভূতেরা নিজেদেরই সর্বনাশ ঘনিয়ে আনছে। দলে দলে এত সচ্চরিত্র ভূত এলে 'সৎ'-এর একঘেয়েমিতে পাঠকেরা বিরক্ত হয়ে উঠবেন, সম্ভবত ইতিমধ্যেই হয়েছেন। সে জন্য অসচ্চরিত্র, গুণ্ডা এবং অমার্জিত স্থূল ভূত কিছু আনা দরকার। জানি এ রকম ভূত ভূত-সমাজে কম আছে, কিন্তু মানুষের পাল্লায় পডলে যে-কোনো সদ্‌ভূতের অসদভূতে রূপান্তরিত হ'তে বেশি দেরি হবে না।

কিন্তু কেউ সে চেষ্টা করছেন না। মানুষ সম্ভবত কল্পনাতেও ভূতের কাছে হীন হ'তে রাজি নয।

এর পরিণাম স্পষ্ট।

কয়েক বছর আগে, ভূতের আবির্ভাবের আগে, আর একটি বিভাগ খোলা হয়েছিল—"প্রতারককে এড়িয়ে চলুন।" তার পরিণাম যা হয়েছিল ভূতের পরিণামও তাই হবে সন্দেহ নেই।

প্রতারকের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে নির্দেশ দেওয়া গেল। আশু তখনও যুগান্তরে সাময়িকী বিভাগে যোগ দেয়নি। সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি দিচ্ছিল সে ভবিষ্যৎ সৃষ্টিমূলক সাহিত্যরচনার পভূমি খুঁজতে বহু অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই তাকে আজ উত্তীর্ণ হয়ে আসতে হয়েছে জনপ্রিয় কথাশিল্পীরূপে। পার প্রাসাদপুরী কলকাতা, প্রতারককে এড়িয়ে চলুন এবং নিষিদ্ধ বই। এ সবই তার অভিজ্ঞতাকে বিস্তার করতে সাহায্য করেছে।

প্রতারককে এড়িয়ে চলুন পর্যায়টির পরিকল্পনা করেছিলাম সমাজ-কল্যাণের উদ্দেশ্যে। ভাল লোকেরা যাতে লোভে প'ড়ে আর না ঠকেন সেজন্য প্রতারণার কৌশল ও প্রতারিতদের ইতিহাস সংগ্রহ করতে বলা হয়েছিল তাকে। এবং সে এসব নিয়মিত সংগ্রহ করছিল পুলিস বিভাগ থেকে। কিন্তু বেশি দিন তাকে এ কাজ করতে হয়নি, কেননা অল্পদিনের

মধ্যেই প্রতারিতরাই নিজেদের কাহিনী লিখতে আরম্ভ করলেন (আহা, ভূতেরাও যদি এই রকম করত!)

প্রথমে সাধারণ প্রতারণা দিয়েই আরম্ভ করা হয়েছিল। মনে হয়েছিল এর একটা সীমা আছে, এবং খুব বেশি দিন এ বিভাগটি চালানো যাবে না। কিন্তু ক্রমে দিন যেতে লাগল, আর দেখতে পেলাম প্রতারক, প্রতারিত এবং প্রতারণা-কৌশলের দিগন্ত, ছোট্ট একটি চক্র থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমেই পৃথিবীর দিগ্‌বলয় রেখার সঙ্গে এককেন্দ্রিক ও একপরিধিসম্পন্ন হয়ে পড়ছে। প্রতারকের সংখ্যা কে গুনবে?

তার মানে হচ্ছে, প্রতারকের সংখ্যা আদৌ কোনো সীমায় এসে শেষ হয়নি, দেখা গেল ক্রমে তার চক্রের মধ্যে সকল মানুষ এসে প্রবেশ করছে। শেষে আমরা নিজেরাও যেন তার মধ্যে গিয়ে পড়ছি এমন সন্দেহ ক্রমেই মনে ঘোর হয়ে আসতে লাগল। অবশেষে প্রতারকের বৈচিত্র্য-গতি এত বেগ পেল যে তার সঙ্গে তাল রেখে চলা আর সম্ভব হল না। ঠিক আলোর গতির মতো। আলো প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে ছুটছে। কোনো বস্তু আলোর গতির চেয়ে বেশি দ্রুত ছুটতে পারে না, এইটি বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন। আমাদের ঐ 'প্রতারককে এড়িয়ে চলুন'-এর ব্যাপারটাও ঠিক তাই হ'ল। এর গতিবে অতিক্রম ক'বে তার বাইরে নিজেদের ধ'বে রাখা গেল না। এর সঙ্গে তাল রাখতে গেলে শেষ পর্যন্ত আমরা নিজেরাও প্রতারক, এ কথা ছাপাব অক্ষরে কবুল করতে হয়, তাই আর ও পথে গেলাম না। নিজেরা প্রতারক-চক্রের একটুখানি বাইরে না থাকলে মান থাকে না, সে জন্য ঐ পর্যায়টি বন্ধ হয়ে গেল আপনা থেকেই।

ভূতের বেলাতেও তাই হবে ব'লে মনে হচ্ছে। প্রথমবারে আমি চেষ্টা করেছিলাম ভূত না নামিয়ে অন্য কোনো দুর্বোধ্য বা রহস্যময় ঘটনার অবতারণা করাতে, এবং দু চারটি তেমন রচনা প্রকাশও করা হয়েছিল কিন্তু ভূতেরা সংখ্যাগুরু হওয়াতে অন্যেরা হেরে গেল। প্রতারকদের মধ্যে অবশ্য দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রবেশ করেনি, তবে প্রাচীনপন্থী বা কনভেনশনাল রীতির প্রতারকদের মধ্যে যেটুকু পার্থক্য তা স্বীকার করা হয়েছিল।

তবে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভূতই হোক আর প্রতারকই

হোক, দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীব হ'লেও দুয়ের মধ্যে একটা বিষয়ে মিল আছে। সেটি হচ্ছে এদের কৌতুকের দিক। সচ্চরিত্র ভূতের যে কল্পনা আমাদের মনে আছে, তার মধ্যে আমাদের অজ্ঞাতসারেই কিছু কৌতুকের অংশ আছে। ভূতের গল্পে সে জন্য আমরা বেশ একটা মজা অনুভব করি অনেক সময়। এরও কারণ, এদের প্রতি আমাদের মনে একটা কৃপামিশ্রিত করুণা আছে।

আমার তো ভূতদের প্রতি বেশ একটা সহানুভূতি আছে। ওদের মতো নিরীহ জীব সংসারে আর কেউ নেই। তাই ওদের কথা বলতে বা ওদের সম্পর্কে কিছু লিখতে আমার ভাল লাগে। তার আরও একটা কারণ, চমক সৃষ্টিতে, অথবা অসাধ্য সাধন করাতে, অথবা কল্পনা যথা ইচ্ছা খেলাতে, ওরা উপকরণ হিসাবে অতুলনীয়। কিন্তু ওদের সম্পর্কে বিশুদ্ধ রিপোর্টের কোনো সার্থকতা নেই।

চোর সম্পর্কেও মানুষ মাত্রেরই মনের গোপন কোণে একটা সহানুভূতি আছে। ওদের কথা ভাবতে গেলেই মনে করুণা জাগে। ভূতের মতোই ওরাও বড় অসহায়। যে চুরির ইচ্ছা প্রতি মানুষের মনেই সুপ্ত থাকে, তাকে ওরা জাগিয়ে তুলে তাকে একটা শিল্পের স্তরে তুলেছে। সেজন্য বহু রকম মনস্তত্ত্বও তাদের জানতে হয়েছে। প্রয়োগ কৌশলটা তাদের উচ্চস্তরের মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়া। অথচ অলক্ষ্যে তাদের কাজ যদি দেখা যেত তা হলে এর কমিক দিকটি নিশ্চয় সবাই উপভোগ করত।

শশিশেখর বসু

বলেছি, আমাদের দেশে ভূত দেখা খুবই সোজা, এবং আমার মনে হয় ঠিক এই কারণেই আমাদের পক্ষে মানুষ দেখা বেশ একটু কঠিন। বৈশিষ্ট্যহীন জনারণ্যে আমরা মানুষকে ঠিকমতো দেখতে পাই না। অথচ আমরা যাদের বৈশিষ্ট্যহীন মনে করি, তারা আসলে তা নয়। তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা ক'রে জগৎ আছে, একটা ক'রে পটভূমি আছে। সেই পটভূমিতে দেখলে প্রত্যেক মানুষই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অণুবীক্ষণে বেশি বাড়িয়ে দেখা জীবাণু যেমন একটি বিশেষ ফোকাসে একটি বিশেষ স্তরে স্পষ্ট

হয়ে ওঠে, এবং তার উপরের বা নিচের স্তরের জীবাণু তখন দৃষ্টির বাইরে চলে যায়, মানুষকেও তেমনি বিশেষ বিশেষ ফোকাসে দেখতে হয়।

পাটনার মণীন্দ্র সমাদ্দার সম্পাদিত বিহার হেরাল্ডে প্রথম Esobss নামক এক অপরিচিত ব্যক্তির লেখা পড়তাম, ভাল লাগত। একদিন মণির কাছে শুনলাম, এ নামটি হচ্ছে S. S. Bose উল্টো ক'রে লেখা। বুঝলাম ব্যঙ্গ কৌতুকের দৃষ্টিতে সাধারণ জিনিস উল্টো ক'রে দেখতে হয় অনেক সময়। এই লেখক নিজের নাম থেকেই ঐ কার্যটি শুরু করেছেন।

তারপর শুনলাম তিনি শশিশেখর বসু এবং রাজশেখর বসুর বড়দা। তখন তাঁর লেখার প্রতি মনোযোগ আরও বেশি ঘনীভূত হ'ল। দেখলাম তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এমন উদার এবং হিংসা-দ্বেষ বর্জিত যে ইনি সত্য কৌতুকরস সৃষ্টিতে সে কারণে এত সফল। তারপর তাঁর সঙ্গে পরে যোগাযোগ ঘটিয়ে ফেলতে কোনো অসুবিধা হল না। ঠিকানাটা আমার বাড়ির কাছাকাছি ছিল, কিন্তু তবু প্রথম পরিচয় হ'ল চিঠির সাহায্যে। চিঠির মধ্যেই সবখানি মানুষটার পরিচয় মিলল। পরম উদার এবং সরল। বয়স ৭৮ বছর, কিন্তু পত্র লিখনভঙ্গিতে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। যেন সমবয়সী বন্ধু।

তারপর দেখা হ'ল। সে এক স্মরণীয় দিন। আমি মানুষটিকে দেখে বিস্মিত হলাম। আমি নাম বলতেই অভ্যর্থনার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। একবার এ ঘরে যান, একবার ও ঘরে। আমার সঙ্গে ছিলেন নিখিলচন্দ্র দাস। তাঁর পরিচয় স্মৃতিচিত্রণে একটু বেশি করেই দেওয়া আছে। নিখিলবাবুও শশিশেখরের কথা শুনে তাঁকে দেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ শশিশেখরকে দেখে হঠাৎ মনে হ'ল যদি কিছু হাসির কথা বলেন এবং নিখিলবাবুর উপর তার প্রতিক্রিয়া হয়, তা হ'লে খুনোখুনি কিছু না ঘ'টে বসে। কেননা হাসতে আরম্ভ করলে নিখিলবাবু তাঁর মোটর নার্ভের সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন, সবটাই হয় তখন রিফ্লেক্স ক্রিয়া। যখন মোটর চালাতেন তখনও হাসিয়ে দিলে মোটরের উপরেও তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকত না। একবার একা চলছিলেন হ্যারিসন রোড দিয়ে। কি এক হাসির কথা মনে পড়ায় এক মারাত্মক কাণ্ড ঘটেছিল। যখন সব ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করলেন তখন দেখেন ওয়াই-এম-সি-এর পাশে তাঁর মোটর আকাশে চার পা তুলে প'ড়ে আছে, এবং তিনি স্টিয়ারিং ছেড়ে

বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। আশ্চর্য কাণ্ড, তিনি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে এসেছিলেন।

সুতরাং আমি শশিশেখরের সামনে খুব সতর্ক রইলাম, দৃষ্টি রাখলাম নিখিলবাবুর দিকে। কিন্তু খুবই সৌভাগ্য বলতে হবে, শশিশেখর সে রকম কৌতুক কথা কিছুই বললেন না, যদিও তাঁর পক্ষে যে সব কথা বলা সম্ভব ছিল ব'লে পরে জেনেছি, তার যে-কোনো একটা বললেই গুরুতর কাণ্ড ঘটে যেত। যে-সব কথা বলায় সামাজিক ভাবে অনেক ক্ষেত্রে নানা বিধি-নিষেধ আছে, শশিশেখরের হাতে সেসব কথা অর্গলহীন অবস্থায় বেরিয়ে আসে। লেখাতে কিছুই আটকায় না। ইংরেজীতে তিনি ছিলেন বেপরোয়া ভাবে স্বাধীন। বিহার হেরাল্‌ডে মাঝে মাঝে এমন লেখা দেখেছি যার বাংলা অনুবাদ ছাপা চলে না।

শশিশেখরকে আমিই বাংলা লিখতে প্রবুদ্ধ করি এবং সেজন্য তিনি তাঁর এই নতুন ভাষা মাধ্যমে মনের কথা বহু লোককে শোনাতে পেরে একটা মস্ত বড় মুক্তির স্বাদ পেয়েছিলেন মনে মনে। সেজন্য আমাকে যেন একটা মস্ত বড় আশ্রয়ের মতো আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন। কি গভীর প্রীতি ও স্নেহের পরিচয় যে পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। তিনি আমার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করতেন, আমাদের বাড়ির সবাইকে সমান স্নেহ করতেন। পাটনা থেকে তাঁর পুত্র মৃগাঙ্ক অথবা পুত্রবধূ শান্তা কিছু পাঠালে আমাকে তার অংশ দিতেন। বাড়ি থেকে উৎকৃষ্ট মাংস রান্না ক'রে মস্ত বড় হাঁড়িতে ক'রে পাঠিয়ে দিতেন তাঁর ভৃত্য কানাইয়ের হাত দিয়ে।

আমি তাঁর যে প্রবন্ধগুলি সাময়িকীতে ছেপেছি, তার একটা সংকলন ছাপা হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পর। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১লা ভাদ্র ১২৮১, মৃত্যু ১৪ই ফাল্গুন ১৩৬১। বাংলা লেখা আরম্ভের পর মাত্র দু বছর বেঁচে ছিলেন। মৃত্যুর খবর পেয়েই প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সঙ্গে গেলাম শেষ প্রণাম জানাতে। সে গম্ভীর পরিবেশে মনটা খারাপ হয়ে গেল। রাজশেখর বসুর মতো স্থির মস্তিষ্ক লোকই সেখানে অবিচলিত থাকতে পারেন।

তাঁর যত লেখা ছেপেছিলাম এবং অন্যত্র ছাপার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলাম তার মধ্যে "বুড়ো সাবধান" নামক রচনাটি সবচেয়ে মূল্যবান মনে হয়েছিল সবার কাছে। অবশ্য তাঁর প্রত্যেকটি রচনাই তাঁর এক অদ্ভুত ঘরোয়া ভঙ্গিতে

লেখা, এবং প্রত্যেকটি উপভোগ্য। তবু "বুড়ো সাবধান" প্রবন্ধে অনেক কাজের কথা ছিল ব'লে বিশেষ ক'রে বয়স্করা প্রবন্ধটিকে খুব পছন্দ করেছিলেন।

কিছু নমুনা দিচ্ছি—"একদিন সার্কুলার রোডে বেড়াচ্ছি, সামনে একটা আমের খোলা পড়ে আছে। নজর হয়নি। পেছু দিকের ভদ্রলোকটি তা দেখে হেঁকে সতর্ক করলেন "বুরা সাবধান।" ফিরে দেখি পূর্ববঙ্গের বন্ধু চাসু—বিলেত ফেরত। আমাদের জেলাতেও 'বুরো' বলে, এটাকে বানান ভুল বা প্রিন্টিং মিসটেক ভাববেন না।

"...এক নব্বই বছরের বৃদ্ধ বলেন, 'অবাক হই ভেবে কেমন ক'রে আমার মোটা বৌকে ত্রিশ বছর বয়সে বিছানায় ক্যাঁক ক'রে ধ'রে বাঁ পাশ থেকে ডান পাশে সরিয়ে দিতাম। এখন তো আমার ছোট্টটো পাঁচ বছরের নাতনীটাকে তুলতেই পারি না।'

"ষাটে পা দিলেই ট্রাম বস্ চড়া বন্ধ করবেন। ফুটপাথেও সাবধান। অনেক বৃদ্ধের ফুটপাথে ফ্রাকচর হয়। প্যারালিসিস ভগবানের হাত, কিন্তু ফ্রাকচর বাঁচান আপনার হাত। তবে কি বিছানায় শুয়ে থাকবেন?... কেতাবে পড়েছি বিছানায় পাশ ফিরতে গিয়েও বৃদ্ধের ফ্রাকচর হয়। তবে তাই—বিছানায় শুয়ে কাজ নেই।

"অতি বৃদ্ধের কি বাঁচবার দরকার আছে? বুড়োরা মনে করেন, আমরা বেঁচে না থাকলে বুঝি পৃথিবী চলবে না। অসুখে প'ড়ে এক বৃদ্ধ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ডাক্তার মশায়, আমি বাঁচবো তো?' ডাক্তার হেসে জবাব দিলেন, 'আপনার আর বাঁচবার দরকার কি বলুন না?' বৃদ্ধ হতাশ হল, মৃত্যুর করাল ছায়া তার মুখ ঢাকলো। তারপর তুমুল রবে—বল হরি হরি বোল।

"অপ্রিয় সত্য বৃদ্ধের প্রাণনাশ করে, মিথ্যা কথায় বৃদ্ধ জোর পান—'কত্তা গো, আপনি দুশো বছর বাঁচবেন।'"

এ রকম গল্পের পর গল্প, কি চমৎকার বলবার ভঙ্গি! আর এক জায়গায় বলছেন—

"এলাহাবাদে রবাই ঘোষ নামে এক বৃদ্ধ ছিলেন, সর্বদা মৃত্যু ভয়ে অভিভূত। নাইনটি নাইন টেম্পারেচারেই 'মধুসূদন, বাঁচাও এ যাত্রা!'

বলে কাঁদতেন। তাঁকে সকলে উৎসাহ দিত, 'ভয় কি রবাই দাদা, আপনার চেয়ে বয়সে বড় মতি ময়রা, তার চেয়ে বেশী বুড়ো রমেশ ডাক্তার। ওরা মলে তবে আপনার পালা।' সামলে নিতেন। একদিন রমেশ ডাক্তার মরলেন। রবাই দাদার কম্প দিয়ে জ্বর এল। 'ভয় কি? এখনও মতে ময়রা বেঁচে।' সামলে উঠলেন। তারপর রোজ খোঁজ নিতেন মতে ময়রা কেমন আছে, ও তার একটু অসুখ হলেই চিকিৎসার খরচ দিতেন।"…

এ রকম সরল সরস ভঙ্গি বাংলা ভাষায় খুব বেশি লেখা হয়েছে কি? অথচ শশিশেখরের নাম নেই অধ্যাপকদের লেখা বাংলা হাস্যরসের বইতে।

শশিশেখর প্রথম প্রথম আমাকে 'আপনি' বলতেন, চিঠিতেও তাই লিখতেন। আমি বললাম, এ বড়ই অন্যায়। আপনি তো বড়দা। তিনি চিঠিতে লিখলেন, 'ব্রাহ্মণ, তাতে আর কি হয়েছে। আচ্ছা আরও কিছুদিন ইয়ার্কি দিই, তারপর তুমি বলব।' এর অল্পদিনের মধ্যেই 'তুমি' সম্বোধন ধরেছিলেন। এ সব ১৯৫৩-এর কথা।

পূজা সংখ্যায় শশিশেখরের লেখা ছাপতাম। আমি একদিন বলেছিলাম বড়দা, রাজশেখরের ছেলেবেলার কথা লিখুন সে বেশ ইন্টারেস্টিং হবে। বড়দা তৎক্ষণাৎ রাজি। এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে লেখা শেষ ক'রে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু তারপর হ'ল মুশকিল। যত দিন যায় তত দেখি বড়দা ভয়ে অস্থির। কারণ রাজশেখর নিজে তাঁর সম্পর্কে ব্যক্তিগত আলোচনা খুব পছন্দ করতেন না, তার উপর তা আবার নিজেরই দাদার লেখা।

লেখার সময় এ কথা খেয়াল হয় নি। লেখা দেওয়ার পর দেখা দিল সমস্যা। রাজশেখর রাশভারী লোক, হঠাৎ যদি ব'লে বসেন, দাদা ও সব লিখো না, তাহ'লে কি হবে?

পরামর্শ সভা বসল আমাদের মধ্যে। ঠিক হ'ল খুব গোপন রাখা হবে ব্যাপারটা। ঘুণাক্ষরে টের পেলে সব উলটে যেতে পারে। আপাতত সমস্যাটা এইখানেই মিটে গেল। কিন্তু শশিশেখরের মন থেকে ভয় দূর হ'ল না। তাঁর এত যত্ন ক'রে লেখা রচনাটি যদি বাতিল হয় তা'হলে তাঁর বড় দুঃখ হবে। নিজে এদিকে অতিরিক্ত রক্তের চাপে ভুগছেন, মাথা ঘোরে যখন-তখন, সে সময় বিছানায় শুয়ে পড়তে হয়, এমনি অবস্থায় আমাদের

কৈলাস বসু স্ট্রীটের বাড়িতে তিনি আসতে লাগলেন। ছেলেমি বুদ্ধিটি পুরোপুরি আছে, অথচ দৈহিক শক্তিতে কুলোচ্ছে না। এ সম্পর্কে তিনি বলছেন "আমি প্রত্যহ দু'ঘণ্টা অন্ধ হ'য়ে শুয়ে থাকি, চোখ বুজলেও ঘরের আকাশে উড়ন্ত চাক্তি দেখি এবং রঙ চঙ করা ভাসন্ত পদ্মফুল।"

নিজের ওই লেখা সম্পর্কে কি পরিমাণ ভয়ে ভয়ে ছিলেন, তা তার কয়েকখানা চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে। আমি বড়দাকে (শশিশেখরকে) লিখেছিলাম "রাজশেখর যতীন্দ্রকুমার সেনের ছবিতে এমন অভ্যস্ত যে অন্য কোনো শিল্পী তাঁর গল্পের ছবি আঁকলে তা তাঁর খুব পছন্দ হয় না। যতীন্দ্র-কুমার কি এখনও ছবি আঁকেন? তাঁকে কি পাওয়া যায় না?" তার উত্তরে বড়দা জানালেন—

"কল্যাণীয় গোস্বামী মহাশয়, রাজশেখরের এখনকার টেলিফোন নম্বর ৩৫৯১ সাউথ।

"যতীনের ঠিকানা পার্শিবাগানে কৃষ্ণশেখরও জানে না। ৭২ বকুলবাগান রোডে সকলে চিঠি দেয়। এটা রাজশেখরের ঠিকানা।

"যতীনের বয়স ৭২। চোখ খারাপ। যতদূর জানি রাজশেখরের ছবি যতীন এখন আঁকেন না।...

"রাজশেখরের ঠিকানায় জিজ্ঞাসা করবেন না কি? কিন্তু তাতে প্রাইভেসি থাকবে না, surprise হবে না।" শশী. ২১।৯।৫৩।

এত কাণ্ডের পরেও বড়দার ভয়! যদি এই উপলক্ষে তাঁর লেখার কথাটা জানাজানি হয়ে যায়।

আর একখানা চিঠি আগে লেখা—"গোস্বামী মহাশয়, যদি কোন রকমে টের পায় তাহলে আমাকে বলবে "ছি ছি ক্যানসেল কর।"

"তার অনুরোধ শুনতে আমি বাধ্য। সে আমার অনুরোধ রেখেছে। অতএব দয়া করে দেখবেন যেন leak না করে!

"একটা ফোটো পাঠাই। এর সঙ্গে তার [রাজশেখরের] মহত্ত্ব কবিত্ব জড়িত। এটা না হলে ইনটারেস্টিং হবে না।

"আপনিই বিচারকর্তা।

"আমি ভাল, আশা করি আপনি ভাল। এখন ত আপনার বেজায় কাজ বাড়বে। প্রণাম—শশী, ২১।৮।৫৩।"

আমি জানিয়েছিলাম এখন তো গোপন করা গেল, কিন্তু যখন পুজো সংখ্যা প্রকাশের আগে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে, তা-তো রাজশেখর দেখতে পাবেন।

আবার সমস্যা, কি করা যায়। ইতিমধ্যে শশিশেখর জানালেন রাজশেখর এসেছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন পূজোয় কি লিখছ? শশিশেখর লিখছেন "এ প্রশ্নে আমি গাঁইগুঁই করে কাটিয়ে দিলাম। দিয়েছি তো কয়েকটা দেখি গোস্বামী মহাশয় কোনটা ছাপেন। জিজ্ঞাসা করা এটিকেট নয়, তাই কিছু জিজ্ঞাসা করি নি।"

আমি শশিশেখরের নির্দেশেই তাকে লিখে জানালাম বিজ্ঞাপনে প্রথমে লিখে দেন শশিশেখর বসুর লেখা—"বাল্যকাল"। তারপর বই যেদিন বেরোবে সেইদিন "রাজশেখরের বাল্যকাল" কথাটি বসিয়ে দিলেই হবে।"

তার উত্তরে শশিশেখর লিখলেন "ধন্যবাদ। ঠিক স্কীম হয়েছে। প্রথম দিকে চাতুরি, যেদিন বই বেরুবে সেদিন ফাঁস। তা নইলে ভয়ানক সীন হতে পারে।

"কবিশেখরকে যে চিঠি দিয়েছি তার কপি [illegible] এবং দিতে হবে না। আমার মুখস্ত আছে।

"যতীন্দ্রকুমার সেন রোজ রাজশেখরের বাড়ি [illegible] থেকে সন্ধ্যা আড্ডো দেন। তাঁর শুনতে পাই কেবল বেঙ্গল কেমিক্যালের ছবি আঁকেন। টেলিফোন রাজশেখরের বাড়িতে করলেই হবে. South 932

"কিন্তু জানাজানি হওয়াই সম্ভব। যতীনের ঠিকানা আমি আপনাকে কাল খামে পাঠাব সকালে। প্রাইভেট চিঠি। লিখলেও ফাঁস হয়ে যাবে বোধ হয়।" (১।৯।৫৩)

ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে কত রকম আতঙ্ক এবং কত রকম ছলনা। অথচ যে লেখাটি তিনি আমাকে দিয়েছিলেন তাতে ভয়ের তো কিছু ছিলই না, সংকোচেরও কিছু ছিল না। শুধু রাজশেখরের চরিত্র স্মরণ করেই তাঁর যত সংকোচ। রাজশেখরের চরিত্রের সেই দিকটি, যার জন্য শশিশেখরের এই ছলনা, সে দিকটির সঙ্গে পরে আমারও পরিচয় ঘটেছিল। সে কথা পরে বলা যাবে।

১৯৫৩ সালের বিজয়ার পরে শশিশেখর আমাকে এই চিঠি লেখেন—

১৪৩।বি বিবেকানন্দ রোড

"স্নেহাস্পদেষু,

"বৃদ্ধের অকৃত্রিম প্রীতি আলিঙ্গন ও গোটাকতক কবিতা বিজয়ার ভেট নেবেন। এ পূজায় সকল ম্যাগাজিনে প্রায় লিখেছেন দেখছি।

"আপনি গদ্য লেখেন, তবে আপনাকে পদ্য উপহার দিই কেন? আপনার সমালোচক একজন লিখেছেন আপনি 'রোদনভরা হাসি' লেখেন। তাই এই রোদনভরা কবিতা দিলাম। পার করে কবিতা দিলাম আমার নিজের নয়। আপনি যে রকম বিলাতি চোরদের উপর সহানুভূতি দেখাচ্ছেন তাতে বিলাতি চোরাই মাল দিতে দোষ নেই। যাঁর জিনিস চুরি করেছি তাঁকেও পাঠালাম আলিঙ্গন সমেত। তার কপি ওপাতে দিলাম। দেখবেন।

"তাঁর কবিত্বের সীলমোহর আপনিই আমার মনে আগে ছাপ মেরেছিলেন, হয়তো না জেনে। তার পর আমার ভাই, তার আর দুই বন্ধু, আমাকে তার কবিতায় দীক্ষিত করল। তারাও বোধ হয় ঠিক জানে না কি রকমে আমাকে দীক্ষিত করা।—শুভার্থী দাদা আশীর্বাদক শশিশেখর বসু"

এই চিঠিতে বিলাতি চোরদের কথা লিখেছেন, বিলাতি চোরদের সম্পর্কে আমার লেখা 'নষ্টচন্দ্র' প'ড়ে। যে কবির কথা বলেছেন তিনি কবিশেখর কালিদাস রায়। কালিদাসের যে কয়েকটি কবিতা তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন, এবং তা সম্ভবত বিহার হেরাল্ডে প্রকাশও হয়েছিল।

শশিশেখর যে চিঠির নকল আমাকে পাঠাচ্ছেন লিখেছেন, সেখানা কালিদাস রায়কে লেখা। সে চিঠিতে তিনি লিখছেন—"আপনার কবিতার উপর আমার একগুণ অনুরাগ পাঁচ জনে মিলে দশগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। নিদ্রা না হলে এখন আমি বায়রন আওড়াই না—

My days are in the yellow leaf

The flowers and fruits of love are gone

এখন একলাই বসে মুখস্থ আওড়াই—

চণ্ডীদাস বিমণ্ডিল শিব হীরক কিরীটে তারে

জ্ঞান গোবিন্দ বৃন্দাবনের কুন্দকুসুম হারে।"

এর পূর্বের চিঠিতে রাজশেখরের ছেলেবেলা প্রবন্ধের সঙ্গে যে ফোটোগ্রাফ পাঠানোর কথা আছে, সেখানা শশিশেখরের স্ত্রীর ফোটোগ্রাফ।

শশিশেখরের সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তাঁর সঙ্গেই একদিন গিয়ে আমি রাজশেখরের সঙ্গে প্রথম আলাপ করি। ঠিক হয়েছিল তিনি বিবেকানন্দ রোড থেকে কৈলাস বসু স্ট্রীটে এসে আমাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নেবেন। অত্যন্ত অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার জন্য এতটা ঝুঁকি নিতে রাজি হয়েছিলেন এতে তাঁর মহৎ মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর এই চিঠিখানায় রাজশেখর দর্শনের খবর পাওয়া যাবে—শশিশেখর লিখছেন, "গোস্বামী মহাশয় প্রণাম,—কাল (২৮।৮।৫৩) শুক্রবারে সকালে আপনাকে আমি তুলে নেব। আমি চাকর পাঠিয়ে আপনাকে খবর দেব, আমি নিচেই গাড়িতে বসে থাকবো।

"৮টার সময় আমি আপনার কাছে পৌঁছব। আপনার কাল সুবিধা হবে তো? না হয় তো অন্যদিন ঠিক করে জানাবেন।

"Appointment করা শক্ত, হয় তো সেদিন মাথা ঘুরবে!

"আমি যদি ৮টার মধ্যে না পৌছতে পারি, বুঝে নেবেন যাবার ঠিক নেই, যাব না।

"I am anxious to finish the introduction soon, which is a great duty for me

আপনার শশিশেখর বসু

২৭-৮-৫৩"

আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম, শশিশেখর পরদিন দূত মারফৎ এই চিরকুটটি পাঠালেন--"গোস্বামী মহাশয়, আমি এসেছি। আপনার জন্য গাড়িতে অপেক্ষা করছি।—শশী, ২৮।৮।"

এই লিখনটুকু তিনি বাড়ি থেকেই লিখে এনেছিলেন। তাঁর কাজে খুব শৃঙ্খলা ছিল, উপরের প্রথম চিঠিখানার যে অংশটুকু ইংরেজীতে লেখা, সেটুকু তাঁর নিজ হাতে টাইপ করা। সব সময় প্রায় টাইপরাইটার নিয়ে ব'সে থাকতেন, বিহার হেরাল্ডে নিয়মিত লিখতেন। সেখানে আমার কয়েকটি গল্পের অনুবাদ ছেপেছিলেন। মারকে লেঙ্গে ও ব্ল্যাক মার্কেট এই দুখানা বইয়ের কয়েকটি গল্প—সংখ্যা মনে নেই, অন্তত তিনটি, মনে আছে। তার বেশি না বোধ হয়।

প্রথম বইখানা পাঠানোর পর লিখছেন—"গোস্বামী মহাশয় প্রণাম, মারকে

লেঙ্গে···পেয়ে মহা গৌরব বোধ করছি। আজ পড়তে আরম্ভ করবো অন্‌ডারলাইন করে। পরে পাটনা পাঠাব। [পুত্র ও পুত্রবধূর কাছে]।

"ইতশ্চেতঃ পড়লাম, আমাদের পাড়ার হিন্দুস্থানী এত বড লোক যে তাদের কাছে ভিক্ষা চাইলেই বলে বাঙালী।

"কবিশেখর মহাশয়ের (যুগান্তর সাময়িকীতে ছাপা) প্রবন্ধ দাগ দিয়ে দিয়ে পড়চি। অতি চমৎকার। বোধ হয় যেন আমার গুরু মহাশয়কে (১৲ মাইনে) দেখে লিখচেন। আমি বাবার তামাক চুরি করে নিয়ে তাঁকে দিতাম। ধন্যবাদ।—শশী, ৩০।৮।৫৩।"

আমি ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে শশিশেখরকে বলেছিলাম, আপনার নিজের জীবন-কথা একটখানি লিখে দিন, খুব ইনটারেস্টিং হবে। বলেছিলেন 'না না, সে কেমন হবে।' তারপর কিছুদিনের মধ্যেই যুগান্তর সাময়িকীর জন্য একটা লেখা তৈরি করলেন—তার নাম দিলেন "নির্বিকার নির্বিচার শশিশেখর।" আমাকে জানালেন, লেখা তৈরি।

কিন্তু লেখাটি নিয়ে দেখি নিজে নিজের কথা লিখছেন না, অন্যের হয়ে লিখছেন। অথচ কে যে লিখছেন তাঁর নাম নেই। তখন আমি আমাদের বুড়োদা অর্থাৎ প্রেমাঙ্কুর আতর্থীকে ধরলাম, দাদা, বিপদ উপস্থিত—বাঁচান। লেখাটি আপনার নামে ছেপে দিচ্ছি। সর্বংসহ প্রেমাঙ্কুর রাজি হলেন, এবং আমিও আরাম বোধ করলাম। সেটি ছাপা হয়েছিল যুগান্তর সাময়িকীতে ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩-তে।

লেখাটির আরম্ভ ছিল এই রকম—"শশিশেখর নামের উপর নিবিড মেঘের ছায়ার মতন ম্লেচ্ছ ইংরেজী ছদ্মনাম এস এস. বসু ঢাকা আছে। হঠাৎ তাঁকে বাংলা কলম ধরতে দেখে এই ধূমরাশি বেষ্টিত প্রাচীন বহুজনবিদিত নামকে ইংরেজী বন্ধনলতা ছিন্ন ক'রে বাংলা সাহিত্যের হাটে বসিয়ে অনেকেরই ইচ্ছা হয়েছে জিজ্ঞাসা করেন কস্ত্বং? নতুন না আশি বছরের পুরাতন কলম?

"পশ্চিমের এক বিখ্যাত কাগজ একবার পাঠকদের আগ্রহ মিটিয়েছিল এস. এস. সত্য না মিথ্যা? [এই প্রশ্ন তুলে।] তা প'ড়ে স্টেটসম্যান (১৮-৯-১৯০৩) লিখল "বাংলা দেশে এঁর পরিচয় দান বাতুলের কাজ। ঘরোয়া কথার মতন এস. এস. বোস নাম পাঠকের মুখে মুখে আছে।

…"শশিশেখর বলেন, আমি সাহিত্যিক নই, সাহিত্য পড়ি না, বুঝি না।' অথচ শোনা যায় তিনি জয়দেব চণ্ডীদাস মধুসূদন বায়রন শেক্সপীয়ার ইত্যাদি অনর্গল আউড়ে যান। তিনি বলেন, 'আমি সাংবাদিক নই, একবার মাত্র একটি ডেলি পেপার এডিট করেছিলাম, কিংবা নিউজ সিনডিকেট খুলেছিলাম ব'লে আমাকে সাংবাদিক বলতে পারেন। তেমন তো আমি নৌকার ব্যবসা করেছিলাম, তা ব'লে কি আমি মাঝি?

"…বলেন বটে সাহিত্যিক নই কিন্তু অনেক বৃদ্ধ পাঠক স্টেটসম্যানের এই লীডিং আর্টিকল পড়েছেন—

"In the paragraph (in the moral and material progress in India, 1903-4) dealing with the publication in the U. P., the only piece of literature in the proper sense is said to be the Humorous Sketches by Mr. S. S. Bose who will doubtless be flattered and gratified by this official notice—Stasesman 25-8-05.

"দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যোগীন বোস, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এঁকে পূর্ণিমা সম্মেলনে নিয়ে যেতেন এবং অন্যান্য বিখ্যাত লোকদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেন। এভাবে তিনি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।"

শশিশেখর বসু বাংলায় বরাবর লিখবেন বলেই প্রস্তুত হয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা আর হ'ল না তাঁর হঠাৎ মৃত্যুতে। মাসিক বসুমতীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম এবং কয়েকটি কৌতুক প্রবন্ধ ছাপাও হয়েছিল।

রাজশেখর সন্দর্শনে

একটা গল্পে পড়েছিলাম এক ভদ্রলোক কয়েকজন লোককে উপদেশ দিচ্ছিলেন—"সব কাজেই নিচে থেকে আরম্ভ ক'রে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে হয়, এক লাফে উপরে ওঠা যায় না। জীবনে সফল হ'তে হ'লে নিচে থেকেই কাজ আরম্ভ করতে হবে।"

একজন শ্রোতা তা শুনে বলল, "আমার দ্বারা তা হবে না মশায়।" "কেন হবে না?" "হবে না, কারণ আমি কুয়ো খুঁড়ি।"

আমার অবস্থাও প্রায় এই লোকটার মত। আমিও উপর থেকে খুঁড়ে নিচে নামছি। প্রথমে বড়দা শশিশেখর, তারপর মেজদা রাজশেখর। (তার আগে অবশ্য গিরীন্দ্রশেখরকে দেখেছি, তাঁর গবেষণাগত রচনা-পাঠ শুনেছি, কিন্তু অপরিচয়ের দূরত্ব থেকে।)

রাজশেখরের সঙ্গে দেখা হওয়ার পূর্ব-প্রস্তুতির কথা আগেই বলেছি। শশিশেখর কৈলাস বসু স্ট্রীটের বাড়ি থেকে আমাকে তুলে নিলেন ২৮শে অগস্ট (১৯৫৩)। আমরা পৌনে আটটায় রওনা হয়ে ৭২, বকুল বাগান রোডে গিয়ে পৌঁছলাম। রাজশেখরকে আগেই সংবাদ দেওয়া ছিল। নিচের তলায় তাঁর বসবার ঘরে গিয়ে বসলাম। বড় একখানা টেবিল, তার একদিকে রাজশেখর, বিপরীত দিকে আমরা।

অল্প দু-একটা কথায় আমাদের আলাপ আরম্ভ হ'ল। রাজশেখর স্বল্পবাক। আমি প্রায় হতবাক। গুণী লোকের সান্নিধ্য কেমন একটা অদৃশ্য রশ্মি বিকিরণ করতে থাকে। মনের চোখে মাত্র তা ধরা পড়ে। তার মধ্যে আনন্দ, বিস্ময় এবং আরও বহু রকম সূক্ষ্ম এবং অস্পষ্ট ভাব মিলিয়ে থাকে। তাই সে সময়কার মনের অবস্থা ঠিক বুঝিয়ে বলা যায় না।

তাই প্রথমেই আলাপ ঠিক জমল না। তারপর একটু একটু ক'রে অবস্থা সহজ হয়ে এলো। কথা রাজশেখরই বলতে লাগলেন বেশি। আমি তাঁকে শুধু দেখতে এসেছি। তাঁর মূর্তি ছাপা-ছবিতে ভিন্ন দেখি নি। কিন্তু তবু আমি তাঁকে দেখেছি। দেখেছি শ্যামানন্দের ভিতর, গাণ্ডেরিরামের ভিতর, পেলব রায় বিরিঞ্চিবাবার ভিতর। জগদ্‌গুরু, নাদু মল্লিক, আই কেদার চাটুজ্জে নো জু গার্ডেন, জাবালী, নন্দলাল ইত্যাদি সবার মধ্যেই দেখেছি তাঁকে। কিন্তু সামনে যিনি প্রত্যক্ষ তাঁকে দেখে, অন্তত তাঁর মুখ দেখে বোঝবার উপায় নেই তিনি নাদু মল্লিক না বিরিঞ্চি বাবা।

এর কয়েক দিন আগে 'নিকষিত হেম' নামক একটি গল্প পাঠিয়েছেন আমাকে যুগান্তর পূজা-সংখ্যার জন্য। সেই প্রসঙ্গে রাজশেখর বললেন, গল্পটা অন্য একখানা কাগজের জন্য লেখা ছিল, আপনি পেয়ে গেলেন। আমি

বললাম, আমি আদায় ক'রে নিয়েছি, সমস্ত পাপ আমার, সব পাপ কাসেম আলির, আপনি শুধু গল্প দিয়ে খালাস।

একটুখানি মৃদু হাসলেন শুনে।

পাঠকদের সংক্ষে মনে করিয়ে দেবার দরকার নেই যে, কাসেম আলির প্রসঙ্গটা শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্প থেকে নেওয়া।

শুনলাম রাজশেখর কারও অনুরোধ পেলেই লিখে দেন না, শীতকালে অবসর সময়ে নিজের মন থেকে লিখতে আরম্ভ করেন। অর্থাৎ চাপে প'ড়ে লেখার অভ্যাস নেই। কথাটা শুনেই একটা আঘাত পেলাম। নিজের অবস্থাটা স্মরণ করলাম। চাপে না পড়লে যে কখনও কলম ধরে না, তার কাছে এটি একটি আশ্চর্য সংবাদ। শুনেছি বিধাতা আনন্দ থেকে বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করেছেন। বিধাতাকে অনুকরণ করি নি কখনও, তাই সে অভিজ্ঞতাও আমার নেই। কারও আছে শুনলে চমকে উঠি।

শশিশেখর আমার ডান ধারে বসে আছেন। তিনি কানে কম শুনতে আরম্ভ করেছিলেন তাই রাজশেখরের মুখের মৃদু স্বরের কথা তাঁর কানে যাচ্ছিল না। রাজশেখরও কানে তখন কম শুনতেন, কিন্তু খুব বেশি কম নয়। তিনি তাঁর বড়দার প্রসঙ্গ তুললেন। বড়দা নির্বিকার। তিনি আমাকে তাঁর প্রতিশ্রুতি ও ইচ্ছামত সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন। অসুস্থ মানুষ, কিন্তু অত্যন্ত ভাল মানুষ বলেই আমার জন্য এতটা কষ্ট স্বীকার করলেন। তিনি যে কি পরিমাণ ভাল মানুষ ছিলেন, তার পরিমাপ করা আমার সাধ্য নয়। আজ তাঁকে স্মরণ করলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হই, আনন্দে চোখে জল আসে।

রাজশেখর বলতে লাগলেন "আপনি দাদাকে বাংলা লেখাচ্ছেন, কিন্তু উনি বরাবর ইংরেজীতেই লিখেছেন। দাদার Marriage of Elephants অদ্ভুত ভাল রচনা। ভেবেছিলাম আমিই ওটা থেকে বাংলা অনুবাদ করব, কিন্তু এখন বোধ হয় দাদাই পারবেন।

দাদা কিন্তু পাশে বসে আছেন চুপ ক'রে। অসুস্থ বোধ করছেন মনে হ'ল।

এই সময়ের কিছু আগে 'কথা সাহিত্য' মাসিকপত্র রাজশেখর বিশেষ সংখ্যা রূপে দেখা দেয়। তাতে আমার একটি রচনা ছিল। লেখাটির নাম

ছিল 'মহাবিদ্যা'র জগদ্‌গুরুর উদ্দেশে। (এই রচনাটি আমার ম্যাজিক লণ্ঠন নামক বইতে সঙ্কলিত হয়)।

লেখাটির প্রথম দিকটা একটুখানি উদ্ধৃত করি।—

"জগদ্‌গুরু, তোমার কাছ থেকে মহাবিদ্যার পাঠ নেবার জন্য তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু কেউ কি তোমার ঠিকানা জানে? তুমি যে-অমৃতের অধিকারী তার একটুখানি না পেলে যে আর চলে না। সবাইকে প্রশ্ন করি, তুমি কোথায়! যে অমৃত লুকানো তোমায় সে কোথায়!

"শুনতে পাই ওরা দীক্ষা নিয়েছে; সেই ওরা—সেই হোমরাও সিং, চোমরাও আলি, লুটবিহারীর দল।

"কিন্তু শুধুই কি শুনতে পাই। বুঝি না কি। মর্মে মর্মে কি উপলব্ধি করি না প্রতিদিন?

"করি জগদ্‌গুরু।

"চায়ে যখন মিষ্টির টান পড়ে। খেতে বসে যখন দাঁতে পাথর ভাঙি। যখন কাপড় কিনতে গিয়ে জাল এবং ওষুধ কিনতে গিয়ে জল কিনে আনি। একসের ওজনে যখন তেরো ছটাক পাই। তখনই তো বুঝতে পারি এ তোমারই মায়া।"...

'রাজশেখর বিশেষ সংখ্যা'য় এই লেখাটি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জগদগুরুর শিষ্য হয়ে দেশসুদ্ধ লোক সুখে আছে, আমিও তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, এ সব কথা সর্বভারতীয় চোরের রাজত্বে সবাই খুব পছন্দ করেছিলেন। গড্ডলিকা বইয়ের মহাবিদ্যার জগদ্‌গুরুও চুরি বিদ্যা শেখানোর জন্য কলেজ খুলেছিলেন। (কলেজই বলা চলে, কারণ কলেজকেও মহাবিদ্যালয় বলা হয়)।

রাজশেখরও বললেন আমি লেখাটি পড়েছি। আমার 'মহাবিদ্যা' কিছু দুর্বল ছিল।—কিন্তু আপনি ওকে উদ্ধার ক'রে ওর মর্যাদা দিয়েছেন।

আমি বললাম, মহাবিদ্যা একটি উৎকৃষ্ট স্যাটায়ার, সেই জন্যই আমি তার ভিতর থেকে আপনার জগদ্‌গুরুকে বেছে নিয়েছি।

এই লেখাটি অনেকে পছন্দ করেছিলেন। এবং কেন করেছিলেন তার হেতু বর্ণনা করেছিলেন শশিশেখর। তিনি একখানা চিঠিতে আমাকে জানিয়েছিলেন, সকল মানুষের মধ্যেই একটি ক'রে চোর আছে, সেজন্য চোরদের কথা আমাদের এত ভাল লাগে।

বর্তমান সাহিত্য সম্পর্কে কথা উঠল। তিনি ভাষার উপর জোর দিলেন। বললেন ভাষার অনাচার হচ্ছে খুব বেশি, একে আটকানো যাচ্ছে না। বললেন ইংরেজীর যে সব পরিভাষা তৈরি হয়েছে তার ব্যাপক ব্যবহার হয় তো দেরিতে হবে। বললেন, তাঁর রচিত পরিভাষাই সরকার বেশির ভাগ নিয়েছেন। ব'লে একখানি পরিভাষার সংকলন ড্রয়ার থেকে বা'র ক'রে আমাকে দেখালেন।

বাংলাভাষায় অতিরিক্ত ছেদের চিহ্নের ব্যবহার বা পাংচুয়েশনের বাড়াবাড়ি তাঁর ভাল লাগে না। আমি বললাম রবীন্দ্রনাথ তো জিজ্ঞাসার চিহ্ন কদাচিৎ ব্যবহার করেন। জিজ্ঞাসার চিহ্নের স্থলে দাঁড়ি। আরও প্রাচীন বাংলায় দাঁড়ি পর্যন্ত ব্যবহার হয় নি, কমা তো নয়ই। বললাম, এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থা করা যায় না। কোনো ইংরেজের লেখায় পড়েছি, তিনি তাঁর কোনো লেখার বিশেষ স্থানের কমা ছাড় গেলে বড়ই বিচলিত হয়ে পড়তেন। আরও বললাম, অনেক সময় পাংচুয়েশনের ভুলে ভয়ানক সব কাণ্ড ঘটতে পারে। আমি প্রায় চোদ্দ বছর আগে একটি গল্প লিখেছিলাম যাতে চিঠিতে যথাস্থানে একটি কমা না থাকাতে নায়ক-নায়িকার মধ্যে চূড়ান্ত ভুল বোঝাবোঝি হয় এবং শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ হয়।

এইভাবে আরও দুএক মিনিট কথা চলার পরই রাজশেখর একটুখানি অস্থির বোধ করতে লাগলেন, তাই আলাপ ঐখানেই বন্ধ ক'রে সেদিন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম। 'কার্যকরী' কথাটা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তিনি শুধু এই কথাটা উল্লেখ ক'রে বলেছিলেন, এ রকম কত যে কথা বাংলা ভাষাকে নষ্ট করেছে তার শেষ নেই। এ বিষয়ে তিনি এর দুবছর পরে একখানা চিঠিও দিয়েছিলেন আমার এক চিঠির উত্তরে।

কার্যকরী কথাটা কি ক'রে যে চলছে তা বোঝা যায় না। আমি নিজে অবশ্য এ শব্দ ব্যবহার করি না, যেমন করি না লজ্জাকরী, দুষ্করী বা অপমানকরী। কার্যকর লজ্জাকর দুষ্কর এবং অপমানকর কথাই ব্যবহার করি। ১৯৫৫তে রাজশেখর আমাকে যে চিঠিখানা লিখেছিলেন সেখানা এই—

৭২, বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫
২২-৭-৫৫

প্রীতিভাজনেষু

আপনার ২১ তারিখের চিঠি গতকাল পেয়েছি। খবরের কাগজে (এবং অনেক নামজাদা লেখকের বইএ) নিরঙ্কুশ বাংলা ভাষার সৃষ্টি হচ্ছে, তাতে বাধা দেওয়ার শক্তি কারও আছে মনে হয় না। 'কার্যকরী হওয়ায়', 'কলিকাতায় গ্রীষ্মের দাবদাহ' (forest fire) ইত্যাদি নিত্য নূতন idiom দেখা যাচ্ছে। দণ্ডদার বই পুজোর আগে বার হবে, গজেনবাবু এই আশা দিয়েছেন। আপনার কাছেও অন্য বই পাঠাতে বলেছি।

আপনার
রাজশেখর বসু

সেদিন রাজশেখরের কাছ থেকে হঠাৎ বিদায় নিয়ে আসায় মনের যেন একটা অতৃপ্তি রয়ে গেল, কিন্তু উপায় ছিল না। শশিশেখরের গভীর স্নেহের উপর এভাবে অত্যাচার করতেও লজ্জা কম পেলাম না। কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য হ'লেও রাজশেখরের প্রীতির পরিচয় পেয়ে ধন্য হলাম। তিনি মৃদুস্বরে কথা বলেন এবং কম কথা বলেন, কিন্তু মানুষটির পরিচয় তাতে গোপন থাকে না।

রাজশেখর বসু সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা নেন নি কখনও। এইখানে তাঁর গুরু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য স্পষ্ট। প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানী হয়েও ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ছিলেন, আদর্শবাদী ছিলেন, বাঙালীকে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে সমস্ত জীবন চেষ্টা করেছিলেন। বিজ্ঞানী-চরিত্রের সঙ্গে খুব মেলে না। আর রাজশেখর সাহিত্য সাধনার মধ্যেও বিজ্ঞানীর মনোভাবটি বরাবর রক্ষা ক'রে গেছেন। তিনি সমাজের অন্যায় ও অসঙ্গতি মানুষের শঠতা প্রতারণা প্রভৃতিকে সাহিত্যের মধ্যে একই সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন এবং রসমণ্ডিত করেছেন। কোথাও কাউকে উপদেশ দেন নি। প্রবন্ধেও না, গল্পেও না। এ রকম ঠাণ্ডামাথা, যাকে সোজা বাংলায় বলে স্থিরমস্তিষ্ক—লোক সহজে দেখা যায় না। রাজশেখরের এই অনুদ্বিগ্ন এবং অনেকটা উদাসীন (হয় তো বা বাইরের দৃষ্টিতে উদাসীন)

চরিত্র দেখে মনে হয় প্রবণতা থাকলে তিনি উঁচু দরের খুনী হতে পারতেন। নিজে সম্পূর্ণ অবিচলিত থেকে একের পর এক মানুষ খুন ক'রে যেতেন। কিন্তু প্রবণতা ছিল এর বিপরীত। বন্দুক দিয়ে পাখী শিকার করতে পারতেন না, গাছের ফল লক্ষ ক'রে গুলি চালাতেন। নিরামিষ খেতেন ছেলেবেলা থেকে।

দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা হবার কৌশল তিনি সম্ভবতঃ ছেলেবেলা থেকেই জানতেন। পরবর্তীকালে যে জীবনদর্শন তাঁকে স্থিরচিত্ততায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল তা তাঁর একখানি চিঠিতে কিছু পরিমাণ প্রকাশ হয়েছে।

চিঠিখানা লিখেছিলেন ১৯৫৭ সালের ৭ই জুলাই তারিখে। তখন আমার পারিবারিক একটি সঙ্কটকাল উপস্থিত। তিনি লিখছেন—

…"চুপ করে সয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। মহাভারতের সেই শ্লোক—সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ম্‌ প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ (সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় যা পাবে অপরাজিত হৃদয়ে মেনে নাও)—এর চাইতে ভাল উপদেশ নেই।"

রাজশেখর চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হ'লে বুঝতে কষ্ট হয় না যে এ উপদেশ তিনি বাইরে থেকে লৌকিকতারূপে বর্ষণ করেন নি, নিজের সমস্ত অন্তরের বিশ্বাস থেকে করেছেন, এবং এটি তাঁর শুধু বিশ্বাস ছিল না, ধর্ম ছিল।

শশিশেখরকে আমি ইংরেজী ছাড়িয়ে বাংলা লেখায় উৎসাহিত করেছি এজন্য রাজশেখর আমার প্রতি প্রীত ছিলেন। শশিশেখরের খুব প্রশংসা করতেন তিনি, এবং কুলগাছান রোড থেকে মাসে অন্তত একবার বিবেকানন্দ রোডে 'বড়দা'কে দেখতে আসতেন। ১১-১০-৫৭ তারিখে আমাকে রাজশেখর একখানা চিঠি পাঠান—

প্রীতিভাজনেষু,

আমার বিজয়ার নমস্কার জানবেন। আপনি সন্তানসহ সুস্থ থাকুন, শান্তিলাভ করুন, এই কামনা করি।

আমার দাদার একটি হিন্দী কবিতা আমার এক ভাইঝির কাছে আছে। তার নকল এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে কালীপূজার সময় যুগান্তরে প্রকাশ করতে পারেন।

আপনার
রাজশেখর বসু

মা যা হইয়াছেন

শশিশেখর বসু

কহো কালী হামে
কৌন লুটা তুমে
খোপড়ি তোড়েগা হাম।
বোলো মা কালিকে
তুমাবা শাড়ি কে
কিতনা থা মায়ী দাম?
শাড়ি মোল দেগা,
তুমহে পিনাহে গা,
এহি তো বেটাকে কাম।
যহাঁকে বঙ্গালি,
ঝুট মুট কালী
দেওয়ে ফুল কেলা আম।
ঝুটে মা-মা বোলে
খুব চন্দহ্ মিলে,
রুপয়া উস্থুল কাম।
চন্দহ্ কি রুপয়া
সব গল্ গয়া
খানা পিনা ধুমধাম।
বোম বোম কালী
কলকাত্তা বালী
তোবা তোবা রাম নাম॥

রাজশেখর জানতেন না, এই কবিতাটি কিছুদিন আগেই আমি শশি-শেখরের কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রে ছেপে দিয়েছিলাম।

১৯৫৫ সালের ৯ই অগস্ট তারিখে রাজশেখর আমাকে লেখেন—

"'যা দেখেছি যা শুনেছি' এই নাম দিয়ে দাদার একটি রচনা-সংগ্রহ ছাপা হচ্ছে।...আপনার উৎসাহেই দাদা বাংলা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সেজন্য আমার ইচ্ছা—তাঁব বই-এর একটি ছোট ভূমিকা আপনি লিখে দেন।..."

এ আদেশ আমি পালন করেছিলাম। কিন্তু আমার ভূমিকায় যে অংশে সামান্য একটুখানি রাজশেখরের কথা ছিল, সেই অংশটুকু তিনি সযত্নে বাদ দিয়ে পরিবর্তিত আকারের ভূমিকাটি আমাকে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। দাদার বইয়ের ভূমিকায় নিজের নাম জড়িত ক'রে দাদার গৌরব বাড়ানোর কল্পনা সম্ভবত তাঁর পছন্দ হয় নি। এই জিনিসটি আমার খুব ভাল লেগেছিল।

ভূমিকায় শশিশেখরের চরিত্রের একটি দিকের কথা আছে। তিনি বলতেন, শব্দ ব্রহ্ম। কোনো শব্দই খারাপ নয়। সেজন্য তাঁর মুখে বা কলমে

কিছু আটকাত না। বুঝতেও পারতেন না যে, তা আধুনিক বিচারে শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সেজন্য তাঁর লেখা থেকে অপ্রকাশিতব্য শব্দ বা কথা বাদ দিয়ে নিতে হ'ত। তাঁকে লিখে জানিয়ে দিতাম—বড়দা, এখন এসব চলে না। বড়দা ক্ষুব্ধ হতেন শুনে। কারণ স্বাধীনভাবে লিখতে না দিলে তাঁর লেখাই হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে।

তাই একবার তিনি আমাকে 'ভূমিকম্প' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠিয়ে তার সঙ্গে চিঠিতে লিখেছিলেন—(১৯-১২-৫৪)।

"ভূমিকম্প পাঠালাম, একদম নিরামিষ। ভাই, কৈলাস বোস স্ট্রীট ও বাগবাজারে যাতে আপত্তি, তাতে তো বঙ্কিমের আপত্তি নেই।

যথা—"দুর্লভ ছোটে। হায় কাছা খুলিযা গিয়াছে।" (দেবী চৌধুরাণী) ১ম খণ্ড।

"ছুটিতে যুবতীদের কাপড় খুলিযা পড়ে।" (ঐ ৩য় খণ্ড)।

"কি রে মাগী!"—চন্দ্রশেখর (মাগী দেদার)।

"ভাই একটু লাইসেন্স না দিলে আমার নাম ডুববে। ভূমিকম্প প্রবন্ধে এসব কিছু নেই। ভুঁইকম্পে যখন ছুটছিলাম, তখন কাছা ঠিক ছিল।" —শশিশেখর।

'যা দেখেছি যা শুনেছি' বইয়ের ভূমিকায় এই চিঠি এবং অন্য আরও একখানা চিঠি উদ্ধৃত করেছিলাম শশিশেখরের চরিত্র উদ্‌ঘাটনে। "ভাই একটু লাইসেন্স না দিলে আমার নাম ডুববে।"—এই একটি কথায় সবখানি চরিত্র প্রকাশিত।

রাজশেখর বসু যে স্থিরচিত্ত ছিলেন এবং কিঞ্চিৎ একান্তে বাস করতে ভালবাসতেন, তার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় শশিশেখরের লেখা রাজশেখরের বাল্যকাল প্রবন্ধে। তিনি এক জায়গায় লিখছেন—

"দ্বারভাঙায় পড়ার সময় রাজশেখরের বয়স যেমন বাড়তে লাগল, তার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য এবং সায়েন্স বাড়তে লাগল। আমরা ভাই-ভগ্নী ও বাঙালী ঝি রাই, চণ্ডী ও গোবিন্দ বামনিকে নিয়ে থিয়েটার করতাম। রাজশেখর রামতারণের দোকান থেকে বাংলা ছ' আনা দামের নাটক পছন্দ ক'রে আনত, ও নিজে পার্ট না নিয়ে ডিরেক্‌শন দিত। আমি কৈকেয়ী সাজতাম, রাই ঝি দশরথ সেজে আমার মান ভাঙাত।...রাজশেখর কখনো

বিদ্যা ফলাত না। পেটের মধ্যে বিদ্যে পুঁজি করা থাকত। কেউ জিজ্ঞাসা করলে তবে বলত।"

এর পর আর একটি দিন আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। সে দিনটি ১৯৬০ সালের ২২শে জানুয়ারি। এ দিনের কথা আমি তখন অন্যত্র লিখেছি। সেই কথাগুলি আবার কিছু পুনরাবৃত্তি করছি।

২২শে জানুয়ারি ১৯৬০। এই তারিখের কয়েকদিন আগে—(১০ই জানুয়ারি) ইতস্ততঃতে নববর্ষের কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম। তার মধ্যে এই প্যারাগ্রাফ দুটিও ছিল:

"এ বছর (১০-১-১৯৬০) শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসুকে সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হবে। (এ ভবিষ্যদ্বাণী, আমি যে নিমন্ত্রণ-পত্রখানা পেয়েছি তা দেখে করছি।) দেশ তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে তাঁর প্রথম আবির্ভাব থেকেই। সে শ্রদ্ধার পরিমাণ কত, তা গত পঁচিশ ত্রিশ বছরের বইয়ের খাতে তাঁর দেওয়া ইনকাম ট্যাক্সের পরিমাণ দেখা সম্ভব হ'লে জানা যাবে। তবে কিছুকাল হ'ল এক শ্রেণীর সমালোচক তাঁর সম্পর্কে একটা মস্তবড় আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন এই যে, তিনি আর আগের মতো লিখতে পারেন না।

"এই আবিষ্কার মস্ত আবিষ্কার সত্যিই নয়। কারণ এ কথার সঙ্গে আরও যোগ করা যেত—রাজশেখর বসু আগের মতো দৌড়তে পারেন না, কঠিন জিনিস চিবোতে পারেন না, ইত্যাদি। কিন্তু এই 'আগের মতো' মানে কি?…কোনো জিনিস চিরদিন এক রকম থাকে না, এটি আবিষ্কারই নয়। পরিবর্তনই জীবনের লক্ষণ।…মানুষ যে রসসৃষ্টি করে তা তার সজ্ঞান সৃষ্টি, তাই তার পরিবর্তন আছে। মানুষ যদি একটি ফজলি আমের গাছ হ'ত, তা হ'লে সে গাছ বৃদ্ধত্বের চরমে পৌঁছেও একই স্বাদের আম ফলাত।"

আরও কয়েকটি প্যারাগ্রাফ এর পরে ছিল, এবং তাতে আমি এই কথাই বলতে চেয়েছিলাম যে, যদি বলি রাজশেখর বসু আগেই এখনকার মত লিখতে পারতেন না, তা হলে কথাটা একই দাঁড়ায় না কি? ইত্যাদি।

এই লেখাটিই শুধু লিখেছিলাম, সেদিনকার সভায় আমি যেতে পারি নি। আমি রাজশেখরকে একখানা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম, "আপনার প্রতি

আমার শ্রদ্ধা নিবেদন আমি দূর থেকে যুগান্তরের পাতাতেই করলাম।"— আর লিখেছিলাম "আপনি দীর্ঘজীবী, দীর্ঘতরজীবী হোন, এই কামনা করি।"

আমার চিঠির উত্তর পাব আশা করিনি, কিন্তু উত্তর পেলাম। এত হৈ চৈ-এর মধ্যেও তাঁর কর্তব্য বাঁধা পথে চলে। তিনি জানালেন—

"প্রীতিভাজনেষু পরিমলবাবু, আপনার ৮ তারিখের চিঠি পেয়েছি। তুষারকান্তিবাবুর কাছে শুনেছি, আপনি আমার সম্বন্ধে যুগান্তরে লিখেছেন। এখনও পড়তে পারি নি।···চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় মাসে একদিন এখানে আসেন। যদি আপনার অসুবিধা না হয় তবে একই গাড়িতে তিনি আর আপনি এখানে আসতে (আর ফিরে যেতে) পারেন। আমি চিঠি লিখে দিন স্থির ক'রে আপনাকে জানাতে পারি। বেলা চারটা নাগাদ। আপনার সম্মতি পেলে সুখী হব।

'দীর্ঘজীবী দীর্ঘতরজীবী' হবার আশীর্বাদ আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, আপনি সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করুন। আমি চটপট নিষ্কৃতি চাই।

—আপনার রাজশেখর বসু (১২-১-৬০)

এর উত্তরে সম্মতি জানাবার পর তার উত্তর পেলাম ১৯শে জানুয়ারি—

"প্রীতিভাজনেষু, আপনার ১৪।১-এর চিঠি। আগামী শুক্রবার ২২শে জানুয়ারী বিকালে আন্দাজ পৌনে চারটের সময় আপনার কাছে গাড়ি যাবে। চারুবাবু থাকবেন। আশা করি আপনি এখন সুস্থ আছেন।

আপনার
রাজশেখর বসু

৭২, বকুলবাগান রোড

অবশেষে (১৯৬০ এর) ২২শে জানুয়ারি চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং আমি বিকেল প্রায় সাড়ে চারটার সময় ৭২ বকুলবাগান রোডের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম। সঙ্গে রইল হিমানীশ, একটি মুভি ক্যামেরা ও একটি নতুন ৩৫-মিলিমিটার জারমান 'কালার স্ন্যাপ' ক্যামেরা।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে আরও শীর্ণ বোধ হ'ল। একটু যেন অস্বাভাবিক

শীর্ণ। কিন্তু কিছুক্ষণ আলাপের পরেই ভিতরের পরিচিত মানুষটি যখন দেখা দিল তখন বাইরের চেহারা ভুলে গেলাম। সরস চরিত্র বয়সে বাড়ে না। যেমন, আজও এই ১৯৬২তে যদি কেউ প্রেমাঙ্কুর আতর্থীকে দেখেন তবে হঠাৎ তাঁর দৈহিক শীর্ণতায় চমকে উঠবেন, কিন্তু তাঁর গল্প বলা আরম্ভ হ'লে সে সব আর কিছু চোখে পড়বে না। মনে হবে যুবক প্রেমাঙ্কুরকে দেখছেন। চারুচন্দ্রও তাই।

৭২ নং বকুলবাগান রোডের বাড়িতে এর প্রায় চার বছর আগে গিয়েছিলাম শশিশেখরের সঙ্গে, সে কথা আগে বলেছি। কিন্তু রাজশেখরকে তখন যেমন দেখেছিলাম, সেদিনও ঠিক তেমনিই দেখলাম। বরং আগের অপেক্ষা কিছু সুস্থই মনে হ'ল। একটা বেশ খুশি-খুশি ভাব মুখে লেগে ছিল। সম্ভবত চারুচন্দ্রের দেখা পেয়ে। বাঞ্ছিত লোকের সঙ্গ পেলে সমস্ত স্নায়ু প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

আমরা দোতলার বারান্দায় সবাই বসেছি। শুনলাম চিত্রকর যতীন্দ্রকুমার সেন একটু পরেই আসবেন। আমি তাঁর জন্য একটু উদ্বিগ্ন হলাম এই ভেবে যে তখনও বারান্দায় একটুখানি রোদ ছিল, এর পরে এলে মুভি ক্যামেরায় আর তাঁর ছবি তোলা যাবে না। শীতের পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার ছায়াতে রঙীন ফিল্ম প্রায় অচল। যাই হোক, তাঁকে বাদ দিয়ে আমাদের তিনজনের চলচ্চিত্র একসঙ্গে তোলা হ'ল। স্টিল ক্যামেরাতেও তোলা হ'ল। এবং পরে আমি ব'সে আলাপ করতে করতে রাজশেখরের ছবি তুললাম।

সেই তাঁর শেষ ছবি।

যতীন্দ্রকুমার সেনকে আমি আগে কখনও দেখিনি। কিন্তু না দেখলেও আমাদের ভিতরে পরস্পরের প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল, এবং সে আকর্ষণ তাঁর প্রতি আমার যেমন ছিল তাঁর ছবির জন্য, আমার প্রতি তাঁরও তেমনি ছিল আমার ফোটোগ্রাফের জন্য।

রাজশেখরের প্রথম বইগুলিতে তাঁর আঁকা ছবিগুলি তখন চমকপ্রদ লেগেছিল এবং প্রথম দর্শনেই প্রেম জেগেছিল মনে। শুনলাম তিনিও আমার ফোটোগ্রাফ অনেক মনে রেখেছেন। এবং একখানা রঙীন ফোটোগ্রাফ (একটি ময়ূরের, যুগান্তর ১৯৫২ পূজা সংখ্যায় ছাপা) কেটে বাঁধিয়ে রেখেছেন, বললেন। এটি গুণীজনের বিশুদ্ধ উদারতা।

তিনি এসেছিলেন বারান্দার রোদটুকু পার হ'য়ে গেলে। তবু সেই আলোতে হিমানীশ ৩৫ মিলিমিটার ক্যামেরায় তাঁর কয়েকটা ছবি তুলল।

যতীন্দ্রকুমার খুব রসিক ব্যক্তি। অবশ্য এ কথাটা না বললেও চলত, কেননা সমধর্মী না হ'লে রাজশেখরের সঙ্গে এমন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হবে কেন। যেমন হয়েছে চারুচন্দ্রের ক্ষেত্রেও। এই সময়টা যতীন্দ্রকুমার চোখের অসুখে ভুগছিলেন, ক্যাটারাক্ট হয়েছিল। কাটাতে হবে অনেক পরে। চোখ দুটি কালো চশমায় ঢাকা। এক বছর অন্তত তাঁর অন্ধকারে বাস। তবে তখন মনে হয়েছিল রাজশেখরের সান্নিধ্যে এলে তিনি আলো দেখতে পান, এবং মনে হ'ল যেন রাজশেখরও কানে আরও পরিষ্কার শুনতে পান। আমি লক্ষ ক'রে দেখলাম যতীন্দ্রকুমার পাঁচ ছ হাত দূরে ব'সে স্বাভাবিক কণ্ঠে যত কথা বললেন, রাজশেখর তা সবই শুনতে পেয়েছিলেন। অবশ্য যতীন্দ্রকুমারের কণ্ঠ খুবই সতেজ এবং সবল। তীক্ষ্ণতা বেশি। এবং রাজশেখরও খুব বেশি বধির ছিলেন না।

রাজশেখরের গল্পের সঙ্গে যতীন্দ্রকুমারের ছবির অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ। ইংরেজী সাহিত্যে ডিকেন্স-এর বিখ্যাত চরিত্রগুলি যেমন শুধু লেখার ভিতর দিয়ে নয়, ছবির ভিতর দিয়েও পরিচিত হয়ে গেছে—মিস্টার পেক্‌স্নিফ, বারনাবি রজ, স্মাইক, মিক'বার, যুরায়া হীপ মিস্টার পিকউইক, স্যাম ওয়েলার ইত্যাদি। বাংলা-সাহিত্যে তেমনি পরশুরামের গণ্ডেরিরাম, শ্যামানন্দ, নেপাল ডাক্তার তারিণী কবরেজ, হাকিম সাহেব, নন্দ, বিপুলা মল্লিক, লম্বকর্ণ, লাটুবাবু, শাঁকচুন্নী, কারিয়া পিরেত, যক্ষ, নকুড়মামা প্রভৃতি ছবির ভিতর দিয়ে আমাদের প্রিয়তর হয়ে উঠেছে।

তাই এই তিন প্রাচীন গুণী বন্ধুর মিলন-পরিবেশে আমার যোগ দেওয়া আমার জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা অবশ্যই। এঁরা তিনজনেই আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড। সবাই প্রায় ১৬ থেকে ১৮ বছরের বড়। এবং এই বয়সের প্রসঙ্গটাও উঠল একটা মজার ব্যাপারে। ইতিমধ্যে ভাল ভাল খাবার এসে পড়েছে। চারুবাবুর চোখ দুটি যেন গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে একটা খুশির আলো বিকিরণ করতে লাগল। এবং তিনিই বয়সের প্রসঙ্গটা তুললেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু কেন, সে কথা তখন বুঝতে পারিনি, পরে বুঝেছি।

তাঁর আহারের সঙ্গীরূপে আমি সেখানে নতুন। এবং তিনি যে, বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়, সে বিষয়ে তিনি সচেতন। তাই কৈফিয়ৎ স্বরূপ আগেই আমাকে শুনিয়ে রাখলেন যে, তাঁর বয়স ৭৭ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রত্যেকটি দাঁত যথাস্থানে আছে। অতএব খাওয়ার ব্যাপারে তিনি যে প্রাণ খুলে (এবং মুখ খুলে) একটু মাত্রা ছাড়িয়ে যাবেন, সেটা যেন আমি আগেই ধ'রে নিই, এবং দেখে-শুনে চমকে না যাই, এইরকম ভাব।

খেতে খেতে বললেন, আমি ৭৭, যতীন্দ্রকুমার ৭৮, এবং রাজশেখর ৮০।" এবং ঐ এক নিশ্বাসেই উচ্চারণ করলেন, "আপনি আমাদের তুলনায় শিশু—নিতান্ত শিশু।" কথাটির উপর একটু বেশি জোর দেওয়ার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, আমি একটিমাত্র কচুড়ি খেয়ে হাত গুটিয়ে নিয়েছিলাম।

যতীন্দ্রকুমার রসিক ব্যক্তি, কিন্তু তিনি শিল্পীমানুষ, স্বভাবতই রসিক। কিন্তু চারুবাবু বিজ্ঞান সেবা করেছেন আজীবন। হঠাৎ মনে হ'তে পারে বিজ্ঞান ও রসসৃষ্টি অথবা রসগ্রহণ ক্ষমতার মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। কেন ঠিক নয় তা নিয়ে অনেক আলোচনা চলতে পারে। এখানে তা করব না। তবে আমাকে এ প্রশ্নের উত্তর অনেকবার দিতে হয়েছে যে, রাজশেখর বসু অন্যকে হাসান, কিন্তু নিজে হাসেন না কেন। এখানে এ সম্পর্কে একটিমাত্র কথা বলে রাখি—বিজ্ঞান ও রসসৃষ্টি যে বিষম গুণসম্পন্ন নয়, রাজশেখরের এই ব্যবহারও তার আর একটি প্রমাণ। নিজে স্থিরবুদ্ধি, বিশ্লেষক, অন্যের চরিত্র উদ্‌ঘাটক। এ কাজটি নির্বিকার ভাবে অবশ্যই করা চলে। সবই লেখকের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর নির্ভর করে। বাল্যকাল থেকে কোনো ব্যক্তি, চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ ক'রে এসেছেন, তাঁর পক্ষে হঠাৎ তা বদলাবার কোনো হেতু নেই।

রাজশেখর বসুর এই ব্যবহার সম্পর্কে কোনো এক বিশেষ-সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে আমি পৃথক একটি রচনা লিখেছিলাম। তাতে অনেকটা এই রকম বলা হয়েছিল যে, শরৎ চাটুজ্জে গল্প লিখে অনেককে কাঁদিয়েছেন অতএব তিনি নিজে লোকের সামনে সব সময় কাঁদতেন না কেন, এমন কথাও তাহ'লে উঠতে পারে। কিন্তু এ প্রশ্ন অবান্তর। অন্যকে কাঁদালে নিজে কাঁদা, অথবা অন্যকে হাসালে নিজে হাসা, কম্পালসরি নয়, বাধ্যতামূলক নয়।

কিন্তু একথাটিও হয় তো অনেকের জানা নেই যে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য রসরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর অনেক তথ্যগত রচনায় তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরসতার মিশ্রণে নীরস তথ্যকেও রসসমৃদ্ধ ক'রে পাঠকের তৃপ্তি দিয়েছেন। তিনিও ঐ একই কারণে বিজ্ঞানসেবী এবং সাহিত্যিক যুগপৎ। তাঁর কথা পরে আসবে।

প্রসঙ্গত অনেক কথা বলা হয়ে গেল। রাজশেখরের বারান্দায় ব'সে আমাদের বয়স, দাঁত, এবং খাওয়ার প্রসঙ্গে কথা চলছিল এমন সময় শ্রীমান্ কাঞ্চনকান্তি বসু লঘু পায়ে এসে রাজশেখরের কোলে উঠে নির্বিকার ভাবে ব'সে পড়ল। রাজশেখরও নির্বিকার।

বেশ পরিপুষ্ট দেহটি, ল্যাজটিও প্রশংসাযোগ্য। রাজশেখর বললেন, "ডজনখানিক আছে।" প্রশ্রয় বেশি পেয়েছে ব'লে বোঝা গেল। বললেন, এবং একটুখানি মৃদু হেসে অথচ গম্ভীর স্বরে, "একটির নাম উত্তমকুমার। কিন্তু সে নিজের বাচ্চাকে খেয়ে ফেলাতে সবাই তার নাম বদলে রেখেছে খোক্কস"

এরকম প্রত্যেকটি আলাপ আমার মনে এক অদ্ভুত বিস্ময় জাগাচ্ছিল। প্রত্যেকটি কথা কানে আসছে আর সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটি আমার মনে হচ্ছিল যে, সেই ১৯৬০-এর ২২ জানুয়ারি তারিখটি বিশ্বকালের ইতিহাসে আর ফিরে আসবে না, বাংলাদেশের এক মহাসম্মানিত ব্যক্তির মুখ থেকে সেই মুহূর্তে যে সব কথা উচ্চারিত হচ্ছে তাও হাওয়ায় সামান্য তরঙ্গ তুলে শূন্যে মিলিয়ে যাবে। তবু আমার মর্মে তার যেটুকু স্মৃতিই রেখে যাক তাকে কাগজে ধ'রে রাখবার চেষ্টা করতে হবে। তাই অত্যন্ত মনোযোগ দিয়েই শুনছিলাম রাজশেখরের কথাগুলি। সে সময় দুটি ক্রিয়া আমার মনে চলছিল সমান্তরাল ভাবে। এক হচ্ছে তার কথাগুলো মনে রাখবার চেষ্টা, আর এক হচ্ছে কি ভাবে সেদিনের সব ঘটনা সাজালে সবটা মিলে একটা সম্পূর্ণ ছবি হ'তে পাবে মনে মনে তার একটা খসড়া তৈরি করা।

বিড়াল প্রসঙ্গ সবাই উপভোগ করলাম বলা বাহুল্য। আমার কাছে ব্যাপারটা নতুন, এবং রাজশেখরের প্রাইভেট লাইফের সঙ্গে এক ডজন বিড়ালের এই যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, এ কথাটা ইতিপূর্বে আর কেউ প্রচার করেছেন কি না মনে পড়ল না, কিন্তু আমার কাছে এর গুরুত্ব অন্যান্য বড় বড় ঘটনার

তুলনায় কিছুমাত্র কম মনে হয় নি। সুতরাং প্রচারের দায়িত্বটা আমাকেই নিতে হয়েছিল।

হঠাৎ সবিস্ময়ে চেয়ে দেখি, চারুচন্দ্র প্লেটে পরিবেশিত আধ ডজন কচুরি ও বড় বড় গোটাকত সন্দেশ নিঃশেষে উদরস্থ ক'রে প্রফুল্ল মনে আলাপে যোগ দিয়েছেন। আলাপের অবশ্য কোনো ধারাবাহিকতা ছিল না, কোনোটাই মহাকাব্যের বিস্তার পায় নি, সবই খণ্ড কাব্য। অর্থাৎ যখন যেটা মনে আসে। এক প্রসঙ্গ ভেঙে দিয়ে অপর প্রসঙ্গে যাওয়ার গরজটা আমারই বেশি ছিল সে দিন। কিন্তু তবু প্রসঙ্গগুলো আপনা থেকেই ভেঙে যাচ্ছিল, কারও ইচ্ছায় ভাঙছিল না।

রাজশেখরেব প্রথম লেখার কথা তুললাম। তিনি আগে যা সব লিখেছেন তা ছাপা হয় নি। চারুচন্দ্র বললেন "।সদ্ধেশ্বরী লিমিটেডই প্রথম ছাপা গল্প" যতীন্দ্রকুমাব সেন সংশোধন করলেন "শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড।" আরও— "এ গল্পের মূলে একটা ইতিহাস আছে।"

বাজশেখর বললেন, "যুগান্তরে এবারে আপনাকে দাঁড়কাগ দিয়েছিলাম। সত্যিই একটা মেয়েকে দাঁড়কাগ বলা হত।" যতান্দ্রকুমার যোগ করলেন, "স্কটিশ চার্চ কলেজের কাছাকাছি থাকত মেয়েটি, রঙ ছিল তার কালো।"

আমি রাজশেখরকে বললাম, "আপনি অনেক কাল বিহারে কাটিয়েছেন, সেজন্য আপনার গল্পে বিষয়-বৈচিত্র্য বেড়েছে।"

রাজশেখর বললেন, আঠাবো বছর কাটিয়েছেন বিহারে।

আমি বিহারের প্রসঙ্গ তুলেছিলাম, সম্ভবত ভূষণ্ডীর মাঠে নামক গল্পটির কথা স্মরণ ক'বে। বিহারের পরিমণ্ডল রক্তে না মিশলে এ রকম একটি গল্প লেখা হ'ত না এমন কথা আমার অনেক দিন মনে হয়েছে।

আবার অন্য প্রসঙ্গ। বাইরের অন্য একটা পথের দিকে চেয়ে ছিলাম। ও পথটার নাম কি প্রশ্নে জানা গেল অনেক কথা। জানা গেল, এদিকের বাড়ি খুঁজে পাওয়া শক্ত হয় কারণ ও পথটার নামও বকুলবাগান রোড, এ পথের অনেকগুলো ডালপালা আছে, তাই ধাঁধা লাগে। বললেন, "এই রাস্তাতেই বাড়ি করেছি তার মূলে একটি সেন্টিমেণ্ট। বাবা কর্পোরেশনের কালেকটর ছিলেন, তিনি ১০ বকুলবাগান রোডে থাকতেন। বকুলবাগানকে আর ছাড়তে ইচ্ছা হ'ল না।" যতীন্দ্রকুমার বললেন, এ পথে এমম ধাঁধা লাগে যে নিজেরই

বাড়ি চিনে আসা শক্ত হয়। বাড়ি তৈরির সময় মিস্ত্রীরা যে ঝাঁটার ঝাণ্ডা বাঁধে বাড়ির মাথায়, দূর থেকে সেই নিশানা ধ'রে এ বাড়িতে আসতে কত বার ভুল হয়েছে।

পথের প্রসঙ্গে পথের নাম বদলের কথা উঠল। প্রত্যেকটি নামের একটি ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস নষ্ট করা ঠিক নয়। পথের নাম-বদলে রাজশেখরের আপত্তি আছে, তাঁর এটি পছন্দ নয়। আমি নিজেও এর বিরুদ্ধে অনেক লিখেছি, কিন্তু আমাদের এবং আরও অনেকের লেখা প্রতিবাদ কোনো সাময়িক গরজকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। হাতে হাতে যেখানে ফল পাওয়া যাচ্ছে সেখানে ইতিহাসের দোহাই পাড়া ভুল, কারণ যে জাতির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত সে জাতির অতীত ইতিহাসে শ্রদ্ধা কমে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

এই আলাপ চলার সময় আমি সঙ্গের ৩৫ মিলিমিটার ক্যামেরাটিতে রাজশেখরের ছবি তুলছিলাম। আমি পাশেই ব'সেছিলাম, এবং তিনি একটি ডেকচেয়ারে হেলান দিয়ে আধ শোওয়া অবস্থায় ছিলেন। ক্যামেরাটি টাটকা নতুন, আমার নয়, সরোজ আচার্য সদ্য জারমানি থেকে এনেছে। ওতে ফোটো-ইলেকট্রিক সেলের এক্সপোজার মিটার বসানো। ক্যামেরাটি দেখে রাজশেখর কিছু কৌতূহলী হলেন। বললেন, "আজকাল চমৎকার সব ক্যামেরা বেরিয়েছে দেখলে আবার ক্যামেরা ব্যবহার করতে ইচ্ছা হয়।" 'আবার ইচ্ছা হয়' মানে এ বিদ্যা তাঁর অজানা নয়। আগে তিনি ক্যামেরা ব্যবহার করেছেন।

চিত্রকর যতীন্দ্রকুমার সেনের ফোটো তোলার অভিজ্ঞতা

একথা শুনে যতীন্দ্রকুমারের ক্যামেরার স্মৃতি জেগে উঠল। তাঁর মুখে শোনা গেল, আগে তিনি বড ফিল্ড ক্যামেরা ব্যবহার করতেন। অবশ্য ফিল্ড ক্যামেরা ভিন্ন আগে অন্য ক্যামেরা এদেশে কেউ ব্যবহার খুব কমই করেছে। ছোট ছবি আগে অচল ছিল, যদিও মিনিয়েচার ক্যামেরা আজ থেকে ৫০ বছর আগেই এদেশে পাওয়া যেত। ছোট ক্যামেরা লোকের অপছন্দ ছিল, তার নানা কারণ আছে। সে সব কথা আলোচনা এখানে করব না। যদিও এ বিষয়ে নানা কথা সেদিন হয়েছিল। তবে চিত্রধর্মী

ফোটোগ্রাফ তখন তোলার কথা এদেশে কেউ কল্পনা করে নি। শুধু মানুষের ছবি তোলা, এবং সেও আবার যার ছবি, তাকে চেনা গেলেই যথেষ্ট মনে করা হ'ত। এবং আমি জানি, পিছনের অবিন্যস্ত বাজে পটেও ছবিটি স্পষ্ট হ'লে, লোকের তা আরও ভাল লাগত। অর্থাৎ কোনো জিনিস, তা যত অবান্তরই হোক, ফোকাসহীনতার ফাঁকিতে পড়বার উপায় ছিল না।

আমরা অতঃপর পরস্পর ফোটোগ্রাফ তোলার অভিজ্ঞতার গল্প শুরু করলাম। যতীন্দ্রকুমারের বেশ একটি মজার গল্প মনে পড়ল। তিনি এক যুবকের স্ত্রী-সমেত ফোটো তোলার অনুরোধ পেয়েছিলেন। কিন্তু ছবি তুলতে গিয়ে শুনলেন, বধূটি সম্পূর্ণ অসূর্যম্পশ্যা, অতএব কোনো শিল্পীর দৃষ্টির সামনেও তিনি বেরোবেন না। শিল্পী যত বড়ই হোক, পরপুরুষ তো বটেই। তিনি একমাত্র তাঁর নিজস্ব পরমপুরুষটি ভিন্ন আর কাউকে মুখ দেখাতে অক্ষম।

অথচ ফোটোও তোলাতে হবে!

ব্যবস্থা হ'ল, যতীন্দ্রকুমার ক্যামেরার ফোকাসিং-ক্লথ থেকে মাথা বা'র করতে পারবেন না, এবং ঐ কালো কাপড়ের আড়ালে মাথা ঢেকেই সব কাজ শেষ করতে হবে। কিন্তু ওদিকে যে ফোকাসিং স্ক্রীনের উপর—অর্থাৎ গ্রাউণ্ড গ্লাসের উপর সব চেহারাটাই দেখা যাচ্ছে, তা উক্ত পরমপুরুষের জানা ছিল না। যতীন্দ্রকুমার নিতান্ত ভালমানুষ সেজে শুভকার্য সমাধা করলেন। সতীধর্ম সম্পূর্ণ রক্ষা পেল, পরমপুরুষের দৃষ্টিতে যে সব বিপর্যয় ঘটতে পারত, সে সব আর ঘটবার সুযোগ পেল না।

ফোটোগ্রাফি বা যে-কোনো আধুনিক কালের দান প্রথমে শহরের লোকের অভ্যর্থনা পায়, পল্লী-অঞ্চলে তার প্রচার বা প্রসার হ'তে অনেক দেরি হয়। নতুন যা-কিছু, তা নিয়ে ক'ত সন্দেহ, কত ভয়। ফোটোগ্রাফি সম্পর্কেও অনেক পল্লীবাসীর মনেই এ ধারণা আছে যে, ফোটো তোলালে আয়ু ক'মে যায়, অকাল মৃত্যু হয়। সব দেশেই এ ধরনের গোঁড়ামি আছে, এবং স্বভাবতই আছে।

শুনলাম, রাজশেখর আমার যুগান্তরে প্রকাশিত সেই 'ইতশ্চেতঃ'র প্যারাগুলি পড়বার সুযোগ পেয়েছেন ইতিমধ্যে। তিনি আমাকে বললেন, তাঁর কোনো আত্মীয় বলেছিলেন, জন্মদিন সভায় ঐটে পড়লেই হ'ত, আর কিছু করবার দরকার হ'ত না।

একটু থেমে বললেন, "আমার লেখার মধ্যে ভাল, মাঝারি, খারাপ—তিনই আছে।"

এ কথাটা বললেন তাঁর সমালোচকদের প্রসঙ্গে। ইতশ্চেতঃতে সেই কথা লিখেছিলাম, আগে বলেছি। আমি তার উত্তরে বললাম, "কোনো একটি গল্প আর একটি গল্পের সঙ্গে শিথিল ভাবে তুলনা না করাই বোধ হয় ভাল, কারণ প্রত্যেকটি গল্পের বিষয়বস্তু আলাদা, তাই এক একটা গল্প এক একটা পৃথক রূপ নিয়ে দেখা দেয়। তবে পাঠকেরা বড়ই গোঁড়া। একবার যা ভাল লেগেছে, বার বার তাই চায়। অন্য রকম দিলে মনে করে ঠকাচ্ছে।"

এখানেও নতুনকে হঠাৎ মেনে নেওয়ার ব্যাপারে মনের গোঁড়ামি স্পষ্ট। পাঠকেরা যে ভাবে একটা লেখার সঙ্গে অন্য আর একটা লেখার তুলনা করে, তার মধ্যে চিন্তার কোনো প্রশ্ন থাকে না, এটি আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।

রাজশেখর আমার ঐ কথায় হেসে বললেন, "আমার লেখা হিন্দুস্থানীরা বোধ হয় বেশি পছন্দ করে, বই বেরোতে না বেরোতে হিন্দি অনুবাদ প্রকাশ হয়ে যায়।"

এ হাসির পিছনে হয়তো একটুখানি বেদনা ছিল। দুবার দুটি কথা বললেন—দুটিই তাঁর শেষ বয়সের লেখার সমালোচকদের বিরুদ্ধে আমি যে মন্তব্য করেছিলাম সেই প্রসঙ্গেই বলা। লেখার মধ্যে "ভাল, মাঝারি ও মন্দ" দুইই আছে, এবং "হিন্দুস্থানীরাই বোধ হয় বেশি পছন্দ করে"—এই দুটি কথা খুব সহজভাবে বলা হলেও সহজ কথা নয়।

শেষের দিকের লেখা সম্পর্কে আমার নিজের মত কিছু ভিন্ন এবং সে কথা ইতশ্চেতঃতে যথেষ্ট বলা হয়েছিল, যদিও সেটি বিস্তারিত আলোচনা নয়।

যতীন্দ্রকুমারকে আমি বললাম, "পরশুরাম এখন যখন অজস্র লিখছেন সেই সময় আপনি চোখ খারাপ ক'রে বসলেন, ও দুইয়ের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অনেক পাঠক হতাশ হয়েছে, এবং এখনকার গল্পের বিরূপ সমালোচনার জন্য আপনার দায়িত্বও কম নয়।"

এ কথার তো কোনো উত্তর নেই, অতএব যতীন্দ্রকুমার এর উত্তরে আমাকে একটি নতুন কথা শোনালেন, বললেন, "রাজশেখর নিজে এককালে

ভাল ছবি আঁকতেন। গণ্ডেরীরাম ও শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, এ দুটি মূর্তি কেমন হবে তা রাজশেখর পোস্টকার্ডে ফাউনটেন পেন দিয়ে এঁকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, আমি ঠিক তাই এঁকেছি। অনেক চরিত্রই তাঁর পরিচিত কারো না কারো চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে আঁকা।"

রাজশেখর নিজেও বলেছিলেন এখনও তিনি সূক্ষ্ম তুলি দিয়ে ছবি আঁকতে পারেন। কিন্তু চোখের জন্য বেশিক্ষণ পারেন না।

এ কথায় মনে হ'ল 'এককলমী' আসলে রাজশেখর নিজে। একটি মাত্র চুলের তুলি, অর্থাৎ যার চেয়ে সূক্ষ্ম তুলি আর হয় না, সেই তুলিতে যিনি ছবি আঁকেন তাঁকে বলা হয় এককলমী।

রাজশেখর চিত্রশিল্পী ছিলেন, এ কথাটা আমার কাছে নতুন হ'লেও কানে অস্বাভাবিক লাগেনি। তাঁর লেখার মধ্যে যে সংযম, অনেক সময় চরিত্র চিত্রণে যে ফোটোগ্রাফধর্মিতা, কথার মধ্যে যে পরিচ্ছন্নতা, মনে হ'ল যেন তাঁর আঁকা ছবির মধ্যেও সে গুণ থাকা সম্ভব। যতীন্দ্রকুমারের কথা শুনেই গণ্ডেরীরাম, শ্যামানন্দ প্রভৃতির ছবি জেগে উঠল মনে। যতীন্দ্রকুমারের ঐ মূর্তিগুলি যদি রাজশেখরের হাতে আগে রূপ পেয়ে থাকে, তবে চকিতে রাজশেখরের একটি কথার অর্থ আমার কাছে আরও পরিষ্কার হয়ে গেল সেই মুহূর্তে। যেদিন প্রথম রাজশেখরের সঙ্গে দেখা করতে যাই, সে দিন কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, আজকালকার ছবি তিনি পছন্দ করেন না। আলট্রা মডার্ন শিল্পীদের কথা নয়, আধুনিক কালে গল্পে যে সব ছবি দেওয়া হয় অর্থাৎ ইলাস্ট্রেশন, তা তাঁর পছন্দ নয়। এ কথাটি আমি ইতিপূর্বে প্রকাশ করিনি, কেন না এতে তাঁর চিত্র সমালোচনার ক্ষেত্রে অধিকারের প্রশ্ন ওঠে, এবং আরও পরে তাঁর চলচ্চিন্তা নামক বইতে অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর যে রচনা পড়েছি, তাতেও তাঁর মতামত প'ড়ে এ বিষয়ে যে তিনি খুব চিন্তা করেছেন এমন মনে হয়নি। যাই হোক, যতীন্দ্রকুমারের ছবি যদি তাঁর শিল্পবোধের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে সুর মেলাতে পেরে থাকে, তবে ছবি বিষয়ে তাঁর মতামত অগ্রাহ্য করা চলে।

শেষ দেখা

১৯৬০-এর ২২শে জানুয়ারির কথা বলা হ'ল। সে দিনের আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলি। রাজশেখরের স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ তুলেছিলাম সেদিন। তখন আগের চেয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করছেন বললেন। যদিও তাঁর সমস্ত আলাপের মধ্যে একটা শান্তভাব ছিল। আমি অসুখবিসুখ বিষয়ে একটুখানি কুতূহলী, তাই আবও একটু বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলাম।

প্রশ্ন ক'রে ক'রে যেটুকু জানা গেল, তা হচ্ছে এই যে, তাঁর তখন নাড়ীর গতি মিনিটে ৯৯।

এটি অবশ্য আমাব নিজের বেলায় হ'লে বলা যেত আমার জ্বর হয়েছে। কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় আমাব থাকে প্রায় ৭০। কিন্তু বয়স ও প্রকৃতি অনুযায়ী এই গতি বিভিন্ন হয় এবং জ্বর না হ'লেও নাড়ীর গতি গড় গতির চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত হ'তে পারে। এমন কি গা বরফের মতো ঠাণ্ডা কিন্তু নাড়ী চলছে মিনিটে ১৩০ বা বেশি। এটি মৃত্যুর লক্ষণ অনেক সময়েই। রাজশেখরের ক্ষেত্রে মিনিটে ৯৯, আমার মনে হ'ল তাঁর হৃৎপিণ্ডের একটি ক্রুটির জন্যই হয়েছে। কারণ তিনি বললেন, তাঁব হৃৎপিণ্ডের একটি ভেনট্রিকল জখম হয়ে গেছে।

হৃৎপিণ্ডের এই খবরটা শুনে দুঃখ হল। কিভাবে জখম হয়েছে, এবং জখম সাধাবণত কি ভাবে হয়, তা আমার জানা নেই, কিন্তু এ বিষয়টি আলাপের পক্ষে এই মুহূর্তে খুব মনোহব না হওযায় রক্তের চাপের কথা তুললাম। কারণ এ বিষয়ে আমি গত সাত আট বছব ধ'রে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি।

শুনলাম সিস্টোলিক ১৮০, এবং ডায়াসটোলিক ৯০। আমার নিজের কথা চিন্তা করলাম। এমন অবস্থা আমারও। তবে প্রথমটি ১৫০-৬০ এবং দ্বিতীযটি ৮০-৯০ থাকলে চাপের কথা আব মনে আসে না। এক দিন, বোধ হয় ১৯৫৫ কি ৫৬ হবে—আমাদের বুড়োদার (অর্থাৎ প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর) সঙ্গে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে দেখা। জিজ্ঞাসা করলাম অনেকদিন দেখা পাইনি কেন? বললেন, তিনি মারা যেতে বসেছিলেন। রক্তের চাপ বৃদ্ধির ব্যাপার। নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়েছিল, অজ্ঞান হয়েছিলেন। এখন

কত জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল, সিস্টোলিক চাপ ২৩০, ঐ চাপ নিয়েই তিনি পথে বেরিয়েছেন। ২৭০ পর্যন্ত উঠেছিল বললেন।

অতএব ব্যক্তিবিশেষে স্বাভাবিক রক্তের চাপও ভিন্ন। ২৩০ আমার হ'লে নিজের দু'পায়ে নয়, অন্যদের আট পায়ে চলতে হ'ত নিমতলার দিকে।

রাজশেখরের রক্তের চাপের পরিমাণ শুনে বললাম, "তা হ'লে তো আপনার বয়সে সবই প্রায় স্বাভাবিক আছে।" তিনি বললেন, "আগে খুব বেশি ছিল, কিন্তু চাপ কমানোর জন্য অনেক দিন ওষুধ খেয়ে এখন ক'মে এসেছে।"

আর তিন মাসের মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটবে এমন কথা মনে আসেনি।

মনে এসেছিল প্রায় দেড় মাস পরে।

১৯৬০-এর ১৯শে মার্চ তারিখে তাঁকে শেষ দেখা দেখেছি তাঁর বাড়িতে।

এবারেও তিনি গাড়ি পাঠিয়েছিলে এবং এবারেও চারুচন্দ্র ভটাচার্য সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু এবারে যে নিমন্ত্রণ চিঠিখানা ডাকে পাঠিয়েছিলেন সেখানা অন্যের হাতের লেখা, নিজে শুধু নিচে সইটি করেছিলেন। এ চিঠির তারিখ ১৫ই মার্চ ১৯৬০

১২-১-৬০ তারিখে আমাকে নিজ হাতে লিখেছিলেন, "আমার মৃগী বা epilepsy রোগ, মাসখানিক আগে অনেকবার আক্রান্ত হয়েছি। চিকিৎসা হচ্ছে কিন্তু জড়ভরত হয়ে আছি, সমস্তক্ষণ অস্বস্তি। সারবে আশা করি না।"

এ চিঠিতে প্রথম তাঁকে বাজারের নীল কালি ব্যবহার করতে দেখলাম। এর আগে সমস্ত চিঠি তাঁর নিজ হাতে তৈরি কালো কালিতে লেখা। ভিতরে ভিতরে এমনি বন্ধন কাটতে থাকে। একথা তখনই আমার মনে হয়েছিল, সমস্ত জীবন বাঁধা পথে একটা ডিসিপলিনের মধ্যে চ'লে, হঠাৎ পথ থেকে স'রে যাওয়া যত অনিবার্য বা স্বাভাবিক হোক, হঠাৎ দেখলে চমকে উঠতে হয়।

তাঁর ১৫ই মার্চ তারিখের চিঠি পেলাম পরদিন ১৬ই মাচ বুধবার। তাতে আমাকে জানালেন গাড়ি পাঠাচ্ছেন, চারুবাবু সঙ্গে থাকবেন। যাবার তারিখ ১৯শে মার্চ। ১৮ই তারিখে চারুবাবু টেলিফোনে আমাকে জানালেন, আমি যেন ১৯শে মার্চ প্রস্তুত থাকি।

আমরা বিকেলে রওনা হলাম। এবারের যাওয়ার মধ্যে আমার একটি উদ্দেশ্য ছিল। হিমানাশ মুভি ক্যামেরায় যে ছবি তুলেছিল, সেই ছবির

ফিল্ম এত দিনে পাওয়া গেছে, অতএব এই উপলক্ষে ছবিখানা সেখানে দেখাবার উদ্দেশ্যে প্রোজেকটারটাও সঙ্গে নিলাম। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষেই যে তিনি আমাকে যেতে বলেছিলেন তা আমি বুঝতে পারিনি। দেখলাম আরও অনেকে এসেছেন, যদিও তাঁদের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

অতিথিদের মধ্যে যাঁদের নাম মনে আছে তাঁরা হচ্ছেন পুলিনবিহারী সেন, বিমলচন্দ্র সিংহ, ত্রিদিবেশ বসু, সুশীল রায়, মায়া বসু, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও তাঁর পরিবার। আরও কেউ কেউ ছিলেন, তাদের সবাইকে আমি চিনি না।

সন্ধ্যায় কিছু জলযোগান্তে প্রোজেকটরে ছবি দেখানো হ'ল। অনেকের ছবির সঙ্গে একটা অংশ মাত্র। একই ফিল্মে মাঝে মাঝে সেই অনেকের ছবি তোলা হয়েছে। তাতে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের অধিকাংশকেই সুকমল ঘোষের গার্ডেন হাউসে আমি কয়েকদিন পরে (৭ই ফেব্রুয়ারি) তারিখে তুলেছিলাম। তাতে দেখা যাবে সজনী, প্রেমেন, বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু, মৈত্রেয়ী দেবী, মনোজ বসু, অতুল বসু, চিত্রিতা দেবী, উদয়শঙ্কর, অমলা, ইন্দ্র দুগার, ও চিন্তামণি করকে। কিছু পরে (অন্য সময় তোলা) দেখা যাবে—প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (জংলীদা), বনফুল, বিশু মুখোপাধ্যায, আনন্দ বাগচীকে। এই ছবিরই এক অংশে রাজশেখর বসু, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আমাকে একত্র দেখা যাবে। এই শেষের তিনের মধ্যে এই কথাগুলো লেখাব মুহূর্ত পর্যন্ত আমি একা বেঁচে আছি।

প্রোজেকটরটি দুবার চালিয়ে ছবি দেখানো হ'ল। রাজশেখর, চারুচন্দ্র প্রভৃতি নীরবে দেখলেন। সিনেমা বিষয়ে আলাপ করলেন শুধু বিমলচন্দ্র সিংহ। দেখলাম এ বিষয়ে তাঁর কৌতূহল এবং অভিজ্ঞতা দুইই আছে।

এপ্রিল মাসটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা দেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। শেষ হ'ল এপ্রিল মাসেই।

তারপর একদিন—দুপুরে একটুখানি ঘুমিয়েছি—এমন সময়—তখন সম্ভবত আড়াইটে, কানের কাছে টেলিফোন বেজে উঠল।—সে দিনটি ২৭শে এপ্রিল ১৯৬০।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে বলছি। বাংলা বক্তৃতা বিভাগ। সুধীন চট্টোপাধ্যায়। রাজশেখর বসু মারা গেছেন। অবিলম্বে চলে আসুন

রেডিও অফিসে (ইডেন গার্ডেনে)। রাজশেখর সম্পর্কে একটি বক্তৃতা রেকর্ড করাতে হবে।

আমি তো স্তম্ভিত। ঘটনাটা উপলব্ধি করতেই কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নানা সুহৃদের কাছে ফোন করলাম, কেউ শুনছেন, কেউ শোনেন নি।

চলে গেলাম রেডিওতে। গিয়ে তখনই সেখানে ব'সে পাঁচ মিনিটের উপযুক্ত একটি কথিকা প্রস্তুত করলাম। তাঁর চরিত্রের একটি বিশিষ্ট দিকের কথা লিখলাম। সমস্ত লেখার মধ্যে একটা বেদনার সুর বাজল। প্রত্যাশিত অবসানই সেটি, কিন্তু তবু সব সময় সে কথা মনে জাগিয়ে রাখা যায় না। কোনো অসতর্ক মুহূর্তে এমন সংবাদ শুনলে তা স্বভাবতই অপ্রত্যাশিত মনে হয়, মন বিমূঢ় হয়।

আমার কথাগুলি প্রায় পাঁচটার সময় রেকর্ড করা হয়ে গেল এবং রাত ৯-২৫-এর সময় ব্রডকাস্ট করা হ'ল। অবশ্য এ বক্তৃতা যথাসময় বেতার জগতে ছাপা হয়নি। সম্ভবত এর উপর ততটা গুরুত্ব দেবার দরকার বোধ হয় নি। রাজশেখর বসু আধুনিক যুগে প্রায় বিস্মৃতির অতলে। অতএব বেতার জগতের কাছে তাঁর নামটা হয় তো নতুন ব'লে মনে হয়েছে।

কিছুদিন হ'ল মৃতদেহের পাশে উপস্থিত হওয়া ছেড়ে দিয়েছি। শেষ গিয়েছি শশিশেখর বসুর মৃত্যুর পর তাঁর বাড়িতে, কিন্তু তাঁর মৃতদেহ দেখিনি। দেখলে মনে আঘাত লাগে। অথচ একদিন মৃত্যু বা মৃতদেহকে অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করার জন্য মানসিক প্রস্তুতির অন্ত ছিল না। মনকে কঠোরভাবে এ শিক্ষা দিয়েছিলাম।

শুধু তাই নয়, মৃত্যু যাতে ভয়ঙ্কর মনে না হয়, সে জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মৃতদেহের কাছে উপস্থিত হয়েছি, শ্মশানে গিয়েছি। তবে একটি জিনিস আমার কাছে কোনো দিনই ভাল লাগে না, সে হচ্ছে মৃতদেহের ফোটোগ্রাফ ছাপানো। এটি রুচিসঙ্গত বোধ হয় না। মৃত্যুতে অনেক সময়েই মুখের চেহারা বীভৎস দেখায়, তা ছেপে সবাইকে দেখাবার কি দরকার বোঝা যায় না। মৃতদেহ দেখে অনেকের মনে আঘাত লাগে, অনেকের সে আঘাতে মৃত্যু হ'তে পারে যদি হৃৎপিণ্ড দুর্বল থাকে। সেজন্য মৃতদেহের নিকট-দৃষ্টিতে দেখা ফোটোগ্রাফ ছাপার আমি পক্ষপাতী নই। আমার যতদূর জানা আছে,

পাশ্চাত্ত্য রুচিতেও এর সমর্থন নেই। এ বিষয়ে রাজশেখর বসুর মতও ছিল খুব স্পষ্ট। শশিশেখর বসুর মৃত্যু হ'লে খবর শুনে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও আমি তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। (খবর বয়ে এনেছিলেন কৃষ্ণশেখর বসু।) আমি যাবার সময় সঙ্গে ছোট্ট একটি ক্যামেরা পকেটে নিয়ে গিয়েছিলাম। অনেকেই মৃত নিকট-আত্মীয়দের ফোটোগ্রাফ তুলিয়ে রাখেন। সেটি ছাপাবার জন্য নয়, রেখে দেবার জন্য। যদি দরকার হয়, এই ভেবেই ক্যামেরা সঙ্গে নিয়েছিলাম। সেখানে রাজশেখরকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম মৃতদেহের ফোটো তুলিয়ে রাখবার প্রয়োজন আছে কি না। তিনি বললেন, না, ওর কোনো দাম আছে মনে করি না।

দেশে আমার পিতার যখন মৃত্যু হয়, তখন আমার কাছে ক্যামেরা ও প্লেট প্রস্তুত ছিল. কিন্তু ফোটোগ্রাফ তোলবার প্রবৃত্তি হয় নি।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

চারুচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে মেলবার সুযোগ আগে কখনও হয়নি। কিন্তু যখন হ'ল, তখন তিনি তাঁর শেষ দীপ্তিতে আমার মনের আকাশ উজ্জ্বল ক'রে দিয়ে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন, এইটেই যা দুঃখ। রাজশেখরকে কেন্দ্র ক'রে যতীন্দ্রকুমার সেনকে নতুন দেখলাম, পরিচয় হ'ল, ভাল লাগল, আরও পরিচয় হ'লে আরও ভাল লাগত। তেমনি পেলাম চারুচন্দ্রকে। রাজশেখরকে ঘিরে যেমন ছিলেন এঁরা, এঁদের ঘিরে তেমনি ছিল একটা সেকালের বৈঠকি মেজাজ। আর ছিল মধুর অবকাশ। এর পূর্বে আমাদের যে একটি বড় আসর বসত সজনী-কেন্দ্রিক বঙ্গশ্রীর ধর্মতলা স্ট্রীটের বাড়িতে, সেখানে আমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বহীন অবসরের এক একটি অ্যাটমস্ফিয়ার বা পরিমণ্ডল বয়ে নিয়ে যেতাম। সে স্বাদ তারপরে আর কোথাও পাইনি।

সে আসরে আমরা যারা ছিল. সেই আমাদের অধিকাংশই আজও আছি, কিন্তু আমরা এখন বিকেন্দ্রিক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এর মূলে যে অনেকখানি ক্রিয়া করেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যুদ্ধে আক্রমণের আশঙ্কা থাকলে বড় বড় কারখানার এক একটা বিভাগ এক একটা স্থানে সরিয়ে

নেওয়া হয়, একই জায়গায় রাখা হয় না। আমাদেরও অবস্থা প্রায় সেই রকম হয়েছে। ভবিষ্যতের সম্পর্কে অনিশ্চয়তার আশঙ্কাই আমাদের বিকেন্দ্রীকরণের কাজ করেছে।

সেই বঙ্গশ্রীর বৃহৎ আসরের যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কেন্দ্র সজনীকান্ত দাস আর নেই। এ তালিকা আরও বাড়ানো যেত কিন্তু কি লাভ?

এঁদের সবারই বলা চলে অকালমৃত্যু।

সে হিসাবে রাজশেখর বসু এবং চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের মৃত্যু যথাসময়েই হয়েছে। কিন্তু তবু বাংলা দেশের পক্ষে তা কি করুণ। বাংলা সাহিত্যের অভিভাবকরূপে তাঁদের মৃত্যু কত বেদনাদায়ক।

বিজ্ঞান ও সাহিত্যপ্রীতির দিক দিয়ে রাজশেখর বসু ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন একেবারে সমধর্মী। রাজশেখর যখন চিন্তাশীল রচনা লিখেছেন, তখন শান্ত সহজ সরল সুরে এবং ভাষায় লিখেছেন। অথচ গল্প রচনায় ব্যঙ্গ কৌতুক এসেছে অনায়াসে। বিজ্ঞানের পদ্ধতিতেই মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি হাস্যরসের সন্ধান পেয়েছেন। পক্ষান্তরে চারুচন্দ্র নিজের জ্ঞান, বিদ্যা এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যে যে সব প্রবন্ধ লিখেছেন, তার ভিত্তি বৈজ্ঞানিক হ'লেও তার মধ্যে তিনি সরসতার মিশ্রণ ঘটিয়ে তাকে রসসাহিত্যে পরিণত করেছেন। কিন্তু সাহিত্যসেবায় এটি তাঁর একটিমাত্র দিকের পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের সহকর্মীরূপে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের রূপ দেখা যাবে রবীন্দ্র-রচনাবলীর সম্পাদনার মধ্যে। এ ভিন্ন তাঁর বিজ্ঞান-বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকগুলি বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধিতে একটি ধাপের কাজ করেছে।

চারুচন্দ্রের সাহিত্যরস-প্রীতি কতখানি ছিল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ দেখা যাবে ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বে। আর শুধু তাই নয়, বনবিহারী মুখোপাধ্যায় বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় বেপরোয়া নামক যে অনিয়মিত পত্রিকা বা'র করেছিলেন তার লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম দেখলে এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থা'কে না। বেপরোয়া কাগজ মাত্র তিন সংখ্যা বেরিয়েছিল ১৯২৩ সালে। তার তৃতীয় বা শেষ সংখ্যাখানি বহু যত্নে উদ্ধার ক'রে বনবিহারীবাবু বছর তিনেক আগে

(১৯৫৯) আমাকে দিয়েছিলেন। মুদ্রণ তারিখ চৈত্র ১৩২১ সাল। অন্যান্য পরিচয়ে লেখা আছে প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (পূজা সংখ্যা)—অসাময়িক পত্র, সম্পাদক শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য এম-এ। লেখকগণ—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এম-এ, শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম-বি, শ্রীতুলসীচরণ ভট্টাচার্য এম-বি, শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য এম-এ।

এই লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে তুলসীচরণ ভট্টাচার্যকে আমি ১৯১৮ সালে ডাক্তাররূপে দেখেছি। তিনি আমাদের বিদ্যাসাগর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক 'বঙ্গের রত্নমালা' প্রণেতা কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের পুত্র, এই পরিচয় জানবার পর বিদ্যাসাগর হস্টেলে কোনো একটি ছাত্রের মুখে ইরিসিপেলাস হওয়ায় তাঁকে 'কল' দেওয়ায় তাঁর কথাটা মনে রেখেছিলাম। রোগী প্রথমে এক কবিরাজকে ডাকেন, কিন্তু তাঁর চিকিৎসায় কোনো ফল না হওয়ায় তুলসীবাবুকে ডাকা হয়। বড় বড় চুল ছিল, এবং তখনকার চেহারাটি মনে আছে, তার আরও কারণ বনবিহারী বাবুর সঙ্গে তাঁকে পরে (১৯২৫-২৬) দুচার বার দেখেছি। ব্যঙ্গপ্রিয় ছিলেন বনবিহারী বাবুর মতোই। হস্টেলের সেই রোগীর প্রসঙ্গে তাঁর একটি কথা আমার মনে গাঁথা আছে। কবিরাজ রোগীর পাশে উপস্থিত ছিলেন, তুলসীবাবু এসে রোগীর দিকে চেয়ে দেখলেন, এবং শুনলেন উপস্থিত সেই কবিরাজ তাঁকে দেখছেন। তিনি কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন কি চিকিৎসা করেছেন? কবিরাজ বললেন, সে অনেক কাণ্ড—কিন্তু কথাটা শেষ হ'ল না। তুলসীবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, দেখুন কোনো কাণ্ড করা আমাদের কিন্তু উদ্দেশ্য নয়।

এরপর কি ঘটেছিল তা কোনো মতেই মনে আনতে পারি না। কিন্তু ঐ কথাটা একজন ডাক্তারের মুখে খুব মনোহর বোধ হয়েছিল, তাই মনে আছে। যাতে কিছু অভিনবত্ব আছে তাতেই আমার আকর্ষণ। তারপর বনবিহারী-বাবুর চরিত্র দেখলাম এবং তাঁর দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। এবং প্রায় ৩৪-৩৫ বছর পরে বনবিহারীবাবুর সঙ্গে পুনরায় গভীরতর অন্তরঙ্গতা হ'ল। তাঁর কথা পরে বলছি।

বিজয়চন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় কোনোদিন হয়নি। তবে ১৯২৩ সালে নন্‌কলীজিয়েট পরীক্ষার্থীরূপে এম-এ দেবার আগে তাঁর

ভাষাতত্ত্বের একখানা বই পড়েছিলাম, এবং তারও আগে তাঁর কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তাঁর কবিতা আমার খুব ভাল লাগত।

'বেপরোয়া'র লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় কবে ঘটে, তা ঠিক মনে নেই, তবে ১৯৩৬ সালে একটি বিশেষ কারণে তাঁর সংস্পর্শে আসতে হয়, সেটি মনে আছে। আমার সেই পরিচয়-কথা গত পূজা সংখ্যা বসুধারায় আমি লিখেছি। এখানে সেই লেখাটাই উদ্ধৃত করি :—

১৯৩৬ সালের জুন মাসে। ম্যাট্রিক্যুলেশন পরীক্ষার ফল বেরোতে সামান্য কয়েক দিন দেরি আছে।

আমার বোন ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল থেকে সেবারে পরীক্ষা দিয়েছে।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য তখন সুকিয়া স্ট্রীটে থাকতেন, তিনি ছিলেন ঐ পরীক্ষার ট্যাবুলেটর—আগে থেকে পাস-ফেলের খবর দেবার মালিক।

আমার সঙ্গে তাঁর ইতিপূর্বে কোনো পরিচয় ছিল না, তাঁকে দেখিওনি। এবং তিনি যথাসময়ের পূর্বে কাউকে পরীক্ষার ফল জানান কি না তাও জানতাম না। আমার এ বিষয়ে কোনো আগ্রহও ছিল না। আমার কথা হচ্ছে—মাত্র কয়েক দিনের জন্য অধৈর্য কেন।

তবু পাড়া থেকে আমাদের বাড়ির ইনটারেস্টেড পার্টি শুনতে পেয়েছে সহপাঠিনীরা কেউ কেউ তাদের খবর জেনে ফেলেছে। কিভাবে জেনেছে তা আমার অজ্ঞাত ছিল, এবং চারুচন্দ্রই যে ট্যাবুলেটর তাও আমার জানা ছিল না। কিন্তু এসব বিষয়ে যাবতীয় তথ্য জানাবার লোকের অভাব হ'ল না, এবং বাড়ি থেকে যথেষ্ট উস্কানিপ্রাপ্ত হয়ে আমি চারুচন্দ্রের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম এক সকালবেলা। একটি ক্রুদ্ধ মূর্তির মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে হবে—এজন্য প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে তাঁকে রোল নম্বরটি দিলাম, এবং "যদি সম্ভব হয়" "যদি অসুবিধা না হয়" ইত্যাদি ভূমিকা জুড়ে দিলাম তার সঙ্গে।

কিন্তু, তিনি ক্রোধ প্রকাশ করলেন না, তাড়া ক'রে এলেন না, এবং যা যা করবেন কল্পনা করেছিলাম, তার কিছুই করলেন না। তিনি খুব সৌজন্যের সঙ্গে বললেন, "এখন নয়, পরে জানাব।"

আমি তখন তাঁর ব্যবহারে এমনই বিস্মিত যে, এই "পরে জানাব"

কথাটার প্রকৃত অর্থ কি, তা জিজ্ঞাসা ক'রে তাঁকে আর বিরক্ত করতে সাহস করলাম না। শেষে মনে হ'ল, "জানাবেন না" কথাটাই তিনি একটু ঘুরিয়ে ঐভাবে বলেছেন।

বাড়ি ফিরে এলাম। তখন তাঁর বাড়ি থেকে আমি সাত-আট মিনিটের দূরত্বে থাকি, একই পথের পশ্চিম প্রান্তে।

বেলা ছুটোর সময় কড়া-নাড়ার শব্দ।

দরজা খুললাম।

একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ভদ্রলোক আমাকে একটি রোল নম্বর দেখিয়ে বললেন, "আপনার বাড়ি থেকেই এই রোল নম্বর পাঠানো হয়েছিল।"

আমিই ঐ রোল নম্বর দিয়ে এসেছিলাম বলাতে, তিনি বললেন, "চারু ভট্টাচার্য মহাশয় আপনাকে জানাতে বলেছেন ঐ নম্বরের ক্যাণ্ডিডেট মঞ্জু গোস্বামী প্রথম বিভাগে পাস করেছে।"

যেখানে অনুরোধ বৃথা হ'ল ভেবেছিলাম, সেখানে তার বদলে একটি লোককে তিনি কষ্ট ক'রে পাঠিয়েছেন পাসের সংবাদ সহ।

একই সঙ্গে দু'রকম আনন্দ। চারুচন্দ্রের এই আচরণে মনে হয়েছিল ইনি আমাদের সাধারণ পরিচিত চরিত্র থেকে স্বতন্ত্র। আমি এ নিয়ে অনেক ভেবেছি। কোনো অপরিচিত ট্যাবুলেটরের সৌজন্য এতদূর পর্যন্ত ধাওয়া করে, এমন কথা আগে সত্যিই কল্পনা করতে পারিনি।

তখন থেকে চারুচন্দ্রের কথা আমার কতবার মনে পড়েছে, কারণ তাঁর এই সুজনতা আমার অন্তরে স্থায়ী ছাপ এঁকে গেছে।

এর আট-দশ বছর পরে বহু উপলক্ষে তাঁর কাছাকাছি এসেছি এবং সব সময়েই তাঁর মৃদু শান্ত স্বরের সঙ্গে মধুর হাসি যুক্ত হয়ে তাঁর প্রতি আমার আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

একই ব্যক্তির বহু পরিচয়। সাধারণত আমরা নিজ নিজ স্বার্থের সম্পর্কে মানুষকে বিচার করি। সৌভাগ্যের বিষয়, কোনো স্বার্থের সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে আমার ছিল না। তিনি বিজ্ঞানের বই লিখতেন সহজ ভাষায়—সেই সহজ সম্পর্কই ছিল আমাদের মধ্যে।

১৯৪৭ সালে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রেরণায় গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুবোধনাথ বাগচী, জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী ও আমরা আরও কয়েকজনে মিলে 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান

পরিষদ' গড়ার জন্য আবেদন প্রচার করি, তার কয়েক মাসের মধ্যেই চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য পরিষদের সদস্য রূপে যোগ দেন। আমাদের বয়সের পার্থক্য অনেক বেশি ছিল, তিনি আমার চেয়ে প্রায় ১৮ বছরের বড় ছিলেন, সেজন্য তাঁকে সম্মানের দূরত্বে রাখার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তিনি তাঁর দিক থেকে কোনো দূরত্ব রাখতে চাইতেন না।

আমার জ: একবার তিনি বিশ্বভারতীর পুলিনবিহারী সেনের মারফত কতগুলি চমকপ্রদ 'হাউলার' পাঠান, তাঁর ইচ্ছা ছিল 'সাহস পেলে' আমি যেন সেগুলি প্রকাশ করি। সেগুলির মধ্যে একটিমাত্র হাউলার ছাপায় ভয়ের কারণ ছিল, তাই সাহসের কথা উঠেছিল। আমি সেটিকে কিছু পরিবর্তিত আকারে অন্যগুলির সঙ্গে ছেপেছিলাম।

এই হাউলারগুলি পাঠানোর মধ্যেও তাঁর চরিত্রের একটি দিকের প্রকাশ আছে। তাঁর রসবোধের পরিচয় আছে এর মধ্যে।

আহার বিষয়েও তাঁর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। রাজশেখরের গৃহে তিনবার ও একটি বড় হোটেলে একবার, তাঁর খাওয়ায় যত্ন এবং আগ্রহ কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ করেছি।

খাওয়ার কথা তুলছি আর-একটা কারণে। আজ থেকে দশ বছর আগে ১৯৫২ সালে তাঁর কাছে 'যুগান্তর' পূজা-সংখ্যার জন্য একটি রচনা চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে যে সুন্দর একটি রচনা দিয়েছিলেন তার নাম 'খাদ্য-জিজ্ঞাসা'।

সে-সময়ে যাঁরা এই দীর্ঘ রচনাটি পড়েছেন তাঁরাই মুগ্ধ হয়েছেন। এই রচনাটির মধ্যে তাঁর চরিত্রের একটা বড় পরিচয় পাওয়া যাবে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি-জাত এমন একটি রসরচনা লেখা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। এর মধ্যে যেমন তাঁর ব্যক্তিগত আহার-বিলাসের কথা আছে তেমনি আছে চিন্তাধারার ভারসাম্য। তাঁর সম্পূর্ণ গোঁড়ামি-বর্জিত দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ প্রশংসনীয়।

বিজ্ঞান পড়া বা পড়ানো বৃত্তি হলেও ব্যক্তিজীবনে অনেকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে না, সেই কথটি স্মরণ করিয়ে দিলাম।

আর. এ. গ্রেগরি লিখিত 'ডিস্‌কভারি'-নামক একখানা বই আমি ১৯১৮-১৯ সালে প'ড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এবং সেবা-মনোভাব বিষয়ে এমন রোমাঞ্চকর বই আমি আর পড়িনি। একদিন (সম্ভবত ১৯৫৪-

এর কাছাকাছি কোনো সময়ে) বিশ্বভারতী অফিসে চারুচন্দ্রের সঙ্গে বিজ্ঞানের বই-লেখা বিষয়ে কথা হচ্ছিল। আমি তাঁকে বলেছিলাম, "আপনি তো বিজ্ঞানবিষয়ে বাংলাভাষায় সহজ বই লেখায় পটু, আপনি যদি গ্রেগরির 'ডিস্‌কভারি' বইখানা পড়েন তবে অনেক প্রেরণা পেতে পারেন।"

চারুচন্দ্র তার উত্তরে মৃদু হেসে বলেছিলেন, "ঐ বইখানাই আমার একমাত্র ভরসা।" এ কথায় আমি একটু লজ্জিত হয়েছিলাম অবশ্যই। আমার অনুমান করা উচিত ছিল, এমন একখানা বই তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি-লাভে এ বই অনেকখানি সাহায্য করেছে।

সম্পাদনা-কাজে তাঁর যে সনিষ্ঠ সহৃদয় ব্যবহার দেখেছি তা এ-যুগে ক্রমে দুর্লভ হয়ে এলো। আমি গতবছর (১৬ই মার্চ, ১৯৬০) রাজশেখর বসুর বাড়িতে নতুন লেখিকা মায়া বসুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর সেই লেখিকার প্রেরিত গল্প প'ড়ে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে তাঁর ভালো-লাগার কথা তাঁকে লেখে জানিয়েছেন, এবং একাধিকবার। তারপর লেখিকার প্রথম লেখা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি তাঁকে পাঠানো হ'লে, তিনি তার প্রত্যেকটি লাইন অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে প'ড়ে, যেসব জায়গায় তিনি কিছু কিছু পরিবর্তন ভালো মনে করেছেন, তা তাঁর চিঠিতে ঐ পাণ্ডুলিপির পরিবর্তনযোগ্য পৃষ্ঠাগুলির লাইনের নম্বর উল্লেখ ক'রে লেখিকাকে জানিয়েছেন। সে উপন্যাস তিনি পরে 'বসুধারা'তে ছেপেছেন।

তাঁর বয়স বেশি হলেও তিনি হাল্‌কা ওজনের ছিলেন এবং হাল্‌কা কথা বলতেও অত্যন্ত পটু ছিলেন। তাই আশা করেছিলাম তিনি আরো অনেকদিন বাঁচবেন। কিন্তু সংসারে আমাদের ক'টা আশাই বা পূর্ণ হয়?

বেপরোয়ার সম্পাদক বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার মুখ্য বা গৌণ, কোনো ভাবেই কোনো পরিচয় ঘটেনি।

চারুচন্দ্রের কথা বলছিলাম। "বেপরোয়া" নামক এমন দুর্ধর্ষ ব্যঙ্গ-পত্রিকার সঙ্গে তার নাম যুক্ত হওয়া অবশ্যই ইঙ্গিতপূর্ণ। তিনি যে সাহিত্য-রসিক কতখানি এবং ব্যঙ্গরচনাতেও যে তাঁর অধিকার কতখানি আছে, তা বেপরোয়ার একটি প্রবন্ধ থেকেও প্রমাণ করা চলে।

এতে 'ইলেকট্রিসিটি' নামক একটি ব্যঙ্গ-রচনা আছে। বিজ্ঞান ও

মারাত্মক ব্যঙ্গ একসঙ্গে। লেখকের নাম নেই। একমাত্র বিজয়চন্দ্র মজুমদারের লেখাগুলি স্বাক্ষরিত। অন্য লেখাগুলির মধ্যে অধিকাংশই বনবিহারী বাবুর লেখা, তিনি নিজহাতে নাম স্বাক্ষর ক'রে আমাকে দিয়েছেন। বাকি রইল ঐ একটিমাত্র রচনা। কিন্তু যেহেতু এর নাম ইলেকট্রিসিটি সেই হেতু আমি অনুমান করছি—এটি চারুচন্দ্রের রচনা। কিছু কিছু উদ্ধৃত করি :

"স্বর্ণ।—ভারত ধর্ম মহামণ্ডল কর্তৃক পরিচালিত একখানি কাগজে দেখা গেল যে স্বর্ণের ভিতর একপ্রকার তড়িৎ আছে, যাহা দেহের সহিত মিশ্রিত হইলে ইন্দ্রিয়গণকে অতিরিক্ত মাত্রায় উত্তেজিত করিয়া তোলে।'—এই জন্যই বিধবার স্বর্ণালঙ্কার বর্জনীয় এবং বিধবা ব্যতীত অন্য সকল স্ত্রীলোকের ইন্দ্রিয়কে অনুক্ষণ অতিমাত্রায় উত্তেজিত করিবার জন্য তাহাদিগকে সর্বদা স্বর্ণালঙ্কার-মণ্ডিত রাখা উচিত—তা তাঁহাদের বয়স ৫ মাসই হউক কি ১০৫ বৎসরই হউক।

"লৌহ।—লৌহনির্গত তাড়ৎ স্ত্রীপুরুষ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া করে। হস্তস্থিত লৌহবলয় নারীকে স্বামী-সোহাগিনী করে, তাই সধবা স্ত্রীলোককে হাতে লোহা ধারণ করিতে হয়। পূর্বে স্বর্ণের গুণের কথা বলা হইয়াছে, তাই আজকাল শুধু লৌহ তাঁহারা পরেন না, উহাকে স্বর্ণমণ্ডিত করেন। পুরুষের হস্তস্থিত লৌহবলয় মস্তিষ্ক শীতল করিয়া তাহাকে ধীর শান্ত করে, যথা কালামাতার বালা বা দারোগা সাহেবের বালা।..

"তড়িৎ সম্বন্ধে আর্য ঋষিদিগের প্রকৃষ্ট জ্ঞানের একটি প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপলিকেশন—

"আমরা জানি দেহ তড়িতে পূর্ণ। এই দেহস্থিত তড়িৎ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া নিশ্চয়ই ল' অভ রিপাল্শন অনুসারে মস্তক ও পদ— শরীরের এই দুই প্রান্তে চালিত হয়। পদসংলগ্ন তড়িৎ ভূগর্ভে লুপ্ত হইয়া যায়। অবশিষ্ট থাকে মস্তকস্থ তড়িৎ। এই তড়িৎকে যদি খুব অল্প পরিসর স্থানে নিবদ্ধ করিতে পারা যায়, তো ঐ তড়িতের পোটেনশিয়াল খুব বেশী হওয়ায় উহার কার্য্যকারী শক্তি অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। তড়িৎশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন আর্যগণ একথা জানিতেন, তাই তাঁহারা রাখিলেন টিকি। সমস্ত তড়িৎ টিকিতে সংহত হইল। কিন্তু এই টিকির ডগা যদি ফরফর করিয়া উড়িতে থাকে, তো তড়িৎ পয়েন্ট দিয়া আকাশে লীক করিয়া যাইবে, তাই তাঁহারা টিকিতে ফাঁস দিয়া

তাহার ডগাটি মস্তকের দিকে ফিরাইয়া দিলেন।...কিন্তু পাদদেশে চালিত তড়িৎ তো ভূপৃষ্ঠে সঞ্চারিত হইয়া যায়। তাই তাঁহারা বসিবার আসন করিলেন সব নন কন্‌ডাকটরস্—মৃগচর্ম, ব্যাঘ্রচর্ম প্রভৃতি।"

চারুচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বছর আগে লেখা এই ব্যঙ্গ তখন সমাজ-জীবনে নতুন ছিল। সমাজের বহু অর্থহীন কু-সংস্কারকে এইভাবে ভেঙে দেবার জন্য তখন এঁরা কয়েকজন একত্র জুটেছিলেন।

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়

এই দলের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং দুর্দান্ত চরিত্রের ব্যঙ্গকার ছিলেন বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। তিনি এখনও জীবিত। স্মৃতিচিত্রণে তার অদ্ভুত চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমি অনেকখানি বলেছি। কিন্তু তাঁর রচিত ব্যঙ্গ চিত্র বা সাহিত্য যে কতখানি শক্তিশালী, তা না দেখলে বা পড়লে হৃদয়ঙ্গম করা শক্ত।

আমি 'ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী' নামক ব্যঙ্গগল্প সঙ্কলনের ভূমিকায় (২য় সং) বনবিহারী বাবু সম্পর্কে এক স্থানে লিখেছিলাম, ...যদি ইউরোপের রোজার বেকন বা এমন কি ভোলতেয়রের যুগেও আমাদের দেশের আধুনিক ব্যঙ্গ-রচয়িতারা জন্মাতেন, তা হ'লে...সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বর্ষণের দরুন বাংলাদেশে প্রথম শহীদ হতেন বনবিহারী মুখোপাধ্যায়।"

'বেপরোয়া' কাগজে প্রকাশকের নিবেদন ছাপা হয়েছে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর স্বাক্ষরে, ঠিকানা: ১০৩ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, পোঃ সিমলা। প্রথমেই বলা হয়েছে শ্রীশ্রী ঘেঁটুরাজের পূজা উপলক্ষে আপিস সুদীর্ঘকাল বন্ধ থাকাতে পূজার সংখ্যা বেপরোয়া একটু বিলম্বে বাহির হইল।...ইত্যাদি। এ রচনাটিও বনবিহারী বাবুর।

'উপাধি' নামক একটি ব্যঙ্গ প্রবন্ধে বিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখছেন—... বেঙ্গাচীর যাহা খসিলে সে মুক্তির জলে লীন না হইলেও লাফাইয়া বেড়ায়, সাধুপুরুষদের তাহা খসিবার নয়। স্বয়ং ব্রহ্মকেও উপাধির জোরে, উপসর্গের জোরে ও নামের জোরে বাঁচিতে হইতেছে! আমরা ঠাকুরকে চাই না, চাই

তাঁহার নাম।…উপাধির জোর না থাকিলে ব্রহ্মকেই ব্রহ্মসাগরে মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করিতে হইত।

"ঠাকুরবর্গে নিরুপাধি আছেন—এক ঘেঁটু। বেদপুরাণ যাঁহার তত্ত্ব পায়না, তিনি যখন সকলের বড, তখন ঘেঁটুর চেয়ে বড আর কে আছে? উঁহার গায়ে সংখ্যা-কারক বোধয়িত্রী বিভক্তি নাই, কোন লিঙ্গবাচী প্রত্যয় নাই, এবং উপসর্গের বালাই নাই, কোন ব্যাকরণের সাধ্য নাই ঠাকুরের ব্যুৎপত্তি করে।…

'বেপরোয়া'র আরম্ভেও ঘেঁটুকে আহ্বান। লিখেছেন বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। সংস্কৃত স্তোত্র রচনাও বনবিহারী বাবুর। ব্যঙ্গের সব্যসাচী তিনি। স্তোত্রটি এই—

দৃষ্টাঃ স্পৃষ্টা বিমৃষ্টাঃ ক্বচিদপি ন মযা মাঘমাঘী কৃতাপঃ
হস্তে বাস্তিক্যলোপাচ্চকিতমতিমতা জাতু নারোপিতঃ soap
অদ্য প্রোদ্দামদীব্যৎখুজুলিচুলকনা—খোসদাদীক্বতোঽহং
বন্দে মন্দারশোভং তব পদযমলং হে মহাদেব ঘেঁটো॥

তারপর—"হে দেবাদিদেব, হে ঘেঁটো, একবার আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হও, আমরা তোমাকে নমস্কার করি।…শীতলার তবু একটা গাধা আছে, তোমার তাহাও নাই, quack [বা হাতুড়ে] বলিয়া আজিও গাধা কিনিতে পার নাই। ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইও না। এদেশে হাতুড়ের দর কম কিন্তু কদর বেশী।…"

'বেপরোয়া' নামক অসাময়িক পত্রিকাটি প্রকাশ হয় ১৯২৩ সালে। আমার সঙ্গে বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় ঘটে ১৯২৫ সালে। এই সময় বনফুল-এর বন্ধু এবং গুরু ছিলেন তিনি। আমারও বনফুলের বন্ধুরূপেই বনবিহারীবাবুর সংস্পর্শে আসা সম্ভব হয়েছিল, নইলে যোগাযোগ ঘটবার কোনো সূত্রই ছিল না।

এই সময়ে বেপরোয়ার ব্যঙ্গ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। গোঁড়ামির বিরুদ্ধে এই জাতীয় ব্যঙ্গ তখন প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একটা প্রচণ্ড শক্তির আক্রমণে ঘুণ ধরা সমাজের কাঠামোটাই ভেঙে পড়ে বুঝি। একটা বিশেষ সময়ে প্রাচীন সংস্কারের নব্য ব্যাখ্যা দিতে যেমন রক্ষণশীলদের

মুখপাত্ররূপে কয়েকজন ব্যক্তির উৎসাহ জেগেছিল, এই কালাপাহাড়ের দলও ঠিক সময়ে আবির্ভূত হয়ে যুক্তিবাদীদের মুখপাত্রের ভূমিকা নিয়েছিলেন। গোঁড়ামির নব্য ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ নস্যাৎ হবার উপক্রম হয়েছিলেন—অবশ্য তাঁদের মতে। রবীন্দ্রনাথ বিপক্ষের আক্রমণে কোনো দিনই বিচলিত হননি, এবং তার 'নিউস্যান্স' মূল্য ভিন্ন অন্য কোনো মূল্য আছে ব'লে স্বীকার করেননি। বিরক্ত হয়েছেন মূর্খতার চেহারা দেখে। মাঝে মাঝে প্রসন্নচিত্তে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু গোঁড়ামি ঘোচেনা তাতে।

গোঁড়ামির পিছনে এক অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব আছে। সমাজের জন্য সব যুগেই নতুন নতুন বন্ধন বা বিধিবিধান রচিত হয়েছে। এ বিধান মানুষের তৈরি, অতএব পরিবর্তন-যোগ্য। একই বিধান সব কালের উপযুক্ত হ'তে পারে না। কিন্তু ভীরু মন এটা বিশ্বাস করতে চায় না। যে বিধি আর চলতে পারে না যাকে জোর ক'রে ধ'রে রাখতে চাইলে নিজেদেরই ক্ষতি, তাকেই জোর ক'রে ধ'রে রাখার চেষ্টা। কালের বদল তাদের চোখে পড়ে না। চোখের সামনে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখলেও তা বিশ্বাস করতে চায় না।

সেই "যেতে নাহি দিব" কবিতার তত্ত্বকথাটি মনে করিয়ে দেয়। অর্থাৎ যতই প্রাণপণে প্রিয়বস্তুকে আঁকড়ে ধ'রে 'যেতে নাহি দিব' ব'লে চেঁচাতে থাক, ধ'রে রাখা যায় না, 'তবু হায় যেতে দিতে হয়।'

ছোট ছোট মেয়েকে ধ'রে সমাজের নামে অপাত্রে বলি দেবার প্রথা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব'লেই গোঁড়া মানুষের মনে আগের যুগে এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু যাঁদের দৃষ্টি একটু দূরে প্রসারিত, তাঁরা এর নিষ্ঠুরতায় বিচলিত হয়েছেন। যাঁরা নিয়মের চেয়ে মানুষকে বড় ব'লে মানেন এমন মানুষের আবির্ভাব বাংলা দেশের পক্ষে অপ্রত্যাশিত ছিল না। পূর্ব থেকেই সমাজ সংস্কারক একে একে আবির্ভূত হচ্ছিলেন সমাজের নানা প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করতে। এঁদের মধ্যে ব্যঙ্গের আঘাত হানতে যাঁরা কলম হাতে নিয়েছিলেন বনবিহারীবাবু তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। তাঁর সমাজ বোধ কোনো শখের জিনিস নয়, কোনো সাইড-বিজনেস নয়, তাঁর আক্রমণ সর্বাত্মক এবং তিনিই এই কাজেই সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছেন।

এ কথার পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যাবে তাঁর সব লেখার মধ্যে। সে লেখাগুলি

এক সঙ্গে ছাপা হওয়ার দরকার ছিল, কিন্তু বোধ হয় সময় আসেনি। বিভিন্ন কাগজে ছড়িয়ে আছে। তার তালিকাও তিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

তাঁর লেখা আমি চার বছর আগে অনেকগুলো নিজে ছেপেছি ও বিভিন্ন কাগজে পাঠিয়েছি। অনেক লেখা এখনও ধরা আছে।

একটা লেখা ছাপবার সময় আমি জানিয়েছিলাম আপনার অনেকগুলো কথা কেটে দিচ্ছি। আমাদের 'টাবু' আছে অনেক বিষয়ে। তার উত্তরে যে চিঠি লিখেছিলেন (৭-১১-৫১) তার একটি কথা হচ্ছে এই—'টাবু' আমার লেখায় থাকেই। 'টাবু' আমার মাথার মধ্যে টগবগ ক'রে ফুটচে। সময়ে অসময়ে বেরিয়ে পড়েই। সেগুলো কেটে দেবার অধিকার তোমায় দিলুম। আমি নিজেই চিঠি লিখে···কেটে দিতে বলব ভেবেছিলুম।" ··

মাথার মধ্যে এই যে সমস্ত 'নিষিদ্ধ' টগবগ ক'রে ফুটছে, এই হ'ল বনবিহারীবাবুর আসল পরিচয়। তিনি শৌখিন সংস্কারক কদাপি নন, বিদ্রোহ তাঁর রক্তে।

১৯২৩ সালে এর প্রাথমিক পর্যায় দেখা যাবে তাঁর নানা রচনায়। একখানা মাত্র 'বেপরোয়া' সংখ্যা তাঁরই রচনাতে বোঝাই। বারো আনা তাঁর রচনা।

বনবিহারীবাবুর 'কলির ফের' কাহিনীতে দেখা যায়—মেয়ের বয়স বারো—সর্বনাশ হ'ল, ধর্মে আর কত সহ্য হয়, অতএব খোঁজ খোঁজ পাত্র খোঁজ। নানা স্থানে নানা জাতীয় পাত্র খুঁজেও পণের দাবীতে প্রত্যেকটিকে ছাড়তে হল।

> চড়াদড়ের বার্তা শুনে কর্তা অকস্মাৎ
> "ধর্ম গেল।" ব'লে মাথায় কল্লেন করাঘাত।
> পড়লেন শুয়ে দাওয়ার উপর, দিলেন হাল ছেড়ে।—
> এমন সময় নীলু ঘটক এলেন টিকি নেড়ে,
> আনলেন সাথে সাত গাঁ খুঁজে সস্তা দরে বর,
> চেলির জোড়ে অঙ্গ ঢাকা, অনঙ্গ সুন্দর।···
> নাকের স্থানে গর্ত—কারণ বলতে দোষ কি আর ?
> বরের ছিল কুষ্ঠ। তা রোগ নেই বা বল কার ?"

গিন্নির এ বর পছন্দ নয়।

"নাক নিয়ে কি ধুয়ে খাবে ?" কর্তা বল্লেন চোটে
শালগ্রাম যে দেবতা তার ত নাক নেইক মোটে !"

বিয়ে হয়ে গেল। বরের হাতও মুলো। কনে বরের আলিঙ্গনপাশ-মুক্ত হয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো, কিন্তু

কাণ্ড দেখে স্তব্ধ সবাই। এলেন পিসি মাসি,
বল্লেন ডেকে, কল্লি এ কি ওলো সর্বনাশী ?
পতিই হলেন দেবতা, নারীর পরম তীর্থ পতি
পতির পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা, পতিই নারীর গতি।...
পতি পরম গুরু এমন চিরুনিতেও লেখে,
পতিভক্তি শিখলি না-ক আজও এ সব দেখে ?

সবাই মেয়েটাকে বক্তৃতার চোটে পতিভক্তি শেখাতে লাগল। "পতি পরম গুরু এমন চিরুনিতেও লেখে"—এত বড় একটি উজ্জ্বল নজির চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো সত্ত্বেও মেয়েটি স্বামীর বাড়িতে না গিয়ে যমের বাড়িতে যাওয়াই পছন্দ করল।

কাহিনীটির দৈর্ঘ্য প্রায় আট পৃষ্ঠা। নিচে ফুট নোটে লেখা আছে— 'কিছুকাল পূর্বে প্রবাসীতে প্রকাশ যে, বাঁকুড়া জেলার দুইটি হিন্দু বালিকা আত্মহত্যা করিয়াছিল। কারণ আর কিছুই নহে, কুষ্ঠরোগীর সহিত তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল এই মাত্র।"

এই হ'ল কবিতার প্রেরণা। সমাজের এই জাতীয় সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে বনবিহারী বাবুর মতো সমস্ত জীবন এমন সনিষ্ঠ কলম ধরার দৃষ্টান্ত বাঙালীর মধ্যে আর নেই।

আমি শুধু তাঁর পরবর্তী কালের আরও কঠিন আক্রমণমূলক লেখার প্রাথমিক পর্যায়গুলির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিলাম। বয়স এ সময় তাঁর ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হবে।

সর্বজাতীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর বিদ্রোহ।

রবীন্দ্র বিরোধীদের বক্তব্য নিয়ে ব্যঙ্গ করেও বনবিহারীবাবু অনেক লিখেছেন এবং ছবি এঁকেছেন। তাঁর 'বঙ্গভাষা' নামক ব্যঙ্গ রচনাটিতে একই সঙ্গে সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ বিশ্লেষণ ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি আপাত

ব্যঙ্গ বর্ষণ। এর অর্থ আর কিছুই নয়, রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা ব্যঙ্গ করতেন এ ব্যঙ্গ তাঁদেরই বিরুদ্ধে. রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নয়।

বনবিহারীবাবু ছিলেন ডাক্তার। মেডিক্যাল কলেজে ছিলেন যখন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তাঁর প্রখর (যোদ্ধৃমূর্তি) আমি দেখেছি এবং দেখে মুগ্ধ চমৎকৃত হয়েছি। তাঁর মতো সর্ববিষয়ে প্রায় সমবিদ্বান দুর্লভ।

তাঁর ব্যঙ্গচিত্রগুলিও তাঁর ভাষার মতোই জোরালো এবং ধারালো। তিনি এ সময়ে ছিলেন প্রগতিধর্মে উজ্জ্বল। নিজের বৈষয়িক সুবিধা বা খাতির পাবার জন্য তাঁর মনে কোনো রকম দুর্বলতা ছিল না। তিনি ছিলেন মনে প্রাণে খাঁটি সন্ন্যাসী। মেকি তাঁর মধ্যে কিছু ছিল না, মেকি তিনি সহ্য করতে পারতেন না—এই মূর্তিই আমি তাঁর মধ্যে দেখেছি এই সময়। দুর্লভ পুরুষোচিত সৌন্দর্য ছিল তাঁর চেহারায় বাক্যে ব্যবহারে। যদিও ব্যঙ্গপ্রেরিত হ'লে তিনি কাউকে খাতির করতেন না এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত নিষ্ঠুর হয়ে পড়তেন। এ সব কথা স্মৃতিচারণে আমি লিখেছি। 'বেপরোয়া'র দলটি জুটেছিল ভালো, যদিও বিমলচন্দ্র মজুমদার এঁদের সঙ্গে ভাবগত মিলের একটা সাধারণ সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছিলেন। এই গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র বনবিহারী-বাবুই ছিলেন মোটা [illegible]

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী রচনা এতই প্রবল এবং শাণিত যে তা অনেকে সহ্য করতে পারেনি। তাঁর লক্ষ্য সব সময়েই প্রায় প্রথা বা সমাজের নামে অসহায় মেয়েদের উপর, অত্যাচারী পুরুষের বিরুদ্ধে। সত্য কথা বলতে তাঁর কোথাও কোনো দ্বিধার লেশ মাত্র নেই। মনে হয় তাঁর নীতি রবীন্দ্রনাথের বাণী থেকেই আত্মস্থ করা—

> "ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
> হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
> তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
> সত্য বাক্য ঝলি উঠে খরখড়গ সম
> তোমার ইঙ্গিতে।" ....

এ আদর্শ থেকে বনবিহারীবাবু ভ্রষ্ট হননি। তাঁর 'নরকের কীট' নামক

ব্যঙ্গ রচনাটিকে আমি বনবিহারীবাবুর একটি শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ ব'লে মনে করি। এতে তাঁর পাকা হাতের ছাপ। এখানে হিউমার কমে এসেছে বিষয়বস্তুর জরুরিত্বে। কিছু নমুনা উদ্‌ধৃত করি—

"নরক ?—নরকেই ত আছি হে। Been there since 1876. একটা আইডিয়া দিই। উত্তরে হিমালয় পর্বত দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর—হাঁ হাঁ তাই। I mean your সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং—অর্থাৎ কি না যে দেশে আখ খেজুরের চাষ হয় এবং জাভা থেকে চিনি আমদানি করতে হয়···। নাঃ তোমাদের দোষ কি ? দোষ সব অশোকা মহাব। ১২৯৯ সাল থেকে দাসত্ব করে আসছে, অথচ জাতকে ভাত সমুদ্র ডুবে ম'ল না। আজও বাঁচতে চায়, অমর হতে চায়। আজও বংশ বৃদ্ধি করছে আর রেখে যাচ্ছে কতকগুলো হ্যাংলা ক্যাংলা ছেলের পাল, যাদের পেট ভরবে শুধু পীলে আর লিভারে। A colony of maggots in a dungheap !

ধানের ক্ষেতে লাঙল পড়ে না। তা হোক, ছেলের ক্ষেত পতিত থাকবার ভয় নেই, কনসেণ্ট বিলের নামে হাহাকার একেবারে।

মর‍্যালিটি ?—হাঁ ও জিনিসটা তোমাদের আছে। সুবোধকে চিনতে ? ওরকম মর‍্যাল লোক প্রায় দেখা যায় না। চুরি করতে পারল না ব'লে চাকরি খোয়াল। তাতে টাকাকড়ি কোন কালেই বিশেষ কিছু ছিল না··· কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় তার স্ত্রী একটু লেখাপড়া জানতেন। Higher sphere এ মিশবে ব'লে হয়ত শিক্ষিত মেয়ে বে করেছিল। তার প্রত্যক্ষ ফল হয়েছিল চারটে না কটা ছেলে। এই গুলোকে নিয়ে স্ত্রী এক স্কুলে কর্ম নিলেন। সেও আবার বরিশালে না কোথায়।

ছেলে-পুলের সমস্ত ভারটা স্ত্রীকেই বহন করতে হল। তিনি বেতন পেতেন অল্প। তাই স্কুলের কাজের পর সমস্ত দিনটাই প্রায় টিউশন ক'রে কাটাতে হ'ত। প্রবাসে নিরানন্দে গুরুশ্রমে তিনি বেশ রুগ্ন হয়ে পড়লেন।··· সুবোধ স্ত্রীর জন্য হা-হুতাশ করত অনেক, কিন্তু কিছু সাহায্য করতে পারত না। তবে মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করত, এবং একটি ক'রে সন্তান দিয়ে আসত। ঐ অবস্থাতেই তাঁর গর্ভে আরও চার-পাঁচটা সন্তান উৎপাদন ক'রেছিল।

"Human weakness ? It is inhuman weakness !

"আমি তাকে বলেছিলুম ঐ শ্মশানের মড়াটাকে ছেড়ে দাও। তুমি না হয় একটু কুপথে যাও। But he had nor the pluck to be immoral. He had a homicidal morality.

"স্ত্রীকে তুষ্ট করিবার জন্য সে এই কাজ করেছিল? It is a lie! It is worse than that. It is হিতোপদেশ! ঐ হিতোপদেশে অষ্টগুণ কামাগ্নির তুষানলে তোমরা পুড়ে খাক হয়ে গেলে। আজও আগুন নিবল না। আজও পথে ঘাটে তোমাদের তরুণ সাহিত্যের ফ্রয়েডিজম অ্যাণ্ড সাইকোলজির মধ্যে আমি দেখতে পাই ঐ আদ্যিকালের তুষানলের হল্কা। সুবোধকে কামনা করা দূরে থাক, তার স্ত্রী পায়ে ধ'রে তাকে বলেছিল, 'ওগো, আমার উপর দয়া কর। আমার কাছে আর এসো না।' প্রথমটা অনুরোধ উপরোধ। তারপর রাগারাগি। শেষটা she refused to meet him.

"কিন্তু সবল পুরুষ এত সহজে তার প্রপারটি ছাড়বে কেন? খুব খানিকটা লাঠালাঠি, পুলিস পেয়াদা, মামলা মকদ্দমার গুজব শুনেছিলাম। তবে ব্যাপারটা বেশি দূর গড়াল না। স্ত্রীটা managed to die in a hospital during child birth....

"সুবোধও মারা গেছে···

"—ছেলেগুলো? হা হা হা হাঃ সেগুলো ডিমভাঙা মাকড়সার বাচ্চার মত ছরছর ক'রে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

"তাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান আমি করেছি? হ্যাঁ, তা করেছি ত।··· করেছি তাতে কি? তাতে সুবোধের মর‍্যালিটি কিছু কমল?

"—ও! আমার মহানুভতা? তা বটে! But don't you know I used to love that girl?

"না না না না! সে রকম কিছু না! ভয় পাবার মত কিছু নেই। তাঁর মধ্যে প্রেমের লেশ মাত্রও ছিল না। স্বামীর প্রতিও না, পরপুরুষের প্রতিও না She was nothing but a mother, এবং মাতৃত্ব ছিল তার দু'চক্ষের বিষ।

"আঃ। বাঁচা গেল, কি বল? সুবোধের স্ত্রী আমাকে ভালবাসত এমন হ'লে গল্পটা একেবারে মাটি হয়ে যেত। কেমন, না?"···

এই হ'ল এ কাহিনীর আরম্ভ।

আর এই হ'ল বনবিহারীবাবুর ব্যঙ্গের চেহারা। তাঁর আঁকা ব্যঙ্গ-চিত্রগুলিও একত্র করলে একখানা উৎকৃষ্ট বই হ'তে পারত। তার শক্তিও কম ছিল না।

স্মৃতিচিত্রণে এঁর অনেকখানি পরিচয় দেওয়া আছে। আরও একটি কাহিনী আমি তখন শুনেছিলাম বলাইচাঁদের কাছে। বনবিহারীবাবু একবার বিহারের কোনো মহকুমা শহরের হাসপাতালে বদলি হয়ে গেছেন। স্থানীয দু চার জন বাঙালী এসে আলাপ ক'রে গেলেন তাঁর সঙ্গে। তাঁর কাছে বাংলা বই দেখে কিছুদিন পরে এক ভদ্রলোক তাঁর কাছ থেকে পড়বার জন্য একখানা ভাল বই চেয়ে পাঠান। বনবিহারীবাবু রবীন্দ্রনাথের কোনো একখানা বই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে।

কিন্তু সে বই তাঁর পছন্দ না হওয়াতে ফেরৎ পাঠিয়ে লিখেছিলেন ভাল বই চান তিনি।

বনবিহারীবাবু এবারে তাঁকে মোটা একখানা পঞ্জিকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ ভিন্ন আর কি-ই বা করতে পারতেন তিনি।

এমন মানুষের হৃদয়ে পৌঁছনো বড়ই কঠিন। হৃদয আছে ব'লেই কারো মনে হবে না। অথচ সেই বনবিহারীবাবুর চোখেও জল ঝরে। জল ঝরেছে ব'লেই সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই।

তাঁর চরিত্রের এই দিকটির কথা আরও একটুখানি স্পষ্ট ক'রে বলি। বহুকাল পরে তাঁর সঙ্গে যখন পুরনো আলাপের সূত্র ধ'রে নতুন ক'রে আলাপ হ'ল, তখন তা শুধু আলাপ-এর সীমানাতেই আবদ্ধ থাকেনি, আত্মীয়তায় পরিণত হয়েছিল। তিনি আমাদের বাড়িতে প্রায় আসতেন, কিন্তু সুযোগের অভাবে আমি তাঁর লেক রোডের বাড়িতে যেতে পারিনি।

তিনিই লেখা নিয়ে আসতেন আমাদের বাড়িতে। অভিমানী লোক, আত্মসম্মান বোধ অত্যন্ত উগ্র। মাথা নিচু করেননি কোনো অন্যায়ের কাছে। অনুগ্রহ ভিক্ষা করেননি কারো কাছে। আমাকেও একবার লিখেছেন মাথা উঁচু রাখতে। ১৯৫৯ সালের ৩০শে নবেম্বর একখানা দীর্ঘ চিঠির শেষে আমাকে (আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে শুনে) লিখছেন—"কাসতে কাসতে

মাথা বার বার নুয়ে পড়বে, তবু মাথা উঁচুই রেখো। নোয়ালে নুয়েই পড়বে। তাতে আনন্দ নেই।”

বলেছি লেখা নিয়ে আসতেন আমাদের বাড়িতে। ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯৫৯) তারিখেও এসেছিলেন। কিন্তু এই ভাবে লেখা নিয়ে আসা উচিত হচ্ছে কি না হঠাৎ তাঁর মনে এমন একটি প্রশ্ন জেগে থাকবে। আমাকে পরদিনই চিঠি লিখলেন—

পি ২৪৫ লেক রোড, কলিকাতা ২৯

৫-১২-৫৯

পরিমল,

কাল তোমার কাছ থেকে আসবার সময় নিজের কাঙালমূর্তি প্রত্যক্ষ ক'রে আঁৎকে উঠলুম। লেখার তাড়া নিয়ে বা কোনও দরখাস্ত হাতে করে দ্বারে দ্বারে ঘোরাত কখনো করিনি। আজ হঠাৎ এ কাজ করবার প্রবৃত্তি হ'ল কেন? আমার লেখা পাঁচজনকে দেখাবার এ লোলুপতা আমার পক্ষে অত্যন্ত বিসদৃশ। মনে হচ্ছে জরাজীর্ণ মনের আলস্যে একটা বেসামাল কাজ ক'রে ফেলেছি—enlarged prostate হলে দেহ যেমন করে।

এবার আত্মস্থ হলুম। লেখা ও ছবির উপর থেকে সমস্ত মমত্ব প্রত্যাহার করে নিলুম। ছাপা হোক আর না হোক তাতে আমার কিছু এসে যায় না। ‘নরকের কীট' যেমন করে ছাপিয়েছ—আমার অনুরোধ বা অনুমতির অপেক্ষা না রেখে, তেমনি ক'রে ছাপাতে হয় ছাপিও, না ছাপালে ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিও। আমাকে ফেরৎ পাঠাতে হবে না। কারণ আমি কিছু সঞ্চয় ক'রে রাখি না। রাখবার আধারও নেই।

অফিশিয়াল খামের পেছনে অর্ডিনারি কালিকলম দিয়ে ছবি এঁকে ছড়িয়ে দিয়েছি। পয়সা চাইনি, appreciation-এরও ভরসা করিনি। মনের সেই সতেজ স্বাতন্ত্র্য আমার ফিরে আসুক, এই প্রার্থনা করে right about turn করলুম।

এবার যখন দেখা করতে যাব, কেবল দেখা করার বেশী কিছু মনে নিয়ে যাব না।

শুভাকাঙ্ক্ষী

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়

আসল মানুষটির পরিচয় এতে অনেকখানি পাওয়া যাবে। ঋজু মেরুদণ্ড। অনমনীয়। উচ্চ শির। বলিষ্ঠ মন। উগ্র স্বাতন্ত্র্য।

এ চিঠি পেয়ে আমি রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। আঘাতও পেয়েছিলাম কম নয়। হঠাৎ মনে হয়েছিল আমার কোনো কথায় বা ব্যবহারে কি তাঁর এসব মনে হয়েছে? অনেক চেষ্টা ক'রেও কিছু মনে আনা গেল না। তা ভিন্ন তাঁর প্রতি আমার এমনই একটা আকর্ষণ এবং তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা-ভালবাসা এমনই অকৃত্রিম যে তাঁকে কোনো মতেই আমার কোনো ব্যবহারের দ্বারা দুঃখ দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। নিশ্চয় তিনি নিজের লেখা নিজে ব'য়ে আনার ব্যাপারটাই ভাল মনে করেন নি এবং এ রকম আসাটাই অন্যায় মনে করেছেন, তাই এমন একখানা চিঠি।

নিজের লেখা ব'য়ে আনা নিয়ে আমি চিন্তা করলাম। বনবিহারীবাবুর পক্ষে এটি কিছুমাত্র অন্যায় হয় নি। তাঁর লেখা বিষয়ে আমার প্রকৃত শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়ে এবং আমার লেখার মধ্যে কিছু সহধর্মিতার পরিচয় পেয়ে, তিনিও আমাকে তাঁর সুহৃৎ ব'লেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই আমার কাছে তাঁর কোনো লজ্জা বা সঙ্কোচ ছিল না। তবু হঠাৎ ওরকম একখানা চিঠি তিনি লিখলেন কেন তা নিয়ে চিন্তা করেছি। তিনি আমাকে পরম বন্ধু মনে ক'রেই আসতেন আমার কাছে, তবু কোনো কারণে মনে আত্মজিজ্ঞাসা জেগে থাকবে। নিজের লেখা ব'য়ে আনার মধ্যে কিছু দীনতা থাকা সম্ভব, এ কথা তাঁর হঠাৎ মনে হয়েছে, নইলে ও রকম লিখতেন না। কিন্তু এই লেখা ব'য়ে আনার মধ্যে লেখকের দিক থেকে যে আরও একটি ব্যাখ্যা আছে তা তাঁর মনে আসেনি তখন।

সে ব্যাখ্যাটা এই যে, লেখক পাঠক-নিরপেক্ষ ভাবে সম্পূর্ণ নিজের তৃপ্তির জন্য লেখেন এ কথা ঠিক নয়। ভবিষ্যৎ কোনো কালে লোকে তাঁর লেখা পড়বে এমন উদ্দেশ্য থেকেও লেখেন না। তাঁর লেখা তাঁর সমসাময়িক কালের পাঠকদের দিকে লক্ষ রেখেই লেখেন। নইলে তাঁর লেখার প্রেরণাই হ'ত না। যে কোনো চিত্রশিল্পীসম্পর্কেও ঐ একই কথা বলা চলে। গায়ক বা সঙ্গিতশিল্পীর সম্পর্কেও এ কথা সত্য। খুব ভাল গাইতে পারেন এমন ব্যক্তি লোকালয় ত্যাগ ক'রে প্রতিদিন বিমানে ক'রে মরুভূমিতে গিয়ে গেয়ে আসেন না। কাছাকাছি অন্তত একজন সমজদারও যদি না থাকে তবে শিল্প সৃষ্টির

প্রেরণা জাগত কি না সন্দেহ। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ চরম কথা ব'লে গেছেন—

> একাকী গায়কের নহে তো গান,
> মিলিতে হবে দুই জনে ,
> গাহিবে একজন খুলিয়া গলা,
> আরেক জন গাবে মনে।

রবীন্দ্রনাথ এই সহজ সত্যটি বহুবার বহু ভঙ্গিতে বলেছেন। এমন কি বিশ্বস্রষ্টাও তাঁর সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছেন মানুষকে লক্ষ ক'রেই। সেজন্য তাঁকে মানুষ সৃষ্টি ক'রে নিতে হয়েছে। 'তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে আলোয় আকাশ ভরা', অথবা 'তোমার—এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে, আমার—প্রাণে নইলে সে কোথাও ধরবে' প্রভৃতি গানের মধ্যেও ঐ একই কথা।

যে স্রষ্টা নয়, সংসারে যার দেবার কিছু নেই, সেই নিজের মধ্যে ডুবে থাকতে পারে। কৃপণই শুধু সবার অগোচরে সিন্দুক বোঝাই করতে পারে। কারণ তা বাইরের জিনিস, সংগ্রহে আনন্দ, অন্যের সঙ্গে ভোগ ক'রে তার আনন্দ নেই। স্রষ্টা ঠিক তার বিপরীত। অতএব স্রষ্টাকে আপন গরজে তাঁর আনন্দের অংশীদার খুঁজে বেড়াতেই হবে। এ কোনো লাভের জন্য নয়, কোনো কিছুর লোভে নয়, এর মধ্যে কাঙালপনা নেই, হীনতা নেই। বনবিহারীবাবুও শিল্পীরূপে স্রষ্টারূপে ঠিক এই কারণেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁদের সমকালে তাঁদের সহধর্মী একটি দল ছিল। তাঁদের কথা আগেই বলেছি। সে দল, সে উৎসাহ, এখন নেই। যে সব কাগজ তাঁর লেখায় ছবিতে এককালে গর্বিত ছিল, সে সব কাগজে এখন তিনি অবহেলিত। এ কথা তিনি নিজেই আমাকে একবার চিঠিতে লিখেছেন।

তাঁর অনেক কথা শোনাবার আছে, অথচ তাঁর মতো, খর-খড়্গসম ঝলকিত হয়ে ওঠা সত্যবাক্যের লেখকের দোসর নেই, এ ঘটনা তাঁর পক্ষে মর্মান্তিক হয়ে উঠেছিল। তাই তিনি স্বধর্মের তাগিদেই সমধর্মী খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল আমার মধ্যে তিনি মনের কথা খুলে বলবার মতো লোকের সন্ধান পেয়েছেন। এ কথা তিনি আগে আমাকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন।

তাই আমি তাঁর ঐ চিঠি পেয়ে তার মধ্যে তাঁর অভিমান দেখে যে পরিমাণ রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম, সেই পরিমাণ বিব্রত বোধ করেছিলাম। লেখা ব'য়ে আনার মধ্যে যদি কিছু হীনতাবোধ তাঁর জেগে থাকে তা হ'লে এমন একখানা চিঠি লেখা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

অমি এ চিঠির উত্তর লিখতে বসলাম। এতক্ষণ শিল্পীর বৈশিষ্ট্য বিষয়ে যে কথাগুলো বললাম, সেই কথাগুলিই আরও সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে দিলাম। এ চিঠির মধ্যে আমার আবেদনের আন্তরিকতাটাই বেশি ফুটেছিল হয় তো। কারণ তাঁর চিঠি প'ড়ে আমার চোখে সত্যিই জল এসেছিল। এবং তা যতখানি দুঃখে, ততখানি আনন্দে। আমার চিঠিখানার নকল নেই, এখন মনে হচ্ছে থাকলে ভাল হ'ত।

আমার চিঠি পেয়ে বনবিহারীবাবু লিখলেন—

P 245, Lake Road
Calcutta 29
9. 12. 57

পরিমল,

"তোমার চিঠি প'ড়ে আমারও চোখে জল এলো। খুব মিষ্টি লাগলো। আমার গুণগান করেছ বলে নয়, আমার চিঠির কদর্থ করনি ব'লে, তোমার কোনও ব্যবহারে অসন্তোষ প্রকাশ করেছি, মনে করনি ব'লে। ভেবেছিলুম, আমার চিঠির উত্তর দিতে তোমাকে বেশ বেগ পেতে হবে। কিন্তু দেখছি, ঠিক উত্তরটি দিয়েছ—একেবারে masterly।

"১৯২৫-এ তোমার সঙ্গে অল্পই পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু তোমার কার্টুন দেখে সেই পরিচয় বেশ নিবিড় হয়েছিল। তারপর ইদানীং তোমার লেখা প'ড়ে তোমাকে আমার সগোত্র ব'লে মনে হয়েছে। তোমার মতামতকে অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে করি।

"আমার সমস্ত লেখা (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) তোমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। এদের সম্বন্ধে তুমি যা করবার কোরো। কোনটা ছাপবে, কোনটা ফেলে দেবে সেটা তোমার বিচারের ওপর ছেড়ে দিলুম।

"আমার লেখা প্রচার হওয়া দরকার মনে করেই লিখেছিলুম। আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। অবশ্য ফাঁকতালে কিছু বাহবা পাবার আশাও

মনে মনে ছিল। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিল লোককে আমার কথা শোনানো। কারণ আমার বিশ্বাস, আমার মত ক'রে আর কেউ বলেনি—নিছক সংসারের মঙ্গল কামনায়।

"সুস্থ থাকো, সুখে থাকো, আশীর্বাদ করি।

"তোমার চিঠি প'ড়ে আমার ভাই তোমাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। এর প্রতিদানে তোমাকে কিছু করতে হবে না।…

শুভাকাঙ্ক্ষী

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়"

"প্রচার হওয়া দরকার মনে করেই লিখেছিলুম। আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।"—চিঠির এই কথাগুলি আমার চিঠি পড়বার পর তাঁর আত্মবিশ্লেষণে ধরা পড়েছে। এই আকাঙ্ক্ষা সকল শিল্পীর। এ কথাটা তিনি আত্মাভিমান বশত হঠাৎ ভুলে গিয়েছিলেন।

আমাদের বাড়িতে যখন আসতেন, তখন সব সময়েই তাঁর ভাই বঙ্কুবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে থাকতেন। তিনিও বৃদ্ধ। দু জনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব আমি লক্ষ করেছি। এ চিঠিতে তাঁর কথাই বলা হয়েছে। তিনিই বনবিহারীবাবুর একমাত্র স্বধর্মী এবং সহচর। একদিন আমাদের বাড়িতে ব'সে কোনো কথা প্রসঙ্গে আমার লেখা একটি ব্যঙ্গ নক্সার কথা মনে পড়াতে সেটি তাঁদের প'ড়ে শুনিয়েছিলাম। রচনাটির নাম "জড়বাদের দেশে দু মাস" (বর্তমানে 'বারোভূতের আসর' নামক আমার গল্পগ্রন্থে সংকলিত)। শোনামাত্র বঙ্কুবিহারীবাবুই সেটি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিলেন। বললেন এটি আমি নিয়ে যাব। যে মাসিকে বেরিয়েছিল ('সপ্তর্ষি'তেই মনে হচ্ছে) তার দুখানা কপি আমার ছিল, একটি তাঁকে দিয়ে ধন্য বোধ করলাম। ১৯২৫-এ আমার আঁকা কয়েকটি কার্টুন ছবি দেখে তাঁর খুব ভাল লেগেছিল, সে কথা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। এতদিনও মনে রেখেছেন, আশ্চর্য।

তিনি আমাকে তাঁর পুরনো দিনের লেখা ও ছবি পাঠিয়েছিলেন, তখনই আমি সে বিষয়ে কিছু বলিনি, ভেবেছিলাম আমার কেমন লেগেছে তা এক কথায় বলব না, সুযোগ পেলে বিস্তারিতভাবে বলব। তিনি একখানা

চিঠিতে লিখেওছিলেন, কেমন লাগল জানালে না কেন? এ কথারও উত্তর দিতে পারি নি তখন।

এতদিন পরে সময় এলো। এর আগে 'ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী' দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় যা বলেছি তার মূল কথাটা দ্বিতীয় স্মৃতিতে বিবৃত করেছি। তারপর রেডিওতে একদিন সামান্য কিছু বলবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তারপর বলছি এই রচনায়। তাঁর সমগ্র রচনা আমার হাতে নেই। সেগুলো সংগ্রহ করতে পারলে ভাল হ'ত।

অনেক দিন তাঁর সংবাদ জানি না। আন্দামানে বাস করবেন ব'লে কলকাতা ছেড়েছিলেন। ঠিকানা হারিয়েছি। তাই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় নেই। তিনি তো সর্বত্যাগী। সম্ভবত সকল কামনা ত্যাগ ক'রেই দেশ ছেড়েছেন।

চীনাদের আবির্ভাব

আজ ১৬ই নবেম্বর। দ্বিতীয় স্মৃতি লিখতে আরম্ভ করেছিলাম গত বছরের মে মাস থেকে। মোট ১৬ মাস লিখেছি, এটি তার পরবর্তী মাসের অধ্যায়। সবই মাসিক বসুমতীতে মাসে মাসে প্রকাশিত। আজ এই শেষ কিস্তি লিখছি।

ইতিমধ্যে দেশে চীনাদের আক্রমণে নতুন সঙ্কট দেখা দিল। এ সময় আমি দ্বিতীয় স্মৃতির গোড়াতেই যা লিখেছিলাম তা আরও একবার স্মরণযোগ্য। বলেছিলাম শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানীরা নবযুগ এনেছেন জাপানের উপর পরমাণু বোমা নিক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি ক'রে। সে সময় দুটি মাত্র বোমায় দেড় লাখের উপর নরহত্যা ক'রে এই উজ্জ্বল যুগের সূচনা।

ইতিমধ্যে নবযুগের প্রগতি প্রায় স্থাণুভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাগ্-যুদ্ধের সাহায্যে বাজার গরম রাখছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে অনেক খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। বড় যুদ্ধ লাগে-লাগে ক'রেও লাগেনি। এ শুধুই ক্ষণ-বিরাম মাত্র, হতাশ হবার কোনো কারণ ছিল না। সভ্যতা যে 'মোমেন্টাম' বা ভরবেগ একবার লাভ করেছে তা বন্ধ হবার নয়, মাঝে মাঝে তার আপাত শৈথিল্য দেখা গেলেও তা ভ্রান্তি মাত্র। মনে হচ্ছে এবারে এ যুগকে এগিয়ে নেবার ভার পড়েছে চীনাদের উপর। তবে নবসভ্যতার এই গতিপথ এমনই বিচিত্র যে সম্মানটা তারাই শেষ পর্যন্ত পাবে কি না জোর ক'রে বলা যায় না।

কলকাতা শহরে বাস ক'রেও গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্বাদ আমরা পেয়েছি। শহরের উপরেই বোমা পড়েছে কয়েকবার। তার কথা আমরা ভুলিনি। তাই তো সমস্ত মনপ্রাণ ক্ষুধার্ত হ'য়ে আছে বোমার আঘাতের জন্য। আশা ক'রে আছি শীতান্তে আমাদের মাথায় বোমা পড়বে। ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে আছি। কিন্তু যদি না পড়ে, যদি নবসভ্যতার তৃতীয় ভগীরথ চীন সরকার কোনো কারণে তার এই গুরু দায়িত্বভার পালনে অক্ষম হয়, তা হলে কিছুকাল আমাদের জীবন মরুভূমি ব'লে বোধ হবে। তখন হয়তো অন্য কেউ এসে বিশ্বশান্তি নামক মরীচিকাকে লক্ষ ক'রে বোমা ফেলবে, গুলি চালাবে। সভ্যতাকে এই ভাবে এগিয়ে নেবার লোকের অভাব হবে না। সেই ভরসাতেই মানুষ আজও বেঁচে আছে। পরমাণু বোমা সভ্যতার কি মনোহর চেহারা।

কোথায় গেল সেই সব পরম নিশ্চিন্ত সর্বনাশকর দিনগুলি। কি দায়িত্বহীন সেইসব দিন আমরা কাটিয়েছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে। তখন লেখকদের একটা অদ্ভুত সমাজ ছিল, একটা চরিত্র ছিল। এবং সেটাই ছিল সবচেয়ে ক্ষতিকর। কারো কাছে সর্বদা মোহমুদ্গর আওড়াবার কেউ ছিল না। কেউ ব'লে দেয়নি যে জীবনের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হচ্ছে পয়সার গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়ানো যেখানে আভাস আছে তার চারদিকে ছোঁক-ছোঁক ক'রে ঘোরা। কারণ, 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ?' সংসারে কেউ যখন কারো নয়, তখন লোকের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে টাকা উপার্জনে মন দেওয়া।

আজ ড্র্যাগনধর্মী চীনের আক্রমণে নতুন আর একটা যুগের সূচনা হ'তে চলল, এ যুগকে তাই অভিনন্দন জানাই। এবং এই উপলক্ষে বিশ্বযুদ্ধ লাগলে তার মতো মনোহর যুগপরিচয় আর কিছু হবে না। কিছুই বলা যায় না। আজ যাকে সামান্য মনে হচ্ছে, কাল তা অসামান্য হয়ে উঠতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মাত্র দুটো পরমাণু বোমা দেড় লক্ষ লোক মেরেছিল ব'লে এ যুগের নাম হয়েছে পরমাণু যুগ। পরমাণুর সাহায্যে লোক বাঁচানোর পথ প্রথমেই আবিষ্কৃত হ'লে কখনও এ যুগের নাম পরমাণু যুগ হ'ত না। যুগান্তকারী ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে এ যুগে একের পর এক, কিন্তু কোনো ওষুধ বা আবিষ্কর্তার নামের সঙ্গে যুগের নাম যুক্ত করা হয়নি। যদি এমন কোনো মারাত্মক জীবাণু আবিষ্কৃত হ'ত যার সামান্য এক মুঠোর সাহায্যে পৃথিবীর

সকল মানুষকে এক সেকেণ্ডে মেরে ফেলা যেত, তা হলে পরমাণু যুগ কেটে দিয়ে তার স্থানে লেখা হত জীবাণু যুগ। করপোরেশনের পথের নাম যেমন একের পর এক বদল হয়, যে যখন প্রভাবশালী, তার নাম তখন স্মরণীয় হয়ে ওঠে, এও তেমনি।—(যদিও তুলনাটা অতি বড়র সঙ্গে অতি ছোটর হল, তবু চরিত্রের দিক থেকে দুয়ের মধ্যে অসঙ্গতি নেই।)

এই পরিচ্ছেদটি যখন লেখা হচ্ছে তখন মন আশায় উৎফুল্ল। এখন নিফা অঞ্চলে কঠিন লড়াই চলছে। ওয়ালং অঞ্চলে চীনাদের আক্রমণের তেজ বাড়ছে, ভারতীয়দের বীরত্বপূর্ণ প্রতি-আক্রমণ চলছে।

যখন এ লেখা ছাপা হবে, তখন কি হবে, অনুমান করা কঠিন। ততদিনে যদি বিশ্বযুদ্ধ না বাধে, তা হ'লে আমি অবশ্যই দুঃখিত হব। কারণ নতুন নতুন পরমাণু-বোমার অতি প্রচণ্ড আঘাত যদি ব্যাপকভাবে মানুষ মারার কাজে না লাগে, তা'হলে বিজ্ঞানের এক বড় কৌশলটা বৃথা যাবে, সভ্যতা ব্যর্থ হবে। অ্যান্টিবায়োটিক শ্রেণীর আশ্চর্য ওষুধ সমূহ আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও এ যুগের নাম যখন অ্যান্টিবায়োটিক যুগ হ'ল না, তখন এইসব অতি আধুনিক বিশ্বধ্বংসকারী পরমাণু-বোমার নাম দেওয়া যেতে পারে অ্যান্টিবায়োটিক বোমা। (এবং ব্রড স্পেকট্রাম)। যুগের নাম হোক অ্যান্টিবায়োটিক পরমাণু যুগ। অ্যান্টিবায়োটিক মানে প্রাণের শত্রু। উপযুক্ত নাম।

কিন্তু যে নামেই ডাকা হোক, যুদ্ধের অনিশ্চয়তার মধ্যে আর একবার সমসাময়িক লেখক ভ্রাতা বা বন্ধুদের দিকে ফিরে চাইতে ইচ্ছা হচ্ছে। চলতে চলতে অনেককে হারিয়েছি চিরদিনের মতো, অনেকে ঘটনাচক্রে দূরে স'রে গেছেন, অনেকে শয্যালগ্ন হয়ে আছেন।

হেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, এঁদের আর বাইরে বেরোবার উপায় নেই। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী—আমাদের বুড়ো দা। তিনি এখন প্রকৃতই মহা স্থবির। কিন্তু কয়েকমাস আগেও কাছে গিয়ে দেখেছি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো বিছানা থেকে উঠে বসেছেন এবং সকল দুর্বলতা ভুলে গিয়ে যৌবনে

ফিরে গিয়েছেন। গল্প বলার এমন নেশা সহজে দেখা যায় না। গল্প বলার ঝোঁক আমাদের হেমেনদারও এতটুকু কম নয়। তিনি বর্তমানে তাঁর গঙ্গার ধারের ত্রিতল বাড়ির সর্বোচ্চ তলায় থাকেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভাঙা। বোধ হয় এক বছর আগেও তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি এক তলায়। কখনও দোতলায়। তখনও অবধি তিনি নিচে চিৎপুর রোডে নেমে এসে রকে ব'সে থাকতেন অন্য বাড়ির। কখনও বা বিপরীত দিকের চায়ের দোকানে। সন্ধ্যায় গেলে সেখানেই তাঁকে পাওয়া যেত। কিন্তু নিচে নামলে এখন তাঁর পক্ষে উপরে ওঠা কঠিন হয়, সে জন্য তিনি এখন স্থায়ী ভাবে ত্রিতলবাসী। এখানেও কয়েকবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি গত কয়েক মাসের মধ্যে। কিন্তু অত উপরে ওঠা আমার পক্ষেও এখন কিছু কষ্টকর। এমন অবস্থায় দু'পক্ষই একটা রফা ক'রে দোতলায় দেখা করা যেত, কিন্তু হেমেনদার অবস্থা স্মরণ ক'রে সে প্রস্তাব উত্থাপন করিনি। আড্ডা দেওয়ার ইচ্ছে হ'লে ত্রিতল পর্যন্ত ধাওয়া করি। পূজোর আগে শেষ যেদিন গিয়েছিলাম (সম্ভবত জুন মাসে) তখন আমার সঙ্গে ছিল সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়। আর ছিল দুজন, এবং হেমেনদার সঙ্গে যতবার দেখা করেছি গত দু'বছর, প্রত্যেকবারই তারা আমার সঙ্গী হয়েছে। —সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী আর অমল দেব।

হেমেন্দ্রকুমার বন্ধু-বৎসল। কারো উপর কোনো বিদ্বেষ পোষণ করতে দেখিনি। বেশ উদার মনটা। আমার অনুরোধে যুগান্তরে যখন "যাঁদের দেখেছি" পর্যায় শুরু করেন, তখন তাঁর এক বন্ধু আমার কাছে এসে তাঁর বিরুদ্ধে অকারণ অনেক কথা বলতে শুরু করলে আমি তাঁকে চুপ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। হেমেন্দ্রকুমার পরে তাঁরই সম্পর্কে যে রচনাটি লিখলেন, তাতে তাঁর নিন্দাকারীর প্রতি অজস্র শ্রদ্ধা এবং প্রীতি বর্ষিত হ'ল। এই সামান্য একটিমাত্র ঘটনাতেই হেমেন্দ্রকুমারের অন্তরের পরিচয়টি পেয়ে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি আরও বেড়ে গেল। হেমেন্দ্রকুমার যে কি পরিমাণ উদার এবং মিষ্টিস্বভাবের তার পরিচয় আমি অনেকবার পেয়েছি আমার কাছে লেখা তাঁর চিঠির মধ্যে। তাঁর একখানা চিঠি আমি শিশির-কুমার ভাদুড়ি অধ্যায়ে ছেপেছি (১১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। বেদনা-বিদ্ধ হৃদয়ের ভাষা আছে তাতে। অন্য সময় লেখা পাঠানোয় বিলম্ব হওয়াতে অথবা সম্মানদক্ষিণা তাড়াতাড়ি প্রয়োজন হ'লে, যে দুখানা চিঠি লিখেছেন তা বড়ই উপভোগ্য।

কবিতায় লিখেছেন। দুটোতেই সঙ্কোচপূর্ণ এবং অপরাধী-অপরাধী ভাব। ছন্দের আবরণে মুড়লে সঙ্কোচ অনেকটা কেটে যায়, এবং হাসতে হাসতে বললে অপরাধও কেটে যায়।

গত ২২-৯-৫৯ তারিখে তিনি পূজোর লেখা পাঠাইতে দেরি হওয়ায় লিখছেন···

ভো পরিমল গোস্বামীরে—সু-ধীর সুধী সম্পাদক।
বিলম্বিত কলমবাজের লজ্জা ভীতি উৎপাদক!
উদরটা মোর ঔষধালয়, রুগ্ন শরীর অথর্ব,
মানুষ-হাপর হলাম বুঝি ভেবেই মরি—কি করব?
জীবন্মৃত হয়েও তবু ওড়াতে চাই কথার ঘুঁড়ি,
মনে মনে পঙ্গু হাতে ভীমের গদা জোরসে ছুঁড়ি!
হায়রে, দেহ বশ মানে না, করবে কেবল বিদ্রোহ,
কেমন ক'রে দেখাই তবে আমার মানস বিগ্রহ?
সেই সেকালের রঙীন স্বপন স্পষ্ট চোখে দেখতে পাই,
রোগ-যাতনায় মেলায় কোথায় কিন্তু যখন আঁকতে যাই।
প্রাণপণে তাই, কলম ধ'রে লিখে দিলাম খানিকটা,
যদিও পেলাম কাঁচের কুচো খুঁজতে গিয়ে মাণিকটা।
বড়ই হ'ল বিলম্ব ভাই, ক্ষমার পাত্র আমি নই,
সাব্যস্ত যা করবে সখা, তাতেই দেব ঢ্যাঁরা সই।

—অনিচ্ছাকৃত অপরাধের আসামী হেমেন্দ্রকুমার রায়।

দ্বিতীয় চিঠিখানা এই—

প্রিয়ংবদ পরিমল গোস্বামী করকমলেষু—

বলিতে পার কি বন্ধু করিয়া মিনতি,
মাস গেল আশা কবে হবে ফলবতী?
গুহ্যকথা জানো সখা, নহি ধনপতি,
টাকার দুর্ভিক্ষে সদা দুর্দম্য দুর্গতি।
মাঝে মাঝে হয় ভাই হেন মতিগতি,
একছুটে বনে ঢুকে হয়ে পড়ি যতী।

কিন্তু সে শকতি কোথা ? এবে বৃদ্ধ অতি।
এবং দুর্ভক্ষ্য তৃণ। পাব না ফুরতি।
বিমনায়মান হয়ে চাহি তব প্রতি,
ঠারে ঠোবে বুঝে নাও নিঃস্বরে কাকতি।
একটা জবার দিলে হবে কিছু ক্ষতি ?
আমি জানি হবে নাকো, তুমি যে সুমতি।
ব্যাধির প্রমোদ-গৃহ এদেহ সম্প্রতি,
চতুর্দশপদী লিখে এবাব বিবতি।

হেমেন্দ্রকুমার
৩।৮।৫৯

এখানা পূর্বের চিঠিখানার প্রায় একমাস আগে লেখা। যুগান্তর সাময়িকী বিভাগে লেখাব দক্ষিণা প্রার্থনা।

সাধারণ চিঠিও—অর্থাৎ নিতান্তই একটি কাজের কথাও, কবিতায়। এবাবের পূজোর লেখাব প্রুফ দেখা বিষয়ে অনুরোধ। লিখছেন—

স্নেহাস্পদ বন্ধুবর,

আবও অনেক উল্লেখ্য ও কৌতুকেব কথা বাদ দিতে হল, কাবণ আপনার হুকুম—'লেখা ছোট কবতে হবে।'

কিন্তু শোধরাবার সময় পেলুম না

আমি নিজে গিয়েই দেখে দিয়ে আসতে পারতুম, কিন্তু—
যাব কি ভাই, যাব কি, শেষটা খাবি খাব কি ?
বলেছেন যে চিকিৎসক—'থামাও পদযাত্রার সখ।
দেখলে তোমাব মুখখানা ভবে যে মোব বুকখানা।
উপায় নাই গো উপাব নাই, মরতে ব'সেও জীবন চাই।

ইতি—হেমেনদা

হেমেন্দ্রকুমার বহুমুখী গুণী লোক। নিজে পেন্টার, কবি, গল্প লেখক, উপন্যাস-লেখক, নৃত্যবিদ, ছোটদের প্রিয় লেখক, অ্যাণ্ড হোয়াট নট ?

হেমেনদা ত্রিতলবাসী হওয়াতে আমার যত অসুবিধাই হোক, যে ক'দিন

সেখানে গিয়েছি একটা নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। একটা নতুন অনুভূতি।

গঙ্গার তীরে বাড়ি। হেমেনদার কাছে গিয়ে বসলে মনে হয় জাহাজে ভেসে চলেছি সবাই মিলে।

যেন সমাজ সংসারের সকল বাঁধন ছিঁড়ে ভেসে চলেছি। কতকাল যেন চলেছি জানা এক তীর থেকে অজানা আর এক তীরে। সন্ধ্যার আধা-আলো আধা-অন্ধকারে মৃদু কুয়াসার আবরণে যখন নদীর এপারে ওপারে আলো জলে উঠতে থাকে তখন সব মিলিয়ে বেশ একটা অবাস্তব উদাস করা ভাব। এ ভাব অবশ্য ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মনকে নাড়া দিয়ে যায়। ক্ষণকালটাই তখন সাময়িকভাবে কালের পরিধি হারিয়ে ফেলে।

যাঁদের সঙ্গে চলতে শুরু করেছিলাম, তাঁদের সবাই নেই সঙ্গে। আমরা যারা প্রায় সমসাময়িককালে কলকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্রে এসে মিলেছিলাম, সেই আমরা সবাই আর একত্র নেই। অগ্রজদের মধ্যে আছেন কালিদাস রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। এঁদের দান প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু তবু ভাবতে আনন্দ যে এঁরা জীবিত, এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেবার কাজ এঁদের এখনও সম্পূর্ণ ফুরিয়ে যায়নি। অগ্রজদের মধ্যে আরও অনেকে জীবিত আছেন। কিন্তু তাঁদের সবার সঙ্গে যে কারণেই হোক অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটেনি।

ভাবতে দুঃখ বোধ হয় যে, শিশিরকুমার, বিভূতিভূষণ, মানিক এবং সজনীকান্ত অকালে আমাদের ছেড়ে গেছেন। রাজশেখর বসুর মৃত্যু অপেক্ষিত ছিল। তাঁর মৃত্যু যথাকালে ঘটেছে। কিন্তু শিশিরকুমার, বিভূতিভূষণ, মানিক, সজনীর মৃত্যু মর্মান্তিক।

আরও একটি প্রক্ষিপ্ত অধ্যায়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে মনে পড়ল। তিনি মৃত্যুর পরের একটি জগৎ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। এবং তার ইতিহাস না জানলেও তার ভূগোল এবং নীতি বিষয়ে অনেক তথ্য জানতেন। অনেককে বলেছিলেন, যদি তাঁর বিশ্বাস সত্য হয়, তবে তিনি মৃত্যুর পর দেখা দেবেন।

এ প্রতিশ্রুতি তিনি অনেককে দিয়েছিলেন—এ কথা আগে বলেছি। বলেছি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু দেখা দেন নি! আমাকেও না।

ভাগ্যের পরিহাস

আমারই একটা ব্যাপারে সম্প্রতি এক ভৌতিক কাণ্ড ঘটেছে, এবং আশ্চর্য কথা এই যে তার সঙ্গে বিভূতিবাবু জড়িত। একেবারে ষোল আনা ভৌতিক ব্যাপার। এটি আমি অল্পদিন হ'ল আবিষ্কার করেছি। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'অন্য ভুবন' নামক একখানি সংকলন গ্রন্থ বেরিয়েছে। সবই ভূতের গল্প। তার মধ্যে বিভূতিভূষণের গল্পের ঠিক পরেই আমার গল্পটি স্থান পেয়েছে।

এখন প্রকাশকেরা বইয়ের প্রতি বাঁ-পৃষ্ঠায় বইয়ের নাম, এবং ডান-পৃষ্ঠায় লেখকের নাম ছেপেছেন। সবই ঠিক আছে, কেবল আমার গল্পটির বেলায়, পর পর ডান দিকের দুপৃষ্ঠায় আমার নাম (ঠিকই ছাপা হয়েছে), কিন্তু পরবর্তী ডান দিকের চার পৃষ্ঠায় বিভূতিভূষণের নাম ছাপা। অর্থাৎ আমার ভূতের গল্পের উপর বিভূতিভূষণ কিছু অধিকার বিস্তার করেছেন। অতএব ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই—

(১) বিভূতিবাবু ভূতে বিশ্বাসী ছিলেন।

(২) বিভূতিবাবু মৃত্যুর পর আমাকে দেখা দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

(৩) ভূতের গল্পের সংকলন গ্রন্থে আমার ১২ পৃষ্ঠার গল্পের পাঁচ পৃষ্ঠা বইয়ের নাম, দুপৃষ্ঠা আমার নাম এবং চার পৃষ্ঠা বিভূতিবাবুর নাম।

(৪) এবং বইখানি ভূতের গল্পের।

এ থেকে সিদ্ধান্ত কি?

বিজ্ঞানজগতের একটি ক্ষতি

আজ (১৮-১১-৫২) রাত্রে সুবিখ্যাত ডেনিশ বিজ্ঞানী নীলস্ বোরের মৃত্যু-সংবাদ শুনলাম রেডিওতে। শুনে মনটা একটু খারাপ হল। তাঁর প্রতি আমার একটা আকর্ষণ ছিল। তার কারণ, পরমাণুর গঠনের আবিষ্কারে রাদারফোর্ডের পরবর্তী ধাপ এগিয়ে নেবার কৃতিত্ব এঁর। অ্যাটমের প্রতি

বিজ্ঞানীদের কথা বহুদিন ধ'রে প'ড়ে এবং শুনে তাঁদের সম্পর্কে একটা অদ্ভুত শ্রদ্ধাবিস্ময়পূর্ণ মনোভাব গ'ড়ে উঠেছিল আমার মনে।

অ্যাটম বা পরমাণুর গঠনতত্ত্ব নিয়ে অনেকদিন ধ'রে আলোচনা চলছিল। অ্যাটমের ভিতর কি আছে, তা জানা সহজ ছিল না, প্রবেশের দরজা পাওয়া যাচ্ছিল না। কিছু কিছু আভাস মেলে, অথচ সিসেমি দরজা খোলে না। রাদারফোর্ড প্রথমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন অ্যাটমের অভ্যন্তরে। নিষেক উদ্দেশ্যে শুককীট যেমন ডিমের ভিতরে মাথা গলায়, রাদারফোর্ডও অ্যাটমের ভিতর তেমনি মাথা গলালেন। উদ্দেশ্য রহস্যভেদ। কিন্তু তবু তিনি সব রহস্য ভেদ করতে পারলেন না। নীলস্ বোর দিলেন পরববর্তী ব্যাখ্যা (মাঝখানে অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখে বিরত রইলাম।) অ্যাটম-তত্ত্ব অনেকখানি এগিয়ে গেল।

এই নীলস্ বোরকে আমি দেখেছি, এই আমার গর্ব। গত ১৯৬০ সালের ১৯শে জানুয়ারি মঙ্গলবার অপরাহ্নে বিজ্ঞান-কলেজের মেঘনাদ সাহা ইন্‌স্টিটিউট লেকচার থিয়েটারে অনধিকার প্রবেশ করেছিলাম বহু বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের ছাত্রদের সঙ্গে। শ্রদ্ধেয় চেহারা, শিশুর মতো সরল বাগ্‌ভঙ্গি, স্থির মস্তিষ্ক, আবেগহীন ভাষায় তত্ত্ব বুঝিয়ে দেবার আগ্রহ। দেখে বড় আনন্দ হয়েছিল। এঁরা সব ঋষিতুল্য ব্যক্তি, অত্যন্ত সরল এবং সহজ চিন্তাধারা এবং পরমাণু বোমা তৈরিতে এঁর কৃতিত্ব কম ছিল না।

দ্বিতীয় স্মৃতির কৈফিয়ৎ

এ পর্যন্ত যা কিছু লিখেছি তার কি কিছু দাম আছে?—নিজেরই মনে প্রশ্ন জাগে। বিরাট বিশ্বের অন্তহীন রহস্যের মাঝখানে ছোট ছোট মানুষের ছোট ছোট ছেলেমি বা খেলার কথাই হয়তো বেশি বলেছি। আমার চোখে যাঁরা বড়, তাঁদের সম্পর্কে যথেষ্ট বলবার ক্ষমতা বা ভাষা আমার নেই। কাজেই তাঁদেরও চরিত্রের মানবিক দুর্বল দিকটাই বেশি করে দেখেছি আমি। এ সব না গভীরতায় না বিস্তারে বড়। জগতের কল্যাণ হবে এমন কোনো কথাই লেখা গেল না। ক্ষমতা নেই।

পৃথিবীর এক কোণে অল্পপ্রশস্ত জমিতে যে গলিপথ বেয়ে চ'লে এসেছি

তার প্রতি মমতার অন্ত নেই। এখনও সে ফিরে ফিরে ডাকে। এক একটি অবসাদের মুহূর্তে যখন পিছন ফিরে তাকাই, তখন এক একটি তুচ্ছ ঘটনা বড় হয়ে ওঠে মনের মধ্যে। এক এক সময় অনেক ছবি ভিড় ক'রে আসে, মনের স্মরণপাত্রখানা ছাপিয়ে পড়ে। কিন্তু তবু তার আনন্দ একমাত্র আমারই আনন্দ। আমারই জীবনের সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

বড় বড় জিনিষ ভাবতে গিয়ে ভয়ে ফিরে এসেছি, মাথা ঘুরে যায়। বিশ্ববিধাতার কথাও ভাবতে যাই, কিন্তু বোধের মধ্যে আসে না। তবে এই মনে হয় যে, যদি এমন কেউ থাকেন, তবে আমার প্রচারের উপর তাঁর অস্তিত্ব নির্ভর করে না। তেলের দোকানের বিজ্ঞাপন লেখার মতো বিশ্বস্রষ্টার বিজ্ঞাপন লিখতে মন সরে না। তাঁর চরিত্রের সার্টিফিকেট লেখাও আমার পক্ষে অসম্ভব। প্রার্থনা ক'রে বা তোয়াজ ক'রে নিজের স্বার্থের জন্য কিছু আদায় করার কল্পনা দ্বারা কল্পিত বিধাতাকে হীন করার প্রবৃত্তি আমার নেই।

তাই জীবনে আমি ওপথে যাই নি। সাধারণ জিনিসের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা, তার মধ্যেই আমার ছোট্ট জগৎটা। কবির মতো, জানার ভিতর দিয়েই অজানার সন্ধান করেছি হয়তো মাঝে মাঝে, কিন্তু সেই অজানার সন্ধান পেলে কখনো বলব না ছেলের চাকরি ক'রে দাও, এবং লটারিতে আমায় কিছু টাকা পাইয়ে দাও। কিছুই করব না, শুধু বিস্মিত হব। এবং কথাটা গোপালদাকে গিয়ে জানিয়ে আসব বোস ইনস্টিট্যুটে।

নাম-সূচী

———